রূপসী প্রতিবেশী

[নেপাল-ভ্রমণ-কথা]

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীযামিনী ভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৯-এ, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

ছোটমামা—

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু

এই লেখকের :—

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

বিপাশা নদীর দেশে

নিবেদন

বন্ধু প্রদীপ চৌধুরী তখন নেপালে ; 'ইণ্ডিয়া এইড্ মিশন্'-এ কাজ করেন। হঠাৎ ডাক পাঠালেন তিনি,—চলে আসুন ; নেপাল।

চললাম। সঙ্গে থাকলেন শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য। আর ওদিকে, নেপাল দেখে যখন ঘরে ফিরলাম, তখন দেখি, সঙ্গে আরও অনেক কিছু ; নেপালের একরাশ স্মৃতিও সঙ্গে।

সেই স্মৃতিকথাই লিখলাম এখানে। যা দেখেছি নেপালে, যা শুনেছি, সাধ্যমত তা তুলে ধরলাম।

নেপাল-ভ্রমণে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ চৌধুরী আই. এ. এস., শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী ও শ্রীমতী শুভ্রা চৌধুরী।

নেপালের ছবি দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদয়াল দে। আর নেপাল-ভ্রমণ কথা 'রূপসী প্রতিবেশী' রচনায় নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ, শ্রীহৃদয়েশ মিশ্র ও রবীন্দ্র লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

'রূপসী প্রতিবেশী'র অনেকটা অংশ জনপ্রিয় সাহিত্য-সাপ্তাহিক অমৃতে প্রকাশিত হয়েছিল। এইজন্য পত্রিকাটির সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য সহকারীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নিবেদন, এই গ্রন্থে সংযুক্ত মানচিত্র এবং দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর নির্দেশিকা ('নেপালে দর্শনীয়') 'রূপসী প্রতিবেশীর' অনুরাগীদের কাজে লাগবে, আশা করি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নেপাল

যমুনোত্রী
গঙ্গোত্রী
কৈলাস
কামেট
রাক্ষস হ্রদ
মানস সরোবর
বদ্রীনাথ
তাকলাকোট
গুর্লা মান্ধাতা
নন্দাদেবী
মানাসলু
হিমলচুলী
গোঁসাইথান
ধবলগিরি
মচ্ছপুচ্ছরে
চো ওয়ু
তুকুছে
মুক্তিনাথ
অন্নপূর্ণা
গৌরীশঙ্কর
এভারেস্ট (সাগরমাথা)
তাতোপানি
পোখরা
কাঞ্চনজঙ্ঘা
নেপাল গঞ্জ
গোর্খা
কাকনী
কাঠমাণ্ডু
মাকালু
সিকিম
ভুটান
উত্তর প্রদেশ
লুম্বিনী
ভাইরওয়া
নৌতনুয়া
হেটোডা
আমলেখগঞ্জ
বীরগঞ্জ
সিমরা
নাগেরকোট
জনকপুর
বিরাটনগর
পশ্চিম বঙ্গ
রক্সৌল
বিহার
পূর্ব পাকিস্তান

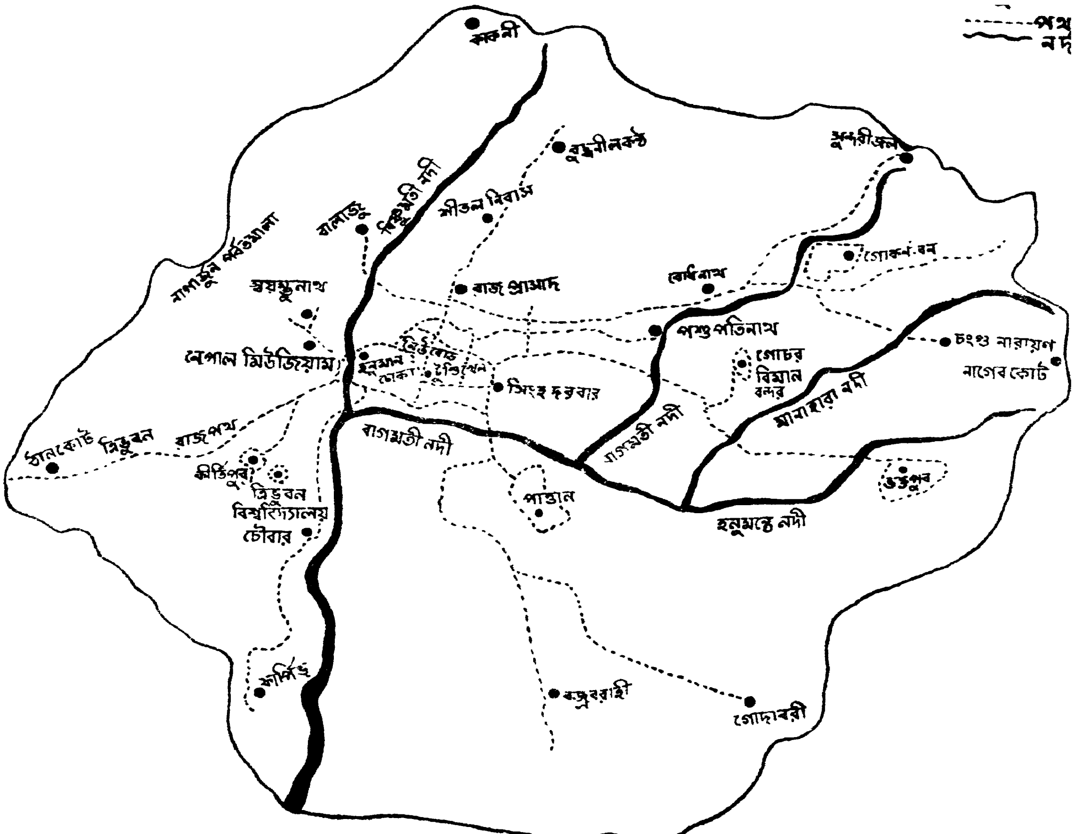

পথ
নদী
ককনী
বুড়ানীলকণ্ঠ
সুন্দরীজল
বিষ্ণুমতী নদী
শীতল নিবাস
বালাজু
নাগার্জুন পর্বতমালা
গোকর্ণ বন
বোধিনাথ
স্বয়ম্ভুনাথ
রাজ প্রাসাদ
পশুপতিনাথ
চংগু নারায়ণ
নাগের কোট
নেপাল মিউজিয়াম
হনুমান ঢোকা
গোচর বিমান বন্দর
সিংহ দরবার
মানাহারা নদী
বাগমতী নদী
থানকোট
ত্রিভুবন
রাজপথ
কীর্তিপুর
ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়
চৌবার
পাটান
হনুমন্তে নদী
ফার্পিঙ
বজ্রবরাহী
গোদাবরী

পশুপতিনাথ মন্দির

নেপালের এক পল্লী : পেছনে তুসারাচ্ছন্ন হিমালয়

মুক্তিনাথ-এর পথে

নেপাল-হিমালয় ঃ একটি সাধারণ দৃশ্য

গণ্ডকী নদী ও তার গিরিখাত

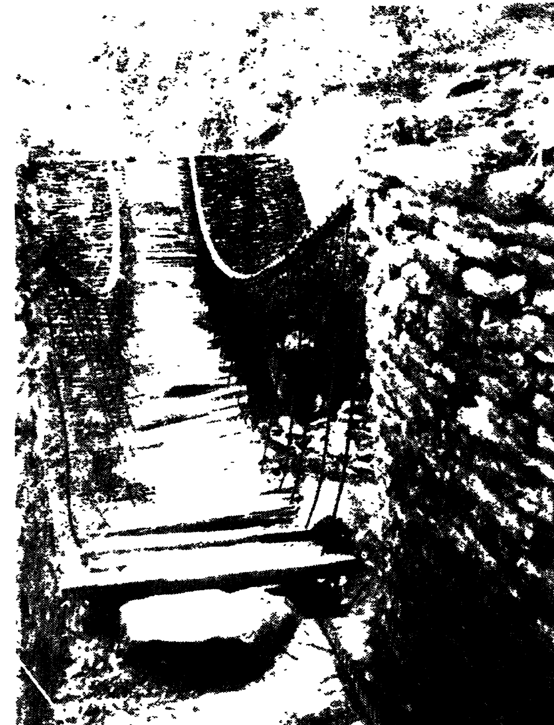

ঝুলন্ত সেতু (মুক্তিনাথের পথে)

অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণী

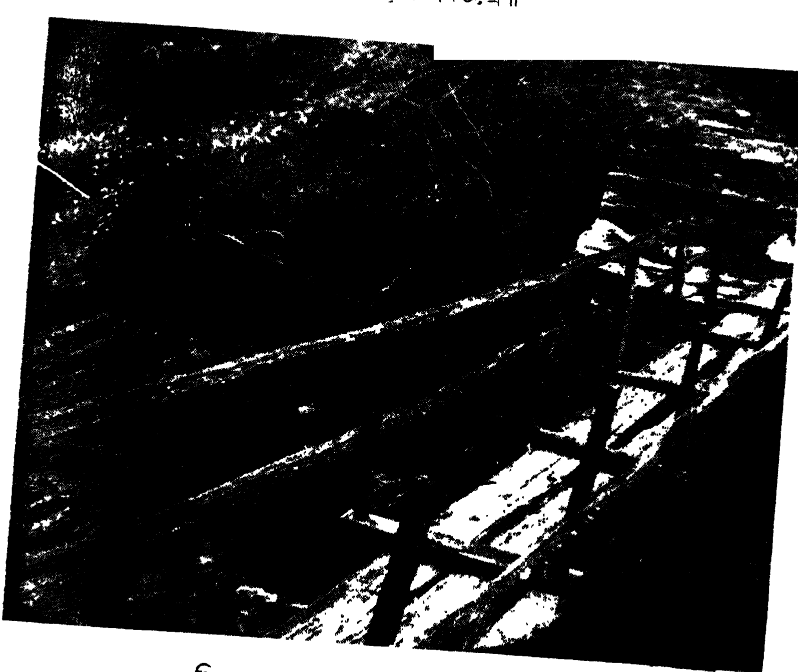

বিপজ্জনক, প্রায় ভেঙে-পড়া একটি সেতু

কৃষ্ণ-মন্দির : পাটান

তলেজু-মন্দির : কাঠমাণ্ডু

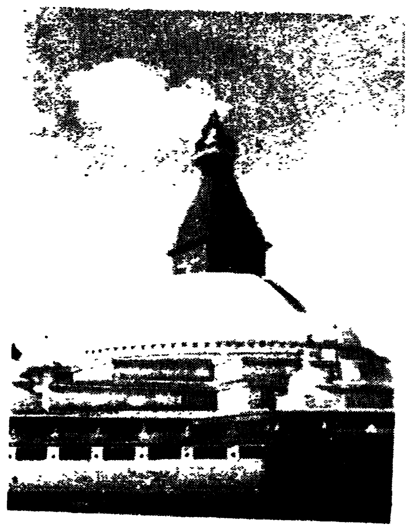

বোধনাথ : কাঠমাণ্ডু

স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ : কাঠমাণ্ডু

লবৃক্ষের ছায়ায় বুদ্ধ-জননী মায়   দবী

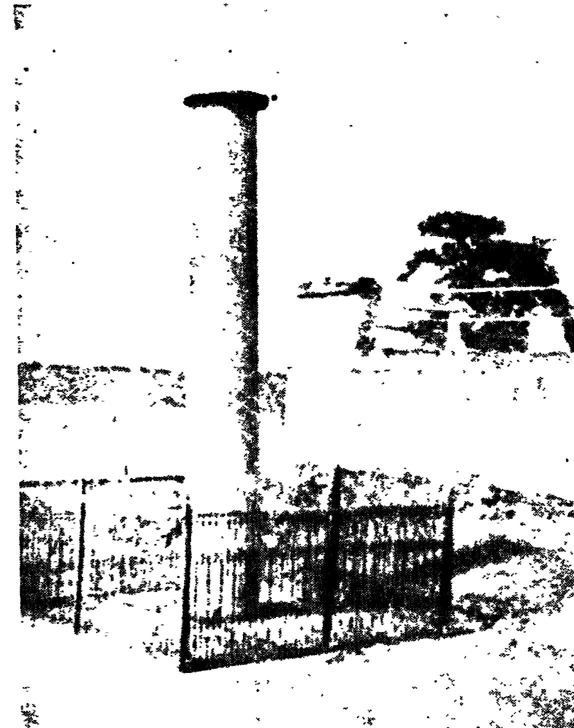

ক-স্তম্ভ   লুম্বিনী

ফউয়া-হ্রদ ঃ পোখরা

কুমারী দেবী

মুক্তিনাথ মন্দির

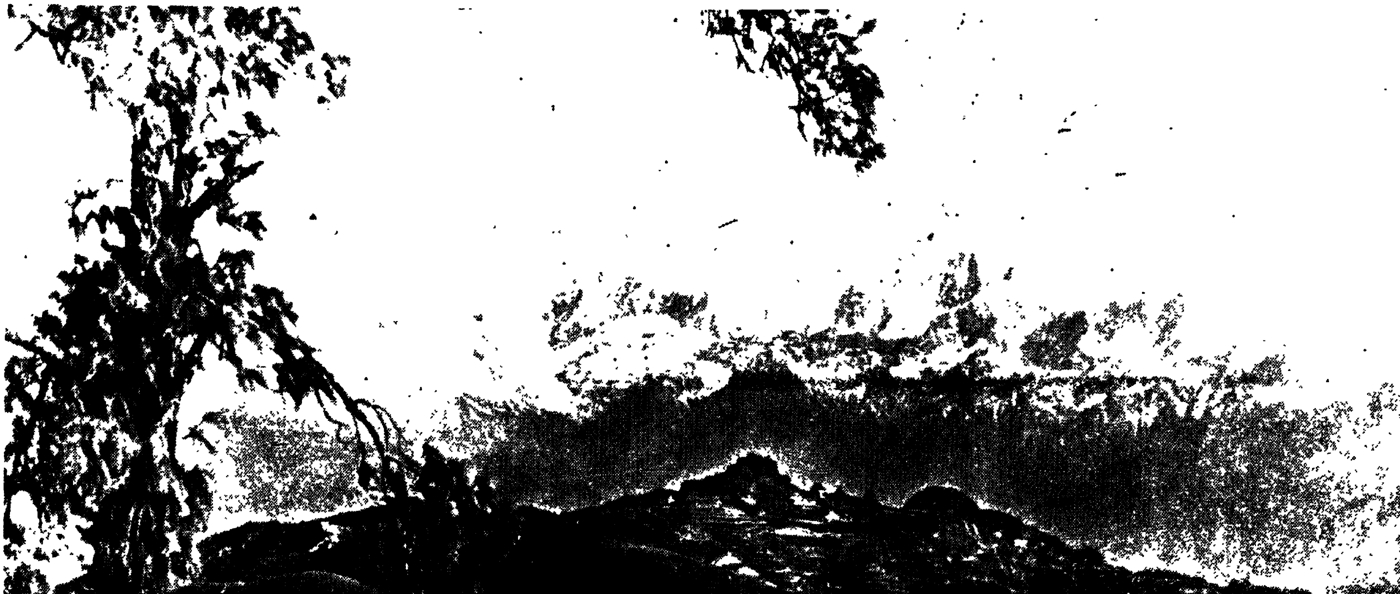

তুষার হিমালয় (নাগেরকোট থেকে

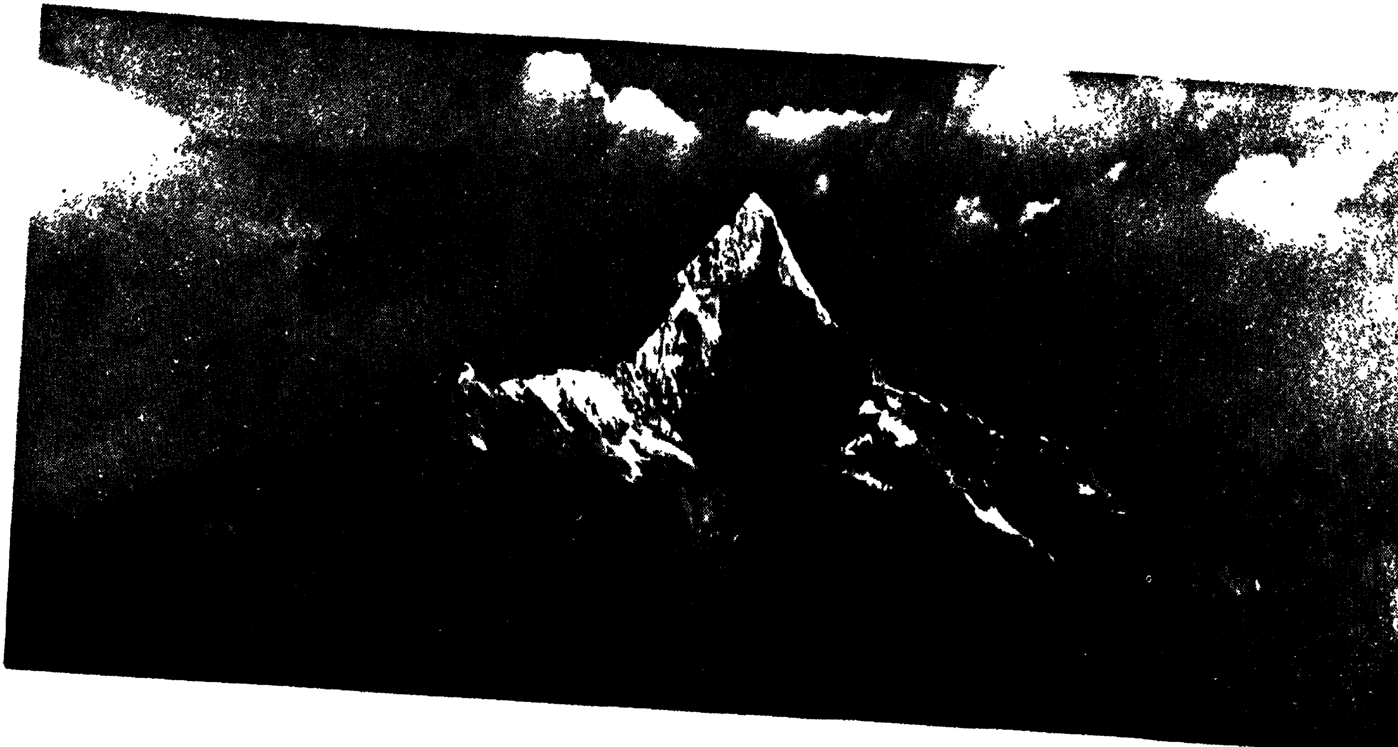

মাচ্ছাপুচ্ছ্রে (পোখরা থেকে)

এক

চাকা ঘোরে ঠিক। মহাকালের চাকা। সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে পথিক-পৃথিবী আবার ঠিক ঋতু-বন্দনা করে। আবার শরৎ আসে। ১৩৭৫ সাল কলকাতার আকাশে সাদা মেঘের নিশান ওড়ায়।

ওদিকে ভালোবাসার নিশান উড়িয়ে বন্ধুদেরও আনাগোনা সুরু হয়।

—এবারকার ছুটির ঠিকানা কী? পুজোর অনেক আগেই শুধোন ওঁরা।

বলি, নেপাল।

নেপাল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নেপাল।

—হঠাৎ ওখানে?

—এই এমনি!

—এমনি কখনও হয়! যাচ্ছ পশুপতিনাথ দেখতে। এভারেস্ট্ আর ধবলগিরি দেখতে।

ওদিকে দেখা অনেক আগে থেকেই সুরু হয়ে যায়। যাবার অনেক আগে থেকেই।

কলকাতার নেপাল এম্ব্যাসি থেকে কয়েকটা ট্যুরিস্ট্ প্যাম্ফ্লেট নিয়ে আসি। এবং তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি ওদের ওপর। ওরা আমাকে কোন্ এক স্বপ্নলোকে পৌঁছে দেয় যেন।

যেন শুনতে পাই, ঘণ্টা বাজে। মন্দিরে মন্দিরে বাজে। কাছে, খুব কাছে প্রতিবেশীর ঘরে বাজে।

মন্দিরে-ভরা পাহাড়-ঘেরা প্রতিবেশী। এখানে-সেখানে তার মন্দির, অনেক মন্দির। যত্রতত্র তার পাহাড়, অনেক পাহাড়। সে

তুষারমৌলীদের বুকে নিয়ে স্বর্গ জুড়ে আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে। তার জনস্থলীর ঘণ্টাধ্বনির অভিসার বনস্থলীর মর্মরধ্বনিকে স্পর্শ করে।

কিন্তু বন কতটুকু আর! বড় জোর তুষারকিরীটের পাদদেশ অবধি।

ওই পাদদেশ থেকেই না সুরু হল স্বর্গ-মর্ত্যলালিত পারিষদদের রাজ্য। সুরু হল এভারেস্ট্, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা ও গৌরীশঙ্করের খাসমহল।

হ্যাঁ, মহলগুলোর সবাই সেখানে। সেখানেই রহস্যপুরী নেপাল। নগাধিরাজের খাসমহল সেখানেই রঙ্‌মহল হল।

ভাবি, ওই রঙ্‌মহলে কান পাতা যাক একটু; প্রতিবেশীর রূপের জলসায় একটুক্ষণ অতিথি হওয়া যাক।

ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়ি এক শরৎ-সন্ধ্যায়। ভারতের সীমান্ত-শহর রক্সৌলে দাঁড়াই এসে।

এই সেই রক্সৌল, সমস্তিপুর থেকে মিটার-গেজ ট্রেনে যেতে হয় যেখানে এবং যেখানে যেতে যেতে বার বার মনে হয়, ওই বাষ্প-যানের চেয়ে গোযানে চেপে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করা ঢের সহজ।

আমাদের এক সহযাত্রী অবিশ্যি বলেছিলেন, গোযান-টোযান বুঝিনে। বুঝি শুধু এই যে, এই সেই রক্সৌল, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়, যেখান থেকে তিন মাইল মাত্র এগোলেই প্রতিবেশীর রস-রঙ্গের স্পর্শ পাওয়া যায়।

মিথ্যে বলেননি সহযাত্রী। প্রতিবেশী এখান থেকে মাইল তিনেকই বটে।

এই তিন মাইল পথ টাঙ্গায় যেতে হল আমাদের এবং টাঙ্গা যে সমস্তিপুর-রক্সৌল শাখার মিটার-গেজ মার্কা রেলগাড়ির চেয়ে অনেক জোরে ছুটল, সত্যের খাতিরে সে-কথা আজ অস্বীকার করার জো নেই।

অস্বীকার রক্সৌলকেই বা করি কী করে! যে অপরিসীম

উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে একদিন তার পথ ধরে ছুটেছিলাম, কেমন করে আজ তা বিস্মৃত হই!

মনে পড়ে, পীচ-ঢালা সমতল একটা পথ। পথটা ধীরে ধীরে রক্সৌল-এর ঘিঞ্জি বাজার-হাটকে পেছনে ফেলে তেপান্তরের একটা মাঠ-বরাবর উধাও হয়ে গেল।

শুনলাম, ওই তেপান্তরের মাঠই নাকি নেপালের তরাই অঞ্চল এবং বীরগঞ্জ নামে যে শহরটাতে আমরা আজ যাব, তা নাকি ওই তরাইয়েরই প্রান্তসীমায়।

এদিকে দেখতে দেখতে ভারতের সীমা শেষ হয়ে এল। আমরা নেপাল-সীমান্তে দাঁড়ালাম এসে।

সীমান্তে এসে দেখি, গাড়ির বেশ বড়গোছের এক 'কন্‌ভয়'। ওখানে গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি ও সাইকেল রিক্সা থেকে সুরু করে লরী, প্রাইভেট কার, স্টেশন-ওয়াগন ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে।

ভারতের 'চেক্‌পোস্ট্‌' এখানে। আবগারী পুলিশ এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জিনিসপত্র ঘেঁটে-ঘুঁটে দেখছে, বে-আইনীভাবে মাল পাচার করা হচ্ছে কিনা।

মাল পাচারের বারো আনাই গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি ও লরী মারফৎ হয়। তাই ঘাঁটা-ঘুঁটিটা ওদের বেলায় একটু বেশি হচ্ছে। আর যেগুলো যাত্রীবাহী গাড়ি, তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সামান্য একটু জিজ্ঞাসাবাদ করেই।

জিজ্ঞাসাবাদের কী ছিরি!

একজন আবগারী পুলিশ এগিয়ে আসে আমার দিকে।

— কিধার যাওগে? হঠাৎ প্রশ্ন করে সে।

—জবাব দিই, নেপাল।

—ক্যয়োঁ?

—ঘুমনে কে লিয়ে।

—কিধার ঘুমোগে ?

—বহুৎ দূর। কাঠমাণ্ডু, পোখরা, লুম্বিনী—বহুৎ কুছ জগহ মে।

—ক্যয়োঁ ?

—দেখনে কে লিয়ে।

—ক্যা দেখোগে ?

—দেশ।

—দেখো! বলেই এগোতে লাগল সে; এবং তারপর হঠাৎ একবার আমার দিকে পেছন ফিরে বলল, লেকিন দেখনে কে লিয়ে কুছ নেহি হ্যাঁয় ইধার!

—কুছ নেহি হ্যাঁয় ইধার! তোর মুণ্ডু! এবার আমার দিকে এগিয়ে এলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। এসে ওই আবগারী পুলিশটিকে তাক্ করে এই বাক্যবাণ ছুঁড়লেন।

আমি বললাম, আস্তে! আস্তে বলুন। ও শুনতে পাবে।

—পাক না শুনতে; যত খুশি পাক। ওদের ভয় করি নাকি! ভদ্রলোক সজোরে জানিয়ে দিলেন।

আমি যথাসম্ভব মোলায়েম হবার চেষ্টা করে বললাম, প্রশ্নটা ভয়-অভয়ের নয়, কর্তব্যের। পুলিশ ওর কর্তব্য করছে।

ভদ্রলোক জ্বলে উঠলেন এবার। বললেন, রেখে দিন মশাই কর্তব্য, রেখে দিন। ওরা সব ঘোরে টু-পাইসের ফিকিরে। ওদের আমি জানি।

—আপনি আসছেন কোত্থেকে ? লোকটিকে শুধোই এবার।

—কলকাতা থেকে। আর আপনি ?

—আমিও কলকাতা থেকেই।

—তবে তো ভালই হল। আপনাকে সামান্য কিছু পরামর্শ দেবার অধিকার আমার আছে।

বললাম, পরামর্শ ? কিসের পরামর্শ ?

ভদ্রলোক বললেন, কিসের আবার! চেক্‌পোস্ট্-এর। কী

জানেন, পুলিশবাবুদের কেউ এসে শুধোলে হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, ইধার যায়েঙ্গা, উধার যায়েঙ্গা বলবেন না। বলবেন ছোট্ট একটি কথা, ম্যঁয় তীর্থযাত্রী হুঁ। আর বললেই দেখবেন, ম্যাজিক! বাঁশী শুনে সাপ যেমন, আপনার কথা শুনে পুলিশও তেমনি ঠাণ্ডা একেবারে।

বললাম, বেশ! এখন থেকে তাই বলব।

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা করার জন্যই ওকথা বললাম আমি। কিন্তু ঠাণ্ডা উনি হলে তো! বিচিত্র সব পরামর্শের আকারে অনর্গল খৈ ফুটতে লাগল ওর মুখে।

এদিকে দেখতে দেখতে ভারত-সীমান্ত পেরিয়ে এলাম। অপ্রশস্ত ও অগভীর একটা নদীর ওপর গড়ে-তোলা সেতু পেরিয়ে নেপাল পৌঁছুলাম।

নেপাল যেতে ভারতীয়দের পাশপোর্ট লাগে না। আর শুধু পাশপোর্ট কেন, 'বাই রোড' যেতে অন্য কোনরকম পরিচয়পত্রও লাগে না।

যাত্রার আগে শুনেছিলাম বটে, পরিচয়পত্র একটা লাগে নাকি। কোন একজন জেলা-শাসককে দিয়ে নাকি লিখিয়ে নিতে হয়, অমুকচন্দ্র অমুকের পুত্র অমুক একজন ভারতীয় নাগরিক। তিনি অমুক জায়গা থেকে আসছেন। পরিচয়পত্রের ওপর নাগরিকটির ছবি থাকে এবং ছবির ওপর সই থাকে জেলা-শাসকের।

কলকাতার 'নেপাল-এম্‌ব্যাসি'র পরামর্শ অনুযায়ী এই ধরনের পরিচয়পত্র আমরাও সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু পথে ওটার দরকার হল না কিছুই। কেউ ওটা দেখল না; এমন কি, কেউ একবার শুধালও না, ওহে বাপু! জেলা-শাসকের সইওয়ালা ওই বিশেষ জিনিসটি তুমি এনেছ কি?

শুনেছিলাম, আনতে নাকি আরও অনেক কিছুই হয়। টি-এ-বি-সি ইন্‌জেকশান নেবার প্রমাণ-পত্র, বসন্তের টীকা নেবার প্রমাণ-পত্র

ইত্যাদি অনেক কিছু আনতে হয় নাকি। কিন্তু কাজের বেলায় দেখলাম, বাজে কথা ; কিছুই আনতে হয় না। দেখলাম, নেপাল সরকার আমাদের প্রতি এত সদাশয় যে, আমরা যথার্থই ভারতীয় কিনা, তার প্রমাণ নিতে পর্যন্ত ওঁদের অনীহা।

অতএব নিশ্চিন্ত মনেই এগিয়ে চললাম পীচ-ঢালা পথটি ধরে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি গাড়ি এগোল। এগোলেন সেই বাঙালী ভদ্রলোকও। আমাদের ঠিক গা ঘেঁষেই আর একটি টাঙ্গায় চেপে এগোলেন। ভদ্রলোক চিৎকার করে কথা বলছিলেন মাঝে মাঝে। বিচিত্র সব উপদেশ দিচ্ছিলেন। একবার বললেন, বুঝলেন কিনা! নেপাল হল ধর্মপ্রাণ দেশ। ফিকির বুঝে ধর্মের কথাটি একবার তুলেছেন কি, কেল্লা ফতে!

—ওঃ! তাই নাকি! বলেই লোকটির সঙ্গ এড়াতে চাইলাম এবার। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে তেপান্তরের মাঠকে দেখতে লাগলাম।

ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া আমাদের গায়ে লাগল এসে। আর উত্তর দিক থেকে ছুটে-আসা একঝাঁক বলাকা আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেল, নগাধিরাজের অন্দরমহলে শীতের শাসন সুরু হয়েছে এবার। এবার দেশান্তর-যাত্রার পালা। উত্তর থেকে দক্ষিণে অভিসার করার পালা।

আমাদের অভিসারটা উল্টোমুখী। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছি আমরা। দেশান্তরী বলাকার রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ করছি।

হ্যাঁ, সত্যি অনধিকার-প্রবেশ। আর তাই যদি না হবে তো আমাদের পথ আবার রুদ্ধ দেখব কেন? কেন আবার দেখব, বিরাট এক 'কন্‌ভয়'-এর পেছনে পরাজিত সৈন্যের মতো পড়ে আছি?

'কনভয়'টা দাঁড়িয়ে ছিল নেপালের 'চেক্‌পোস্ট্‌'-এর সামনে। আর 'পোস্ট্‌'-এর কর্মীরা চাকে ঢিল-খাওয়া ভীমরুলের মতো শিকার-সন্ধানে ছোটাছুটি করছিল। কারও ট্রাঙ্ক-হোল্ডল্ খুলছিল

ওরা ; কারও আবার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ডুবুরীর মতো ওরা দেখছিল, নিষিদ্ধ-রত্ন কিছু আছে কিনা।

—নেহি ! কুছ্ নেহি হ্যাঁয় আপকা ব্যাগ মে, আমাকে লক্ষ্য করে এক আবগারী পুলিশ বলল।

—মেরা ব্যাগ মে ভি কুছ্ নেই হ্যাঁয়, আমার ঠিক পাশেই টাঙ্গায় বসে-থাকা বাঙালী ভদ্রলোকটি জানালেন। আপনমনেই বার দুই-তিন ঘোষণা করলেন তিনি, ম্যঁয় তীর্থযাত্রী হুঁ।

আবগারী পুলিশ এবার এগিয়ে গেল ওই যাত্রীটির দিকে।

যাত্রীটি তখন ভগবৎ-ভক্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বার বার আকুলকণ্ঠে বলছেন, জয় ! বাবা পশুপতিনাথ কী জয় ! জয় ! বাবা মুক্তিনাথ কী জয় !

পুলিশ কিন্তু পশুপতিনাথ বা মুক্তিনাথের নামে দমল না এতটুকু। বরং সোজা এগিয়ে গিয়ে বলল, আপকা ট্রাংক ঔর হোল্ডল্ খোলিয়ে। চেকিং হোগা।

—চেকিং ক্যা হোগা ? ম্যঁয় তো তীর্থযাত্রী হুঁ !

চোখ কপালে তুলে শিবনেত্র হয়ে সহযাত্রীটি জানালেন।

পুলিশ নাছোড়বান্দা। সহযাত্রীকে দিয়ে ট্রাংক ও হোল্ডল্ খুলিয়ে ছাড়ল। এবং খুলতেই দেখা গেল, কয়েক হাজার সিগারেট রয়েছে ওর ট্রাংকে ; আর হোল্ডলে রয়েছে কয়েক হাজার টাকা দামের ওষুধ।

—আপকো তো ‘ডিউটি’ দেনা হোগা—পুলিশ জানিয়ে দিল ওঁকে। উনি তখন তারস্বরে চিৎকার করছেন, জয় ! বাবা পশু-পতিনাথ কী জয় !

এইভাবে আরও কতক্ষণ উনি চিৎকার করেছিলেন জানি না। কারণ, আবগারী পুলিশের নির্দেশে আমাদের টাঙ্গা যখন ওকে পেছনে ফেলে বেশ খানিকটা দূরে এগিয়ে গেল, তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম, জয় ! বাবা পশুপতিনাথ কী জয় !

তখনও কানে আসছিল অস্পষ্ট ও অস্ফুট কয়েকটি কথা, ম্যঁায় তীর্থযাত্রী হুঁ।

তীর্থযাত্রীকে পেছনে ফেলে এসে মনটা হঠাৎ কেমন যেন ভারী হয়ে উঠল। বার বার মনে হতে লাগল, উনি যেমনই হোন না কেন, যা'ই করুন না কেন, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও তো আমার সঙ্গী ছিলেন! তেপান্তরের মাঠে দেখতে দেখতে উনি আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন আমার। আর আমি সেই আত্মীয়কে আইনের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দিয়ে আলোকিত বীরগঞ্জের দিকে চললাম! কাজটা ভালো করলাম কি?

বীরগঞ্জের দিকে এগোবার সময় মনে হল, হায়! ভালোমন্দের অত নির্ভুল হিসেব কে রাখে! কে খবর রাখে, কখন্—কোন্ মুহূর্তে আইনের নিক্তিতে খারিজ হয়ে যাওয়া মানুষের জন্যে কার ক'টা দীর্ঘশ্বাস পড়ল?

ওদিকে পৃথিবীরও দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল তখন। সন্ধ্যার অন্ধকারে নেপালের তরাই অঞ্চল স্তব্ধ, থমথমে ও বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল।

এই বিষণ্ণতার ঘোর কাটল বীরগঞ্জে পৌঁছে। কারণ, ওখানেই আলো-ঝলমল পথঘাট ও উল্লসিত চুপ বাহাদুরের দেখা পেলাম আমরা।

চুপ বাহাদুর চুপচাপ মোটেই নয়। বরং তাকে দেখলে মনে হবে, সব সময় সে 'সিরিয়ো-কমিক' নাটকে 'হিরো'র অভিনয় করছে।

'হিরো'টিকে প্রথম-দর্শনেই মনে ধরল আমার। ধরল, তার কারণ, প্রথম থেকেই চলনে-বলনে, আদবে-কায়দায় সে একেবারে আত্মীয় হয়ে উঠল।

ওই আত্মীয়টিকে আজও দেখতে পাই। দেখি, বীরগঞ্জের পথ ধরে চলেছি, বেশ জোরেই চলেছি; এমন সময় হঠাৎ আমাদের পথ-রোধ করে দাঁড়াল সে। তার মাথায় টুপি, গলায় টাই, পরনে

কোট-প্যান্ট, আর হাতে লাঠি। লাঠিটিকে শূন্যে উঠিয়ে সে আমাদের নির্দেশ দিল,—থামস্!

আমরা থামলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভিন্‌দেশী সাহেবটি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করল, ওয়েল্‌কাম্ টু নেপাল, স্যার! ওয়েল্‌কাম্!

ওয়েল্‌কাম্-এর বহর দেখে অবাক লাগল খুবই। কারণ, রাস্তায় এভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ও বস্তুটি লাভ করার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

ওদিকে আমাদের আরও অপ্রস্তুত করে দিয়ে আগন্তুক বলে চলেছে, নেপাল ইজ্ এ ওয়ন্‌ডারফুল কান্ট্রি, স্যার! ওয়ান্‌ডারফুল কান্ট্রি! ওয়েল্‌কাম্ হিয়ার, স্যার! ওয়েল্‌কাম্!

সন্দেহ হল, আগন্তুকের উচ্ছ্বাস থেকে টাইফুন উঠবে এবার; আর আমি সেই টাইফুনে উড়তে উড়তে, ঘুরতে ঘুরতে নেপালের রাজ-দরবারে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ব।

—লেকিন আপ কৌন্ হ্যাঁয়? গাড়ি থেকে নেমে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ওকে শুধালাম।

ও হিন্দী ও ইংরেজী মিশিয়ে জবাব দিল, মেরা নাম চুপ বাহাদুর হ্যাঁয়—আপকা ফ্রেণ্ড, কেয়ার-টেকার ঔর গাইড।

কিন্তু এরকমভাবে গাইড পাবার তো কথা ছিল না! বিশিষ্ট একজন ফ্রেণ্ড ও কেয়ার-টেকারকেও ঠিক এভাবে দেখব বলে প্রত্যাশা করিনি। তাই ঠিক সেই মুহূর্তে চুপ বাহাদুরকে মাটির ভেতর থেকে ফুঁড়ে-ওঠা 'সিরিয়ো-কমিক' নাটকের 'হিরো' বলে মনে হল।

ওদিকে 'হিরো'টি তখনও থামেনি। অনর্গল বকে চলেছে, মেরে সাথ চলিয়ে, স্যার। হোটেল কোসেলী মে চলিয়ে। ও হ্যাঁয় বীরগঞ্জ কা সবসে বঢ়িয়া হোটেল।

হোটেল কোসেলীর নাম আগেই শুনেছিলাম। যাচ্ছিলামও

ওখানেই। কিন্তু তবু চুপ বাহাদুরকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম, বহুত্ আচ্ছা! চলো আপনা বঢ়িয়া হোটেল মে।

কোসেলীর দিকে চললাম আবার। চুপ বাহাদুর আমাদের সঙ্গে চলল। টাঙ্গায় উঠে আমার ঠিক গা ঘেঁষে বসল সে। আর বসেই ছুঁড়তে শুরু করল বিচিত্র সব প্রশ্নবাণ।

—কিধারসে আয়া আপ?

বললাম, কলকাত্তা সে।

—কিধার যাওগে?

—কাঠমাণ্ডু।

—কাঠমাণ্ডু মে ক্যা দেখোগে মালিক? নাম্‌চেবাজার যাও। এভারেস্ট্ কা মহল্লা দেখো।

—কিন্তু নাম্‌চেবাজার তো কাঠমাণ্ডু থেকে অনেক দূর; প্রায় দেড়শ' মাইল নাকি। রাজধানী থেকে পায়ে হেঁটে ওখানে যেতে নাকি প্রায় পনের দিন লাগে।

—ওহ্ তো লাগেগা সাব। চুপ বাহাদুর আবার সুরু করল, লেকিন তব ভি যাও উধার। সাগরমাথা কা আপনা মহল দেখো।

—দেখব সাধ্যমত সবই। কিন্তু একটা কথা, সাগরমাথাটি কে?

—এভারেস্ট্ কো হোমলোগ বোলতা হ্যায় সাগরমাথা। শেরপালোক বলতা হ্যায় চোমোলুংমা।

ভাবলাম, ভালো পাল্লায় পড়েছি যা হোক! নেপালে পা দিয়েই খোদ এভারেস্ট্ বা চোমোলুংমার গাইড্-এর পাল্লায় পড়েছি।

ওদিকে দেখতে দেখতে হোটেল কোসেলীতে পৌঁছে গেলাম। গাইড চুপ বাহাদুর ঝড়ের বেগে টাঙা থেকে নেমে আমাদের অভ্যর্থনা করল, ওয়েল্‌কাম্ টু হোটেল কোসেলী, স্যার! ওয়েল্‌কাম্!

চুপ বাহাদুরের অভ্যর্থনা কুড়োতে কুড়োতে হোটেলে ঢুকলাম। মালপত্রগুলো টাঙ্গায় পড়ে রইল।

মন্দ নয় হোটেলটা। হোক একতলা, কিন্তু তবু নতুন-গড়া এবং ঝক্ঝকে তক্‌তকে বলে প্রথম-দর্শনে ওকে বেশ ভালোই লাগল।

মনে পড়ে, 'বার'-ওয়ালা একটি রেস্টুরেন্ট্ পেরিয়ে কোসেলীতে ঢুকলাম। চুপ বাহাদুর কোসেলীর ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ঠিক সেই মুহূর্তে অত সব আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছে আমার ছিল না। কারণ, তখন দারুণ ক্লান্ত ছিলাম আমি। আর তাছাড়া, বীরগঞ্জে থাকব-ই বা কতক্ষণ! একরাত্রি তো মাত্র! পরদিন ভোরবেলা উঠেই তো কাঠমাণ্ডুর বাস ধরব।

শুনলাম, বাস হোটেল কোসেলীর সামনে থেকেই ছাড়ে। শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু চিন্তা ধরিয়ে দিলেন হোটেলের ম্যানেজার। মালপত্রগুলো টাঙ্গা থেকে নামাবার সময় তিনি ফিস্‌ফিস্ করে যা বললেন, তার মানে দাঁড়ায় এইরকম, চুপ বাহাদুরের পাল্লায় পড়েছেন! সাবধান! ওর মাথা ঠিক নেই।

—মাথা ঠিক নেই? বলেন কি! আকাশ থেকে পড়লাম ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনে।

কিন্তু ততক্ষণে চুপ বাহাদুর আমাদের খুব কাছে এসে গেছে; এভারেস্ট্-এর গল্প আবার সুরু করেছে সে, চলো সাব! সাগর-মাথা চলো।

ম্যানেজার সাহেব আমাকে ইসারা করে ওকে বললেন, হ্যাঁ, যাবেন উনি সাগরমাথায়। কিন্তু তার আগে তুমি একটা কাজ কর! কাল ভোরের কাঠমাণ্ডুর বাসে ওঁর রিজার্ভেসানটা করে দাও।

—জী হুজৌর! বলল চুপ বাহাদুর। এবং তারপরেই আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে রিজার্ভেসান করতে চলে গেল।

ম্যানেজার বললেন, কী জানেন! লোকটার মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে।

—কিন্তু কেন? কেন বলুন তো? শুধালাম আমি।

একবার এভারেস্ট্-অভিযানে গিয়েছিল ও। ল্যাম্বার্ট না এরিক সিপ্টন না স্যার জন হাণ্ট—কার সঙ্গে যেন গিয়েছিল। ও উঠেওছিল অনেকদূর অবধি। কিন্তু ফেরবার সময় পথ হারিয়ে ফেলে বেচারী। প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে দল-ছাড়া হয়ে পড়ে। এবং তারপর অনেক কষ্টে প্রায় কুড়ি হাজার ফুট উঁচু এক-নম্বর ক্যাম্পে যখন ফিরে আসে, তখন ওর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

—কিন্তু কেন ওর এই বিকৃতি? আমার কৌতূহল এভারেস্ট্-এর মতই আকাশ-ছোঁয়া।

—ও নাকি অনেক কিছু দেখেছে। ম্যানেজার বলতে থাকেন, তুষারমানব দেখেছে নাকি ও। দেখেছে আরও কত কী!

—দেখলই বা! নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিলাম আমি।

ম্যানেজার সুরু করলেন, না, আসল ব্যাপারটা অত সহজ ভাববেন না। প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে, যেখানে মানুষের বোধশক্তিই অনেকখানি লুপ্ত হয়ে যায়, তেমন উঁচুতে সহায়-সম্বলহীন নিঃসঙ্গ কোন মানুষ অলীক ও অসম্ভব কিছু দেখলেও দেখতে পারে; এবং সবচেয়ে বড় কথা, সেই দেখাটাকেই সত্যি বলে ভাবতে পারে ও।

বললাম, ওঃ! তাই বুঝি! সেই থেকে ও বুঝি পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতেই আছে?

ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। ও যা কিছু করে, যা কিছু বলে—সব ওই পঁচিশ হাজার ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে।

—তা না হলে, একটু থেমে আবার শুরু করলেন তিনি, তা না হলে এই গরমে কে ওকে উলের কোট-প্যাণ্ট পরতে বলল। হাতে নিতে বলল আইস্-এক্স্!

শুধালাম, আইস্-এক্স্?

ম্যানেজার বুঝিয়ে দিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, আইস্-এক্স্।

ওর হাতে একটা লাঠি দেখেননি? ওইটেই আসলে আইস্‌-এক্স্‌। এক একদিন বীরগঞ্জের শক্ত মাটির ওপরেও ওই এক্স্‌ চালায় ও; বলে, সাগরমাথায় একনম্বর শিবিরে যাচ্ছি···এক একদিন আবার নতুন লোক দেখলেই ও ধরে বসে। বলে, নাম্‌চেবাজার চলো। সেখান থেকে চলো সাগরমাথা।···হ্যাঁ, ভালো কথা: আপনাকে ও সাহেবী কায়দায় অভিনন্দন জানায়নি?

বললাম, হ্যাঁ, জানিয়েছে।

ম্যানেজার বললেন, জানাতেই হবে। কারণ, এ জিনিসটি ও বিদেশী পর্বতারোহীদের অভ্যর্থনা করবার সময় শিখেছে।

—ওয়েল্‌কাম্‌ স্যার! ওয়েল্‌কাম্‌ টু দি লাক্সারী বাস! তাকাতেই দেখি, চুপ বাহাদুর। টিকিট হাতে নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করছে।

ম্যানেজার বললেন, যাক! এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন আপনি। কাঠমাণ্ডুর টিকিট পাওয়া গেল।

চুপ বাহাদুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেল কোসেলীর একনম্বর ঘরে গিয়ে বসলাম। কিন্তু বসতেই আর এক বিপদ। হঠাৎ চেনা-জানা একটা কণ্ঠ কানে এল, জয়! বাবা পশুপতিনাথ কী জয়!

জয়ধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দেখি, সেই বাঙালী ভদ্রলোক, অর্থাৎ, সেই তীর্থযাত্রীটি, যিনি আর একটু হলেই জেলযাত্রী হচ্ছিলেন।

—তারপর? কী খবর? ভয়ে ভয়ে শুধালাম তাকে।

তিনি বললেন, খবর মোটেই ভালো নয়; প্রাণে বেঁচেছি, এই পর্যন্ত। কিন্তু পকেট বাঁচেনি।

—বাঁচেনি?

—না মশাই, বাঁচেনি। পকেট গড়ের মাঠ করে ছেড়ে দিয়েছে ব্যাটারা। কড়ায়-গণ্ডায় ডিউটি উশুল করে ছেড়েছে।···তবে হ্যাঁ,

আমাকে ঘায়েল করা কি এতই সহজ! বালিশের তুটি খোলের ভেতর হাজার দশেক সিগারেট রেখেছি না! সে খবর তোরা পাবি কোথায়! যা নাকি বাবা পশুপতিনাথের দেবোত্তর সম্পত্তি, তা তোরা ধরবি কোত্থেকে!

বললাম, তা তো বটেই! তা তো বটেই! খোদ পশুপতিনাথ সহায় হলে কাস্টম্‌স্‌ ডিপার্টমেণ্ট্‌-এর সাধ্যি কী যে নাক গলায়!

আমার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন ভদ্রলোক। বললেন, নাক আর গলাতে হবে না। যা প্যাঁচ কষেছি, আর গলাতে হবে না নাক। এইবার থেকে সব দেবোত্তর সম্পত্তি অন্য রুটে পাচার করব।

এই অবধি বলে একটু থামলেন তিনি ; এবং তারপর রুট এবং দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কে আমাকে অচিরেই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল করবেন বলে ভরসা দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

আমি চুপ বাহাতুরের জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু সে আর এল না। তাকে দেখলাম পরদিন কাঠমাণ্ডু যাবার সময়।

কাঠমাণ্ডুর গাড়িতে সবে উঠে বসেছি, এমন সময় দেখি, হোটেল কোসেলীর পেছনের মাঠটাতে কী যেন সে করছে।

কী করছে সে? গাড়ি থেকে নেমে ভালো করে তাকাতেই দেখি, আইস্‌-এক্‌স্‌ দিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে মাটির ওপরেই সে আঘাত করছে।

কিন্তু কেন এই আঘাত? পঁচিশ হাজার ফুট উঁচু নিঃসঙ্গ হিমবাহ থেকে একনম্বর শিবিরে আসবার জন্যে? নাকি সাগর-মাথায় পৌঁছুবার জন্যে?

জানি নে। তবে এটা ঠিক জানি যে, চুপ বাহাতুর যদি আজও বেঁচে থাকে তো সেই পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতেই আছে। আইস্‌-এক্‌স্‌ আজও তার হাতে আছে নিশ্চয়। নিশ্চয় আজও কোন আগন্তুক দেখলেই সে বলে, ওয়েল্‌কাম্‌ টু নেপাল, স্যার! ওয়েল্‌কাম্‌!

ওয়েল্‌কাম্‌! ওয়েল্‌কাম্‌!

ওয়েল্‌কাম্‌ জানবার জন্যে প্রতিবেশী আমাদের তৈরি হয়েই আছে। চুপ বাহাদুর অনেক আছে নেপালে। যদি না থাকত তো সেদিন কাঠমাণ্ডুর গাড়িতে আমরা জায়গা পেতাম না। ভুল করে একই আসনে দু'সেট টিকিট দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের টিকিট হয়ত বাতিল হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হল না, বরং পরদেশীদের আগে যাবার সুযোগ দেওয়া হবে বলে বাতিল করা হল স্থানীয়দের টিকিট।

অথচ কে স্থানীয়, আর কে পরদেশী! বীরগঞ্জের পথ-ঘাটের দিকে তাকালে আপনার মনে হবে, ভারতেই আছেন। মনে হবে, নেপালীরাই পরদেশী ওখানে। কেননা, বীরগঞ্জে নেপালীর সংখ্যা যা, ভারতীয়ের সংখ্যা কম করে তার দশ গুণ।

এদিকে দেখতে দেখতে গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এল। আমরা যে-যার আসনে বসলাম। আর আমার ঠিক সামনের আসনটি দখল করে নিলেন সেই বাঙালী ভদ্রলোকটি।

—কিন্তু অধিকাংশ আসনই যে এখনও ফাঁকা! অন্য সব যাত্রীরা কোথায়?

ওকে শুধালাম একবার।

উনি বুঝিয়ে দিলেন, ভয় নেই। ওরা ঠিক উঠবে। সামনেই পড়ে বাজার। ওখান থেকে ওরা ঠিক উঠবে।

এদিকে কথা বলতে বলতে খেয়ালই করিনি; গাড়ি চলতে সুরু করেছে। বীরগঞ্জ বাজারের দিকে এগোচ্ছি আমরা।

বীরগঞ্জ শহরটি বেশ বড়োসড়ো। চোখ-ঝলসান দোকান-বাজার ও সুদৃশ্য ঘর-বাড়ি সেখানে অনেক আছে। তাছাড়া আছে স্কুল-কলেজ, হোটেল-রেঁস্তোরা, অফিস-হাসপাতাল ও কল-কারখানা ইত্যাদি বিচিত্র শহুরে উপকরণ।

তবে উপকরণগুলোর সবই যে দেখেছি, তা বলব না। বরং

বলব, ওদের দেখেছি যতটুকু ওদের সম্বন্ধে শুনেছি তার চতুর্গুণ এবং ওইসব শোনা কথা থেকেই ধরে নিয়েছি যে, এই বীরগঞ্জই হল নেপালের বড় শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেই অন্যতমটিকে একরকম উপেক্ষা করেই কাঠমাণ্ডুর দিকে এগোতে হল সেদিন এবং এগোবার সময় বার বার মনে এল, প্রতিবেশীর উঠোনের জনসমাগম যেমন—নেপালের এই শহরটির কলকোলাহলও তেমনি অদ্ভুত এক মাদকতা নিয়ে আমায় হাতছানি দিচ্ছে। কিন্তু হাতছানিতে সাড়া দেবার সময় তখন কই! গাড়ি তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। হোটেল কোসেলীর জনবিরল এলাকাকে পেছনে ফেলে জন-বহুল ও ঘিঞ্জি এলাকার দিকে চলেছে গাড়ি।

হ্যাঁ। জায়গায় জায়গায় খুবই ঘিঞ্জি নেপালের ওই শহর। এত ঘিঞ্জি যে, এক একবার মনে হচ্ছে, সামনের ওই ঘর-বাড়িগুলোর ওপর দিয়েই গাড়ি ছুটবে।

গাড়ি অবিশ্যি খুব সাবধানেই ছুটল। অতি সন্তর্পণে ঘর-বাড়ি ও মানুষজনকে পাশ কাটিয়ে বাজার এলাকায় এল।

শুনলাম, এইখানে চেকিং হবে আবার। আবগারী পুলিশ আবার বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে নিষিদ্ধ-বস্তুর ওপর।

ভাবলাম, নিষিদ্ধ-বস্তু! সর্বনাশ, আমার সামনের সহযাত্রীর বালিশের খোলেই তো···

কিন্তু না। ফাঁড়া কেটে গেল শেষ পর্যন্ত। বাজপাখির হিংস্রতা নিয়ে কোন পুলিশ কোন সহযাত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না। আমাদের জিনিসগুলোকে সামান্য একটু-আধটু যা ওরা খোলাখুলি বা নাড়াচাড়া করল, তার ফলে আর যা কিছুই হোক না কেন, বালিশ-রহস্য ভেদ হতে পারে না।

ওদিকে আবগারী পুলিশের রহস্যভেদের অবকাশে অবশিষ্ট সব যাত্রীরা গাড়িতে উঠেছে। আর দুটি শিশু চিৎকার সুরু করেছে তারস্বরে।

শিশু দুটির দিকে তাকাতেই গাড়ির আসনগুলোর দিকে চোখ পড়ল আমার। মনে হল, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলেন সহযাত্রীটি। বীরগঞ্জের বাজার এলাকায় আসতে না আসতেই গাড়ির শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে গেছে।

কিন্তু ওদিকে আমার পকেট যে শূন্য! একেবারে শূন্য! বীরগঞ্জে ভারতীয় মুদ্রা বদল করে নেপালী মুদ্রা সংগ্রহ করতে ভুলে গেছি। ওখানকার নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কে যাবার কথাও মনে হয়নি আমার। অতএব, এখন উপায়! পকেটের এই শূন্যতা ভরাবে কে?

—সত্যিই তো! কে ভরাবে! বাঙালী সহযাত্রীটিকে সে-কথা বলতেই তিনি আমার শূন্যতাকে দ্বিগুণ করে তুললেন। এবং তারপর একটু থেমে আমাকে একটুখানি আশ্বস্ত করে আবার সুরু করলেন, তবে উপায় একটা আছে বটে! নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক পথেও পাবেন আপনি। বীরগঞ্জে পাবেন, সিমরায় পাবেন, পাবেন কাঠমাণ্ডুতে; অতএব 'মনি এক্স্‌চেঞ্জ' যেখানে খুশি করতে পারেন। যে কোন 'এক্স্‌চেঞ্জ কাউন্টারে' পদধূলি দিয়ে বলতে পারেন, নিকালো নেপাল কা আসলী রূপয়া।

—কিন্তু যতক্ষণ না এইরকম বলতে পারছি, ততক্ষণ চলি কী করে? আমি জানালাম।

সহযাত্রী অভয় দিয়ে বললেন, কুছ্‌ পরোয়া নেই! ঠিক চলবেন! আমি চালিয়ে দেব।

—আপনি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই, আমি! বাবা পশুপতিনাথের ইচ্ছায় শুধু নেপালী মুদ্রা কেন, কিছু কিছু পাউণ্ড, ডলার এবং ইয়েনও আমার সব সময়ই সঙ্গে থাকে।

—বলেন কী?

—কী আবার বলব! ঠিকই বলি। কী জানেন, বাবা পশুপতিনাথ নানারূপে পৃথিবীতে আসেন। কখনও জাপানী

ট্র্যানজিস্টার এবং টেরিলিন-এর মধ্য দিয়ে, আবার কখনও মার্কিনী টেপ-রেকর্ডার এবং ক্যামেরার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে ধরা দেন তিনি। কিন্তু আমরা নির্বোধ, ধরেও তাঁকে ধরতে পারি না।

—হ্যাঁ, ভালো কথা, একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার সুরু করলেন সহযাত্রী, আপনি বাসের টিকিট কাটলেন কী করে? ইণ্ডিয়ান কারেন্সীতে? হোটেল, টাঙ্গা আর কুলি-ভাড়াও কি এই কারেন্সীতেই দিলেন?

বললাম, হ্যাঁ, তাই দিয়েছি।

—তা অবিশ্যি দিতে পারেন। কারণ, রক্সৌল এবং বীরগঞ্জে আই সি এবং এন্ সি দু-ই চলে। কিন্তু মশাই, বীরগঞ্জের পর থেকেই বাবা পশুপতিনাথের এলাকা। ওখানে চালাতে জানলে সবই চলে। আবার না জানলে কিছুই চলে না।

ঠিকই বলেছিলেন আমাদের সহযাত্রী—চালাতে জানলে সবই চলে, আবার না জানলে কিছুই চলে না। তা না হলে, এই যে আমাদের ঝরঝরে গাড়িটি আবার চলতে সুরু করেছে, এর পেছনে কি চালকের কেরামতি কিছুই নেই? এই যে আবার ছুটছি আমরা, বীরগঞ্জের পথঘাটকে পেছনে ফেলে দ্রুত এগোচ্ছি, এর পেছনে কি ওর হাত নেই কিছু?

ভাবলাম, কে বলে, হাত নেই! এ সংসারে প্রতিটি বস্তুর ওপরেই কারও না কারও হাত আছে। স্টিয়ারিং-এ হাত আছে ড্রাইভার-এর, টেরিলিনে সহযাত্রীর, আর নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কে সম্রাটের।

সম্রাট মহানুভব। রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক নেপালের যত্র-তত্র করে রেখেছেন তিনি। যার খুশি যাও। যত খুশি 'মনি এক্স্চেঞ্জ' করো।

'মনি এক্স্চেঞ্জ' সম্রাটের মহানুভবতার গুণেই করলাম শেষ অবধি। খানিকক্ষণ ছুটে আমাদের গাড়ি যে জায়গাটায় দাঁড়াল, দেখলাম, তার ঠিক সামনেই আছে এক নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক।

আর ভুল করি। চুপ বাহাদুরের সহযাত্রী হয়ে আর থাকি পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে।

মরীয়া হয়ে এবার সব টাকাই এক্স্‌চেঞ্জ করে নিলাম। কিন্তু করলে কী হবে। আসল এক্স্‌চেঞ্জ বুঝতে তখনও বাকি ছিল। মানুষ যে কী বিপুল উৎসাহে উর্বর তরাই-এর শাল-মহুয়ার বন কেটে ধান-গমের চাষ করছে, তা বুঝতে বাকি ছিল তখনও। তখনও বাকি ছিল জানতে যে, তরাই-এর কাছ থেকে বন-জঙ্গল গ্রহণ করছে মানুষ, তরাইকে কৃষিক্ষেত্র উপহার দিয়ে এক্স্‌চেঞ্জটা নিজের অনুকূলে টেনে আনবে বলে।

মনে পড়ে, এই অনুকূল এক্স্‌চেঞ্জ-এর বাহার নেপাল যেতে যেতে অনেক দেখলাম। দেখলাম, মাইলের পর মাইল জুড়ে সোনালী কৃষিক্ষেত্র।

শুনেছি, এই কৃষিক্ষেত্রেরই মুখ চেয়ে নাকি তাকিয়ে থাকে সারা নেপাল। কারণ, তার কর্ষণযোগ্য ভূমির দুই-তৃতীয়াংশই নাকি তরাই-এর ওই সোনালী প্রান্তরে।

অথচ প্রান্তর কতটুকু আর! নেপালের মোট ভূখণ্ডের আট ভাগের একভাগের চেয়েও কম ছাড়া বেশি তো নয়!

ভূখণ্ড কত যে বৈচিত্র্য-সমাকীর্ণ নেপালে! বন-পাহাড় ও মাঠ-ময়দান কত ঘন ঘন যে সেখানে রঙ্‌-বদলায়! রঙ্‌-বদলানো প্রথম দেখলাম অরণ্যে পৌঁছে। দেখলাম, কৃষি-এলাকা পেরিয়ে গাড়ি যখন অরণ্যে ঢুকল, সোনালীর বদলে সবুজ তখন চারিদিক থেকে আমাদের অভ্যর্থনা করছে।

এই অভ্যর্থনা কুড়োতে কুড়োতেই এক শরৎ-সকালে এগোলাম আমরা। পেছনে ফেলে এলাম সমতল প্রান্তর। সিমরার সমতল ভূমিকেও কখন যে পেছনে ফেলে এসেছি, তা ঠাওরই করিনি।

ঠাওর করে কী হবে। আমরা তো আর 'বাই এয়ার' কাঠমাণ্ডু যাচ্ছি না যে, সিমরার বিমানবন্দরটির জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকব!

আমরা যাচ্ছি দেখতে দেখতে, মাঠ-ময়দান আর বন-উপবনকে স্পর্শ করতে করতে। যাচ্ছি 'বাই রোড'। আর যাচ্ছি বলেই একথাটা একদিন সবিনয়ে জানিয়ে রাখব বলে ভাবলাম যে, প্রতিবেশীকে কেউ যদি ভালোভাবে চিনতে চান তো প্রথমেই উড়ে গিয়ে তার চালে জুড়ে বসবেন না। প্রথমে বসবেন তার আঙিনায়। তারপরে তার দাওয়ায় এবং তারপর তার ঘরে।

ঘরে যাবার আগে প্রতিবেশীর আঙিনাটি সযত্নে পেরোবেন আপনি এবং পেরোবার সময় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন, তার কোথায় কী আছে।

যাঁরা বিমানে চেপে সিমলা বা কলকাতা বা পাটনা বা দিল্লী থেকে কাঠমাণ্ডু যান, তাঁরা প্রতিবেশীর ওই আঙিনাটি দেখতে পান না। তাঁরা জানতে পান না, প্রতিবেশীর কত রস-রঙ্গ ওখানে উচ্ছ্বসিত।

এদিকে উচ্ছ্বসিত রসবতীকে দেখতে দেখতে এগোই আমরা। রঙ্গিণী রূপসীকে তারিফ করতে করতে পথ চলি।

কেন তারিফ করব না? রূপসী যদি নিবিড় বনের ঘোমটা জড়িয়ে রহস্যময়ী হয়ে ওঠে কখনও, আবার কখনও যদি বনফুলের জলসাঘরে ঐশ্বর্যময়ী হয়ে ওঠে, যদি ইউক্যালিপ্‌টাসদের বুকে নিয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়ায় কখনও, আবার কখনও যদি লতা-গুল্মের আভরণ গায়ে দিয়ে এই পৃথিবীরই শরিক হয়ে ওঠে, তো কেন করব না তারিফ?

পৃথিবী তো প্রাগৈতিহাসিক আঁধারকে ওই ঘন-নিবিড় অরণ্যেই ধরে রেখেছে। ওই অরণ্যের ছায়াতেই আদ্যিকাল স্তব্ধ হয়ে আছে এখনও।

ছায়া—কী যেন ঘন কালো ছায়া, তরাই-এর অরণ্যে—চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। কল্পনাই করা যায় না, অরণ্য চারিদিক থেকে পথযাত্রীকে কেমন করে ঘিরে ধরতে পারে।

অথচ ঘিরে তো ধরেছিল ঠিক। অরণ্য চারিদিক থেকে ঠিক তো আবেষ্টন করেছিল। এবং আমাদের ছোটাটা যদি শ্যাওলা-ঢাকা পুকুরের ওপর দিয়ে এগিয়ে-চলা কোন জলবিহারী সরীসৃপের মতো না হ'ত, তবে ঠিকই তো সেদিন হারিয়ে যেতাম আমরা।

আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে সর্বত্র চোখে পড়ল গহন-গম্ভীর বন এবং সেই বন দেখে মনে হল, জলবিহারী সরীসৃপ ছুটে যাবার পর পুকুরের শ্যাওলা যেমন তার আপন জায়গায় ফিরে আসে, ঠিক তেমনি আমরাও ছুটে-চলার সঙ্গে সঙ্গেই অগণিত তরু-রাজ আমাদের ফেলে-আসা পথটাকে আবার অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে; এবং দেখতে দেখতে মুছে যাচ্ছে পেছনে পড়ে-থাকা পথটা।

সামনের পথটাকেও তো মুছে-যাওয়া কোন স্বপ্নপুরী বলেই মনে হয়। মনে হয়, বনভূমির অনধিকার-প্রবেশ সেখানে রহস্যের প্রলেপ লাগিয়েছে, এবং যত এগোচ্ছি আমরা, ততই সেই প্রলেপ খুলে খুলে, ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ততই হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্নপুরী খুঁজে-পাওয়া ইন্দ্রপুরী হয়ে রঙ্-রসের রামধনু ছড়াচ্ছে।

রামধনু তো ছড়াবেই। ফুলে ফুলে, রঙে রঙে বন যদি হয় বহুরূপী, তবে ছড়াবেই তো রামধনু। মনে পড়ে, সেই রামধনু-আঁকা বহুরূপী বনের মধ্য দিয়ে চলেছি। আর সেই বনভূমিকে কাঁপিয়ে ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো চলেছে আমাদের গাড়িটা।

গাড়িটা ধুঁকতে ধুঁকতে, ফুঁসতে ফুঁসতে চলেছে সামনের পাহাড়ের দিকে।

পাহাড় এই এতক্ষণে চোখে পড়ল আমাদের। এতক্ষণে খেয়াল হল যে, প্রতিবেশীর ঢেউ-খেলানো অপরূপারা ধারে-কাছেই আছে।

ওই ঢেউগুলোকে ডিঙিয়ে যাব আমরা। ওই অপরূপাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ওদের গায়ের গন্ধ নিয়ে নিয়ে প্রতিবেশীর জলসাঘরে আমরা অভিসার করব।

কিন্তু সত্যি কি করব অভিসার? সামনের ওই যে দিগন্ত-

বিস্তৃত পাহাড়পুরী, লক্ষ ঢেউকে স্তব্ধ করে ঘুমন্ত একটা সমুদ্রের মতো যা নিথর হয়ে আছে, তাকে ডিঙোন সত্যি কি সম্ভব ?

মনে পড়ে, সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে কত কী ভেবেছিলাম সেদিন ! সেদিন দেখেওছিলাম কত কী ! দেখেছিলাম, আমাদের গাড়ি অরণ্যসমাচ্ছন্ন অতি সুন্দর এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়াল।

এই জায়গাটাকে বলে আমলেখগঞ্জ। রক্সৌল থেকে রেললাইন এসেছে এই অবধি। তবে এই লাইনে যাত্রীবাহী কোন গাড়ি চলে না ; চলে মালগাড়ি। মালগাড়ি রক্সৌল ও আমলেখগঞ্জ-এর মধ্যে বিচিত্র সব পণ্য-সম্ভার নিয়ে ছোটাছুটি করে।

করবে না কেন ছোটাছুটি ? নেপালের বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি যদি চলে ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে, তবে কেন রক্সৌল ও আমলেখগঞ্জ-এর এই সরু রেললাইনে ব্যস্ততা চোখে পড়বে না ?

কিন্তু খুব কি ব্যস্ত আমলেখগঞ্জ ? বাণিজ্যের ভারে খুব কি সে নুয়ে-পড়া ?

না, মোটেই তা নয়। বরং তাকে দেখলে মনে হবে, উন্নত আকাশ ও অরণ্যের সঙ্গেই তার মিতালি বেশি। সে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসীর মতো ধ্যাননিমগ্ন।

কলকোলাহল প্রায় কিছুই নেই আমলেখগঞ্জে। ঘর-বাড়ি এবং দোকানপাট যা আছে, আমাদের ভারতবর্ষের এমন কি ছোটখাটো গঞ্জের তুলনায়ও তা নগণ্য।

কিন্তু তবুও বলব, আমলেখগঞ্জ সত্যি বড় হয়ে উঠতে পারে একদিন। সত্যি সে নেপালের পণ্যশালার ওপর একদিন গার্জেনী করতে পারে।

আমলেখগঞ্জ গার্জেনী করবে তার বাণিজ্যিক পরিবেশ অনুকূল বলে। হাত বাড়ালেই একদিকে সে নেপালের পাহাড়ী ও তরাই অঞ্চলকে এবং অপরদিকে ভারতের সমভূমি অঞ্চলকে নাগাল পাবে বলে।

কিন্তু নাগাল পেতে এখনও অনেক দেরি বোধ করি। আমলেখগঞ্জ-এর ধ্যান ভাঙতে এখনও বোধ করি অনেকগুলো শরৎ অপেক্ষা করতে হবে।

এখন এই শরতে তো দেখছি, আঠারো মাসে বছর এখানে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে সেই যে উধাও হল তো হলই; আর পাত্তা নেই তার।

আমাদের এক সহযাত্রী বললেন, পাত্তা কী করে পাবেন? ওই দেখুন।

দেখলাম, ড্রাইভার পথের পাশের একটা বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধুচ্ছে; আর দাওয়ার ঠিক সামনেই এক কুয়ো থেকে ওকে জল তুলে দিচ্ছে একটি মেয়ে।

মনে হল, মেয়েটি ড্রাইভার-এরই হবে হয়তো। হয়তো প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে ঠিক এমনিভাবেই ক্লান্ত বাপকে সে সাহায্য করে।

কিন্তু বাপটি ফিরবে কখন? হাত-মুখ ধোবার পর মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে? না কি, খাবার পর কিছুক্ষণ দিবানিদ্রা দিয়ে? —ভাবছিলাম আকাশ-পাতাল। এমন সময় দেখি, সেই বাড়ি থেকে একটি যুবক বেরিয়ে এল। বেশ হন্তদন্ত হয়েই বেরিয়ে এল যুবকটি। এসে সোজা আমাদের গাড়িতে উঠল।

আমরা অনুমান করে নিলাম, পিতা-পুত্র সংবাদ; পিতা অবসর নিল, পুত্র এসে তার কাজে যোগ দিল।

পিতা বলল,—মাঝি তোর বৈঠা নে রে!

পুত্র বলল,—নিলাম।

পিতা বলল,—আমি আর বাইতে পারলাম না!

পুত্র বলল,—তাতে কী! আমি তো আছি!

—আমিও আছি! গাড়ি ছাড়বার মুহূর্তে দেখি, এক নেপালী বধূ ফুটফুটে একটি ছেলেকে কোলে করে দাঁড়িয়ে। ছেলেটি গাড়ির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।

—কে ও? প্রশ্ন করলাম নিজেকেই, ও কে? এই যুবক ড্রাইভারটির ছেলে? আর ওই নেপালী-বধূ? ছেলেটির মা নাকি ও? ডাইভারের জীবনসঙ্গিনী? সঙ্গিনী বুঝি ছেলেকে দিয়ে বলিয়ে নিল, আমিও আছি! বুঝি আভাসে বুঝিয়ে দিল ছেলে, বাবা আমার! একদিন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যখন বলবে, মাঝি তোর বৈঠা নে রে, তখন আমিও ঠিক বলব,—নিলাম! যখন বলবে, আমি আর বাইতে পারলাম না, তখন আমিও বলব,—তাতে কী! আমি তো আছি!

আছি! আছি! আছি! আকাশ জুড়ে, পাহাড় ফুঁড়ে সেদিন লক্ষ লক্ষ শিশু যেন কলকাকলী করে উঠল। যেন সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, আমরা সবাই আছি প্রাণকে যুগ থেকে যুগান্তরে নিয়ে যাব বলে। সবাই আমরা তৈরী!

দুই

তৈরী,—আমাদের নতুন ড্রাইভারটিও তৈরী হয়েই স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়েছে। বেশ পাকা হাতে গাড়ি চালাচ্ছে সে। আর গাড়িটা ছুটছে মার-খাওয়া বুনো জানোয়ারের মতো গর্জন করতে করতে।

জানোয়ার-মার্কা গাড়ির গর্জন বীরগঞ্জ-হেতৌড়া ও হেতৌড়া-কাঠমাণ্ডুর পথে হামেশাই শোনা যায়।

লোকে বলে, যাবে না শোনা? পথটা যে নেপালের রাজপথ এবং জনপথ—দুই-ই।

জনপথ কেন? না, পথটা লক্ষজনের চলার শরিক বলে।

কেন রাজপথ? না, রাজারও আপন বলে পথটা।

কিন্তু রাজায়-প্রজায় মিলে এ কী তামাসা জুড়ল এখানে? এ-পথটা আঁকাবাঁকা কেন এত? এ-পথ ধরে চলতে গিয়ে গাড়ির গর্জনকে এক-এক সময় দীর্ঘশ্বাস বলে মনে হয় কেন? কেন মনে হয়, মারখেকো জানোয়ারটা কাজের কাছে আত্মসমর্পণ করছে ক্ষণে ক্ষণে? আর হুকুম তামিল করবে বলে সেই জানোয়ার থেকে থেকে মুখ বুঁজে ছুটছে?

পথ চলতে চলতে ভাবি আকাশ-পাতাল। এক-এক সময় মনে হয়, হুকুম দেনেওয়ালারই দৌলতে হচ্ছে এ-সব। কারণ, পথটা যে ঢেউ-খেলানোই নয় শুধু; জায়গায় জায়গায় প্রায়-সমতলও বটে। কখনও উপত্যকার সোহাগে, আবার কখনও মালভূমির পিরিতে গা ভাসিয়েছে যে পথটা!

অবিশ্যি পিরিত বড় দরের নয় কোথাও। সোহাগ কোথাও নয় উপচে-পড়া। কারণ, উপত্যকা বা মালভূমি এই অবধি যতগুলো

চোখে পড়ল আমাদের, কোনটাই 'আহা মরি' কিছু নয়। কোনটাই উন্নত নয় খুব একটা।

মনে পড়ে, ওইরকম অনুন্নত এক সোহাগিনীর কাছেই আঁকা-বাঁকা একটা পথ ধরে নেমে এলাম সেদিন। ছায়াঘন এক উপত্যকার আতিথ্য নিতে নিতে সেদিন এগিয়ে চললাম।

উপত্যকাটি ছিল অপরিসর। ছিল অনেকটা যেন ম্যান্‌সান্‌-শোভিত সুপরিসর একটা রাজপথের মতো। ম্যান্‌সান্‌গুলোও আবার স্কাই-স্ক্র্যাপার নয় ঠিক। বরং ঠিক যেন দোতলা-তেতলা বেঁটে-খাটোরা সব।

হ্যাঁ, হেতৌড়া অবধি খাটোদেরই ভিড়। বেঁটে পাহাড়দেরই রাজত্ব।

দেখতে দেখতে ওই রাজত্বের একেবারে প্রান্তসীমায় পৌঁছুলাম। অপরিসর ওই উপত্যকায় ধূলি আর ঝরা-পাতার ঘূর্ণি-ঝড় তুলে, উপত্যকার প্রতিবেশী একটা সমতল-প্রান্তর পেরিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালাম হেতৌড়ায়।

এই হেতৌড়া জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচশো ফুট মাত্র উঁচু। কিন্তু এর ভাব-সাব দেখলে মনে হবে, এ যেন পাঁচ হাজার ফুটের মার্কা-মারা হিমালয়-পারিষদদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ব্যস্ত। অর্থাৎ কিনা, পাহাড়ীয়া কায়দা-কানুন পুরোপুরি রপ্ত করেছে এ। এবং এছাড়া আর একটি জিনিস যা রপ্ত করেছে, আমরা তাকে বলি যুগ-সন্ধিক্ষণের চিহ্ন।

—কিন্তু কেন বলি ? প্রশ্ন করতে পারেন কেউ কেউ ; এবং সে প্রশ্নের জবাবে বলতে পারি, বলি, তার কারণ, হেতৌড়ার পথঘাট, দোকান-বাজার সবকিছুর মধ্য থেকেই যেন অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিকতার শুরু।

—কিন্তু কী করে উচ্চারিত হচ্ছে ? এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া যেতে পারে হেতৌড়ারই একটা কাহিনী দিয়ে।

কাহিনী এক হোটেলকে ঘিরে।

হেতৌড়ার এক জনপ্রিয় হোটেল। গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ওখানে ঢুকি আমরা। আমাদের সংকল্প খুব সাধু। দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা ওখানেই সেরে নিতে চাই।

কিন্তু খাওয়া সারতে গিয়ে বিপদ। হোটেলের ম্যানেজারের অভ্যর্থনায় সবাই অস্থির একেবারে।

ম্যানেজারের পরনে টেরিলিন-এর শার্ট-প্যান্ট। শার্টের ওপরেই বুক-বরাবর শোভা পাচ্ছে ফুলের মালা ও মুকুট-পরা একটি মেয়ের ছবি।

—ছবিটি কিসের? ম্যানেজার-সাহেবকে শুধালাম একবার।

ম্যানেজার-সাহেব বললেন, কুমারী দেবীর।

—কুমারী দেবী? তিনি আবার কে?

—কে আবার! দেবী এখানকার। তামাম নেপালের দেবী।

—দেবীটি থাকেন কোথায়?

—কাঠমাণ্ডুতে। ওখানেই এঁর মন্দির আছে। সেই মন্দিরে রোজ পুজো হয় এঁর।

—পুজো আপনিও করেন নাকি?

—করি বৈকি! রোজ করি।

—রোজ?

—হ্যাঁ, রোজ। কী জানেন, আমার ব্যবসা-বাণিজ্যের সবই ওই কুমারী দেবীর দৌলতে।

ম্যানেজার-সাহেবের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ি। শুধোই, —বলেন কী?

ম্যানেজার-সাহেব ভক্তি-গদগদকণ্ঠে জবাব দেন, হ্যাঁ মশাই, ঠিকই বলি। 'লিভিঙ্ গডেস্'কে নিয়ে মিথ্যে বলব কোন্ সাহসে?

—'লিভিঙ্ গডেস্' কী জিনিস আবার?

—যে গডেস্ হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন, কাঁদতে পারেন, কাঁদাতে পারেন, কথা বলতে পারেন, চলতে-ফিরতে পারেন,—তাঁকেই আমরা বলি 'লিভিঙ্ গডেস্'।

—কী জানেন! একটা সিগারেট ধরিয়ে ম্যানেজার-সাহেব শুরু করলেন আবার, আসলে আমার-আপনার মতো সাধারণ লোকের ঘর থেকেই ওই গডেস্‌কে খুঁজে বের করা হয়। কুমারী দেবী সত্যি একজন কুমারী।

ভাবলাম, কুমারী দেবী কুমারী তো বটেই। কিন্তু ম্যানেজার-সাহেব কী? টেরিলিন-এর শার্ট-প্যান্ট পরা আধুনিক? না কি, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া মধ্যযুগীয়? সত্যি কী তিনি? আধুনিক, না মধ্যযুগীয়? মধ্যযুগীয়, না আধুনিক? আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হোটেলে থেকে বেরিয়ে আসি সেদিন।

বেরিয়ে শুনি, গাড়ি ছাড়তে নাকি দেরি হবে। কোথায় নাকি কী সব কল-কব্জা বিগড়ে গেছে ওর; সারাতে সময় লাগবে।

—এর মধ্যে আবার সারাসারির ব্যাপার! যতসব! খবরটা শুনে অবধি মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল অনেকেরই; এবং অনেকেই বাস-কোম্পানীকে তাক্ করে যে-সব বাক্যবাণ ছুঁড়লেন, 'স্ল্যাঙ্' নিয়ে গবেষকরাও সে-সবের খবর রাখেন না।

কিন্তু আমাদের বাঙালী সহযাত্রীটি বড় বেশি নির্বিকার যে!

নির্বিকারচিত্তেই বিকল যন্ত্রযানটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে পেয়ারা চিবোচ্ছেন তিনি।

কিন্তু তিনি কি শুধুই চিবোচ্ছেন? ফলাহার করছেন শুধুই? আর কোন ভাবনা তাকে কি ঘিরে ধরছে না? তার সঙ্গেই যে আছে কয়েক হাজার টাকা দামের ওষুধ আর সিগারেট, তিনি যে বে-আইনীভাবে মাল পাচার করছেন ভারত থেকে নেপালে, তা নিয়ে কি কোনই ভাবনা নেই তাঁর?

মরুক গে ভাবনা! তাঁর যা খুশি তিনি করুন। আমার তাতে

কী! আমি শুধু আমাদের বাহনের খবরটুকু চাই। গাড়ি কখন চলবে, তা নিয়েই ভাবনা আমার।

মনে পড়ে, ভাবতে ভাবতেই এগোলাম বাঙালী সহযাত্রীটির কাছে। বললাম, খবর শুনেছেন?

—হ্যাঁ, শুনেছি। সহযাত্রী নির্বিকার ও নিরুত্তাপ। যেন কিছুই হয়নি, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে তিনি বললেন, গাড়ির কল বিগড়েছে, এই তো?

বললাম, হ্যাঁ, এই। কিন্তু মেজাজ বিগড়োবার পক্ষেও এই কি যথেষ্ট নয়?

সহযাত্রী বললেন, না, নয়। মেজাজ এত সহজেই বিগড়ে গেলে চলবে কেন?

এবার রীতিমত অবাক হলাম আমি। বললাম, কিন্তু আসল পাহাড়ী পথ যে এখনও বাকি!

বাকি তো হয়েছেটা কী? কী এমন সর্বনাশ হয়েছে? বলেই একটু থামলেন সহযাত্রী; এবং তারপর উঠে-পড়ে লাগলেন আমাকে অভয় দিতে, না না মশাই, কোন ভয় নেই। এ হল বাবা পশুপতিনাথের এলাকা। এখানে লক্কড়-মার্কা গাড়িও দিব্যি হেলতে হেলতে, দুলতে দুলতে পাহাড় পেরোয়। আবার 'লেটেস্ট্ মডেল্'-এর গাড়িও ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ডিগবাজী খায়, খাড়া পাহাড় থেকে সোজা একেবারে পাতালে জাম্প দেয়।

এই অবধি বলে কী যেন ভাবলেন ভদ্রলোক; এবং তারপর অর্ধভুক্ত একটা পেয়ারাকে নিঃশেষ করতে করতে বললেন, ওফ্! একবার না, জোর বেঁচে গিয়েছিলাম মশাই! জাম্প আর একটু হলে দিয়েছিলাম আর কি!

এইখানে আবার থামলেন তিনি। পেয়ারার ছিব্ড়েগুলো ফেলতে ফেলতে আবার যেন দম নিলেন।

—ওফ্! সে এক বিদ্ঘুটে কাণ্ড! চোখ দুটিকে বিস্ফারিত করে

আবার শুরু করলেন তিনি, সে এক দুঃস্বপ্ন! আসলে হয়েছিল কী জানেন! চলেছিলাম এক ঝরঝরে প্রাইভেট-গাড়িতে। বেশ জোরেই চলছিলাম। কারণ, সঙ্গে বাবা পশুপতিনাথের পেসাদী ট্র্যান্‌জিস্টার কিছু ছিল।

এইখানে বাধা দিলাম আমি। বললাম, অর্থাৎ, ট্র্যান্‌জিস্টার নিয়ে কাঠমাণ্ডু থেকে রক্সৌল ফিরছিলেন?

ভদ্রলোক গদগদ হয়ে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই; ফিরছিলাম। কিন্তু আমি তো নিমিত্ত। ফিরছিলেন আসলে আমারই 'বস' বিক্রম ভাটিয়া। স্টিয়ারিংও ওঁর হাতেই ছিল।

—আর আপনার হাতে?

—বাবার আশীর্বাদী ফুল ছিল কিছু।

বললাম, কায়দাটা ভালো যা হোক!

সহযাত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন, ভালো কী মশাই! বলুন যে মন্দের ভালো। কারণ, পথে এক আবগারী পুলিশ তাড়া করল যে আবার!

বললাম, বাবার চ্যালাদের সে সন্দেহ করেছিল নিশ্চয়!

সহযাত্রী সায় দিলেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। সন্দেহ করেছিল। কিন্তু আমরাও দমবার পাত্তর নই। তাড়া খেয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম তীরের মতো। ছুটতে ছুটতে হেতৌড়ার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি, এমন সময় গাড়িটা···আমার দোষ নেই মশাই, বিক্রম ভাটিয়ার দোষেই গাড়িটা—

এইখানে আবার একটু দম নিলেন সহযাত্রী। পেয়ারার আরও কিছু ছিব্‌ড়ে ফেলে আবার শুরু করলেন, গাড়িটা এক পাহাড়ী ছেলের ওপর দিয়ে—, বলেই ভালো করে একবার চারিদিক দেখে নিয়ে বললেন, চলে গেল!

—চলে গেল? খুনী-স্মাগ্‌লার-এর কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম।

স্মাগ্‌লার শুরু করলেন, হ্যাঁ গেল। এবং ঠিক যাবার মুহূর্তেই গাড়ি দারুণভাবে লাফিয়ে উঠল। মনে হল, খাড়া পাহাড় থেকে জাম্প দিয়ে এই বুঝি পাতালযাত্রা করছি।

বললাম, যাত্রা করলে ভালো হ'ত। বাবা পশুপতিনাথের প্রসাদসহ অমরত্ব লাভ করতেন।

—লাভ করব মশাই! বাবা পশুপতিনাথের কিছু-না-কিছু প্রসাদ সব সময় আমার সঙ্গেই থাকে, সহযাত্রীটি নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে বললেন।

—তবে হ্যাঁ, একটু থেমে আবার শুরু করলেন তিনি, প্রসাদের জোর আছে। সেবার আইনের ফাঁক দিয়ে কোনক্রমে গলে গেলাম মশাই।

বললাম, তার মানে? কেউ আপনাদের ধরতে পারেনি?

—না না, পারবে না কেন? ধরেছিল ঠিক। ঠিক আমাদের বীরগঞ্জের জেলেও পুরেছিল। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। কথা হল, পেসাদী ট্র্যান্‌জিস্টারগুলো ঠিক সরিয়ে ফেলেছিলাম আমরা। এবং তারপর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা ছুটেছিলাম বাবা পশুপতিনাথের কাছে।

ছুটবার সময় বিক্রম ভাটিয়াও সঙ্গে ছিলেন নিশ্চয়?

—না, উনি ছিলেন না। স্টিয়ারিং হাতে থাকায় ওঁর জেল হল তিন বছর। আর আমার দু'মাস। কী জানেন, সামান্য একটু ভুল না করলে ওই দু' মাসও বীরগঞ্জের রদ্দি-মার্কা জেলে পচতে হত না আমায়।

—কিন্তু আপনি তো ভুল করবার পাত্র নন!

—না মশাই। ওকথা বলবেন না। সেদিন বিচারের সময় সামান্য একটু ভুল করেছিলাম। ওই জাম্পের কথাটা ফস্‌ করে বলে ফেলেছিলাম কোর্টে। আর কথাটা শোনা মাত্রই খেঁকিয়ে উঠেছিলেন বিচারক। বলেছিলেন, এ লোকটার দয়া-মায়া নেই। অতএব—

—অতএব, বুঝতেই পারছেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করলেন সহযাত্রী, ছ'মাস জেল খাটলাম এবং তারপর একদিন ছাড়া পেয়ে বাবা পশুপতিনাথের কাছে গিয়ে হত্যে দিলাম। বললাম, বাবা! বাবা গো! এ-যাত্রায় মারি-মারি করেও বাঁচিয়ে তো দিলে। এবং পুজোটাও নিলে যুৎসই-মাফিক; ভবিষ্যতেও ঠিক এমনি করেই বাঁচিয়ে দিয়ো বাবা! আবার পুজো দেব।

আর পুজো! সহযাত্রীর কথা শুনে সারা শরীর রী রী করে উঠল। মনে হতে লাগল, পালিয়ে বাঁচি ওর কবল থেকে।

কিন্তু পালাবই-বা কোথায়! হেতৌড়ার অচেনা মহল্লা ধরে কোথায়ই বা যাব?

এগিয়ে চললাম তবু। হেতৌড়ার প্রধান সড়কটা ধরে এগোলাম। খানিক দূর এগোতেই দেখি, পাহাড়। দেখি, রোপ-ওয়ে; বিরাট এক রোপ-ওয়ে ধরে পণ্য আসছে। শোনা গেল, কাঠমাণ্ডু থেকে আসছে সব।

কিন্তু কাঠমাণ্ডু কত দূর এখান থেকে?

স্থানীয় একটি কুলিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ২৮ মাইল।

—মাত্র ২৮ মাইল?

—জী হুজোর! মাত্র! কুলি বলল।

ভাবলাম, ২৮ মাইল যদি হয় তো কাঠমাণ্ডু এখান থেকে কাছেই বলতে হবে।

হ্যাঁ, খুবই নাকি কাছে, পরে শুনেছি। রোপ-ওয়ের হিসেবে কাছে, কিন্তু হাই-ওয়ের হিসেবে দূরে অনেকটা; প্রায় ৮৭ মাইল নাকি।

গাড়ি হাই-ওয়ে ধরে ঘুরে ঘুরে যায়; আর রোপ-ওয়ে যায় বন-জঙ্গল ধরে কোণাকোণি। তাই দূরত্বটা রোপ-ওয়ের বেলায় কমে আসে।

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় তবু, দূরত্বকে এইভাবে কমিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকে কতদূর বাড়াতে পেরেছে নেপাল?

লোকে বলে, বেশি দূর নয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত মানিকলালের 'নেপাল উইথ এ নিউ প্রমিজ' বইতেও পাচ্ছি হুবহু একই কথা, বেশি দূর নয়।

বেশিটা কোন্ জাদুতে হবে? যে রোপ-ওয়ের মাল বইবার ক্ষমতা ঘণ্টায় মাত্র ২৫ টন, সে কী করে এত বড় একটা দেশের বাড়তি ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার বইবে?

কিন্তু মরুক-গে ভার! সেদিন হেতৌড়ায় দাঁড়িয়ে তা নিয়ে তো আর হিসেব কষতে বসিনি!

সেদিন অন্য কথাই মনে এসেছিল বরং। মন বলেছিল, পঁচিশ নয়, পঞ্চাশ নয়, ঘণ্টায় না জানি শত শত টন পণ্য এ-পথ ধরে চলাচল করে।

আর পথটাও সত্যি অদ্ভুত। সত্যি ওটাকে আশ্রয় করে নেমে-আসা ট্রলি আর বাকেটগুলোকে অদ্ভুত মনে হয়। মনে হয়, দূরের পাহাড়ের চূড়া থেকে এই যে ওরা শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে, টলতে টলতে নেমে আসছে,—নেমে আসছে অথচ পড়ছে না—এর মধ্য দিয়ে হেতৌড়ার আরণ্যক মধ্যযুগীয় পরিবেশে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেন উচ্চারিত।

কিন্তু ওদিকে আমাদেরও জয়যাত্রার সময় হয়ে এল যে। গাড়ি সারানো হয়ে গেল। ঘন ঘন হর্ণ শোনা গেল তার। ড্রাইভার ডাকছে।

কিন্তু কোথায় ড্রাইভার! তাড়াতাড়ি এগোলাম তার খোঁজে। হেতৌড়ার ধূলি-ধূসরিত রাস্তাটা ধরে বলতে গেলে ছুটলাম।

খানিক দূর ছুটতেই দেখি, মহম্মদ পর্বতের কাছে নয়, পর্বতই মহম্মদের কাছে হাজির হতে ব্যস্ত। দেখি, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আমাদের দিকেই ছুটছে।

এইবার ছোটাছুটি বন্ধ করলাম। গাড়িটা আমাদের কাছে এগিয়ে আসতেই বীরদর্পে ওতে উঠে বসে আবার জয়যাত্রায় বেরোলাম।

জয়যাত্রাই বটে! গাড়ি ঘাটতি সময় পূরণ করবে বলে ক্ষেপে উঠল যেন। যেন তীরের বেগে ছুটল সামনের পাহাড়পুরীর দিকে।

পাহাড়পুরী রঙে-রসে ভরো-ভরো। একদিকে ঘন-সবুজ অরণ্যের সমারোহে আর অপরদিকে গাঢ়-হলুদ ফসলের ভারে বিচিত্রিতা।

কিন্তু ফসলের মহোৎসব কতটুকু আর দেখলাম সেদিন! অরণ্যের অভ্যর্থনা কুড়োতেই তো সেদিন সময় পেরিয়ে গেল।

দেখলাম, অরণ্যের অভিসার সামনের পাহাড়গুলোর গায়ে গায়ে। অপেক্ষাকৃত বড় পাহাড় এরা। অতি-সাবধানে এদের ওপর আঁচড় কেটে কেটে পথ করা হয়েছে।

এই হল ত্রিভুবন রাজপথ। ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশী নেপালকে উপহার দিয়েছে এই পথ। বিপুল পরিশ্রমে ও বিরাট অর্থব্যয়ে এই পথ সে গড়েছে। কিছুকাল আগেও রক্সৌল থেকে সরাসরি কাঠমাণ্ডু যাবার কোন রাস্তা ছিল না। যাত্রীদের অনেকবার গাড়ি বদল করে, অনেক জায়গায় পায়ে হেঁটে রাজধানীতে পৌঁছুতে হ'ত; এবং রাজধানী তখন অনেকের কাছেই ছিল দুর্গম। কিন্তু আজ ত্রিভুবন রাজপথের দৌলতে দুর্গম সুগম হয়েছে। আজ একদিনেই রক্সৌল থেকে কাঠমাণ্ডু পৌঁছুন যায়, এক দুপুরেই যাওয়া যায় হেতৌড়া থেকে রাজধানীতে।

শুনেছি, ওই রাজধানীতে বসেই নাকি স্বপ্ন দেখতেন রাজা ত্রিভুবন। ভাবতেন, পথ গড়ব; বিরাট পথ। সেই পথ ধরে হাসি-মুখে যাত্রীরা আসবে ভারত থেকে। আসবে পণ্য-বোঝাই সারি সারি গাড়ি।...কিন্তু ত্রিভুবনের স্বপ্ন সফল হয়নি। রাণা-রাজনীতির আবর্তে পড়ে সে-পথ তিনি গড়তে পারেননি। উল্টে তাঁকেই চুপি চুপি পালাতে হয়েছিল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে।

হ্যাঁ, ১৯৫০ সালের ৬ই নভেম্বর সিংহাসন থেকে নেমে এলেন তিনি। নেমে সোজা এসে আশ্রয় নিলেন কাঠমাণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাসে।

ভারত তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল। ডাকোটা বিমান পাঠিয়ে উদ্বাস্তু সম্রাট ও তাঁর পরিজনদের নিয়ে এসেছিল দিল্লীতে।

ওদিকে কাঠমাণ্ডু শহরে তখন হৈ-চৈ। একদিকে রাণা মোহন সামশের ত্রিভুবনের নাতি জ্ঞানেন্দ্র বীরবিক্রমকে সিংহাসনে বসিয়ে বলছেন, জয়! গণতন্ত্রের জয়! আর অপরদিকে প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে বলছে, জয়! রাজা ত্রিভুবনের জয়!

ত্রিভুবনেরই জয় হল শেষ অবধি। একদিকে ভারতের সহযোগিতা আর অপরদিকে প্রজাদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে শেষ অবধি আবার তিনি গিয়ে সিংহাসনে বসলেন।

১৯৫১ সালের ১৮ই নভেম্বর নেপালে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা সিংহাসনে বসেই ঘোষণা করলেন ত্রিভুবন; এবং শেষ অবধি অন্তর্বর্তী সরকার গড়াও হল। কিন্তু রাজপথ আর হল না। রক্সৌল রাজধানী কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হল না ত্রিভুবনের জীবিতকালে।

কিন্তু আজ এরা যুক্ত হয়েছে। আজ ত্রিভুবনের স্বপ্নে-দেখা পথ সত্যি হয়ে উঠেছে কত শত যাত্রীর কলকোলাহলে। কোলাহল আমরাই কী কম করলাম! আমাদের কয়েকজন নেপালী সহযাত্রী যখন একসঙ্গে গান ধরল, তখন কি কম কোলাহল ছড়িয়ে পড়ল ত্রিভুবন-রাজপথের আনাচে-কানাচে!

রাজপথটা সত্যি বিচিত্র। সত্যি পাক খেয়ে খেয়ে কখনও ওটা স্বর্গের দিকে উঠেছে; আবার কখনও নেমেছে পাতালের দিকে। তবে পাতাল-যাত্রার আয়োজনটা কম চোখে পড়ল এবার। আমরা মেতে উঠলাম স্বর্গের টানে। আমাদের গাড়ি এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে মেঘলোকের দিকে উঠতে লাগল। মেঘাচ্ছন্ন এক-একটি শিখরকে ডিঙিয়ে অন্য এক-একটি শিখরের দিকে ছুটতে লাগল। এবং ছুটতে ছুটতে, উঠতে উঠতে হঠাৎ এক সময় মনে হল, আমরা যেন চারিপাশের পাহাড়শ্রেণীর ছাদে উঠে এসেছি। আর, যেন ওই

ছাদে দাঁড়িয়ে আশেপাশের পাহাড়গুলোকে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ছোটখাটো প্রহরীদের পেছনে ফেলে এই এতক্ষণে নগাধিরাজের অন্দরমহলে পৌঁছুলাম।

হ্যাঁ, অন্দরের দেখা পাওয়া গেল এখান থেকেই। অথবা বলা চলে, এখান থেকে আর একটু এগিয়ে দামন থেকেই।

দামন জায়গাটা সত্যি অদ্ভুত। নগাধিরাজের অন্দরমহলকে দেখাবে বলে জায়গাটা যেন প্ল্যাটফর্ম-এর কাজ করছে। প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্ম।

দামনকে নিসর্গ-শোভা-সন্দর্শনের প্ল্যাটফর্ম বলি, অথবা বলি নিসর্গ-রসকুঞ্জ, যা কিছুই বলি না কেন, জায়গাটি সত্যি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপরূপ ও অনির্বচনীয়, তা বোধ করি অস্বীকার করা চলে না। বোধ করি কোনমতেই ভুলে যাওয়া চলে না নেপালে প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীতকে,—

নিকাই রাম্রো ঠাউন রাহেচ্ছ
দামন ছুন্ছ—ছুন্ছ—ঠিক ছ।

এই লোকসঙ্গীতটি আমি শুনেছিলাম কয়েকজন নেপালী সহযাত্রীর কাছ থেকে। দামনে পৌঁছেই এই সঙ্গীতটি ধরেছিল ওরা। নেপালী ভাষায়ই ধরেছিল। কিন্তু কোথায় পড়ে রইল ভাষার সীমানা! এই লোকসঙ্গীত আমাকে যেন অশ্রুতপূর্ব এক সুরের জগতে টেনে নিয়ে গেল।

—কী সঙ্গীত এটা? কী এর মানে? একবার শুধিয়েছিলাম গায়কদের একজনকে।

গায়ক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এটা একটা নেপালী লোকসঙ্গীত। এর মানে হল,—দামন জায়গাটা বড় সুন্দর। সত্যি সুন্দর। ঠিক সুন্দর।

মানেটা তখনই লিখে রেখেছিলাম; আর ভেবেছিলাম, দামনকে নিয়ে কোনদিন যদি কিছু লিখি তো এই লোকসঙ্গীতটা দিয়েই তার

গৌরচন্দ্রিকা করব; এবং তারপর বলব দামনের অন্যসব ঐশ্বর্যের কথা। কিন্তু আজ লিখতে বসে দেখছি, গৌরচন্দ্রিকাতেই ওখানকার সব ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। দামনের সত্যি জুড়ি নেই। কারণ, তার 'ভ্যু টাবর'-এ উঠে যে দৃশ্য দেখেছি, পৃথিবীর আর কোথায় তা দেখব!

টাওয়ারটির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, দামন আসবার অনেক আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম তাকে এবং দূর থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, পাহাড়ের ওপর কে যেন একটি পিলসুজ দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পিলসুজটির দিকে খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছিলাম আমরা। পাহাড় বেয়ে একটু একটু করে নেমে আসছিলাম। কিন্তু খুব বেশি আসতে হল না আমাদের। খানিকটা এসেই গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

শুনলাম, এই নাকি দামন। এর 'ভ্যু টাবর'-এ এখান থেকেই নাকি যেতে হয়।

কিন্তু 'টাবর'টি কোথায়?

গাড়ি থেকে নেমে ভালো করে তাকাতেই দেখি, ঠিক আমাদের সামনেই। সামনেই যে সান-বাঁধানো সিঁড়ি, তা ধরে খানিকদূর উঠলেই তার নাগাল পাওয়া যাবে।

উঠলাম আমরা। দেখতে দেখতে 'টাওয়ার'-এর একেবারে মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দেখি, মহিমময় হিমালয় তার রহস্যের অবগুণ্ঠন সরিয়ে নিয়েছে। আর সারা উত্তর-দিগন্ত জুড়ে তুষারাচ্ছন্ন শৈল-শিখররা অভ্যর্থনা করছে আমাকে। আমি স্পষ্ট দেখছি, আকাশস্পর্শী ধবলগিরি একপ্রান্তে মহামৌনীর মতো ধ্যান-নিমগ্ন আর অপরপ্রান্তে এভারেস্ট্ তার তিন পারিষদ নুপ্‌ৎসে, লোৎসে ও মাকালুকে সঙ্গে নিয়ে স্তব্ধ ও গম্ভীর। একপাশে অন্নপূর্ণা, মাছাপুছ্‌রে, হিমলচুলি ও মানালুস্নু আকাশ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে; আর অপরপাশে দাঁড়িয়ে গণেশ হিমল, ল্যাংটাং ও গৌরীশঙ্কর। কিন্তু

এরা ছাড়াও তো আরও কত কী ছিল সেই তুষারমৌলীদের মেলায়! ছিল আরও কত ভুবনবিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ। কিন্তু ওদের সকলকে আমি চিনতে পারিনি। এমনকি, অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি, দিগন্তের কোন্ মহলটা কে দখল করে রেখেছে।

আর না বুঝলেই বা ক্ষতি কী! ক্ষতি কী না চিনলেই! মহল তো আসলে একটা। একটাই তো রাজমহল হিমালয়ের সারা অন্তঃপুর জুড়ে। একটামাত্র মহলকেই তো চিনিয়ে দেবার জন্যে নানা নামে ভাগ করা, নানা নামে ডাকা। এই যে ধবলগিরি থেকে এভারেস্ট্ অবধি রূপের মিছিল, এ তো সেই এক ও অবিচ্ছিন্নেরই প্রকাশ। আর এই প্রকাশ যখন সত্যি, তখন কোন্ পর্বতশৃঙ্গকে চিনতে পারলাম, আর কোন্‌টাকে পারলাম না, তা নিয়ে অযথা হা-হুতাশ করি কেন?

সত্যিই তো! কেন করি হা-হুতাশ? টাওয়ার-এ দাঁড়িয়ে বার বার ভাবলাম সেদিন, কেন করি! তার চেয়ে নগাধিরাজের অখণ্ড মহিমাকে নিয়ে খুশি থাকি না কেন! কেন মনটাকে ভরিয়ে তুলি না অদূরবর্তী পালং-উপত্যকার জীবনস্পন্দনকে দিয়ে!

জীবনস্পন্দন তো শুনতে পাচ্ছি। পালং-উপত্যকাকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। দেখছি, নিচে—অনেক নিচে জীবনের বিচিত্র এক অভিসার চলছে পালংকে ঘিরে।

অভিসার পালং-এ, আবার দামনেও অভিসার; জীবনেরই অভিসার।

ওদিকে নেপালী সহযাত্রীরা লোকসঙ্গীতটা গেয়ে চলছে তখনও। তখনও দামন-এর রূপসী অরণ্যে-পর্বতে সেই সঙ্গীত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

প্রতিধ্বনি যেন টাওয়ার থেকে নেমে আসবার সময়েও কানে আসছিল আমার। বার বার আমার মনে হচ্ছিল, নর-জীবনের অভ্যর্থনা কুড়োতে কুড়োতে শাশ্বত জড়-জীবনকে দেখে এলাম দূরের

ওই তুষারাদ্রিদের মধ্যে। তুষারাদ্রিদের ঝলমলানির বিরাম নেই।

আকাশ পরিষ্কার ছিল সেদিন, তাই বিরাম নেই। তাই টাওয়ার বেয়ে নিচে নেমে এসেও দেখি, ঝালর ঠিক উড়ছে। ঠিক রুপোলী ঝালর ছড়িয়ে পড়ছে উত্তর-দিগন্তের আনাচে-কানাচে।

কিন্তু সেই ঝালরকে তারিয়ে উপভোগ করার সময় তখন কই। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া চাবুক মারছে একদিকে, আর অপরদিকে ড্রাইভার হর্ণ বাজিয়ে ঘন ঘন তাড়া দিচ্ছে।

ভাবলাম, এই তাড়াকে উপেক্ষা করলে হ'ত না? কয়েকদিন থাকলে ঠিক হ'ত না দামনে? থাকলে উত্তুরে হাওয়ার চাবুক দেখতে দেখতেই তো গা-সহা হয়ে যেত। পথের ধকলটা পুষিয়ে যেত কড়ায়-গণ্ডায়।

শুনেছি, থাকবার ভালো জায়গা আছে দামনে। আছে ট্যুরিস্ট্-বাংলো। কাঠমাণ্ডুতে নেপালের ট্যুরিস্ট্ ইন্‌ফরমেশান্ সেণ্টার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলোতে থাকবার অনুমতি নিতে হয়। তবে কারও ভাগ্যি যদি ভালো থাকে তো দামনে হঠাৎ-এসেও জায়গা পেতে পারেন তিনি। বাংলোর একটিমাত্র ঘরের দুটি শয্যার মধ্যে একটি তিন টাকা দিয়ে ২৪ ঘণ্টার জন্যে তিনি 'বুক' করে নিতে পারেন।

ড্রাইভার-সাহেবের কাছে শুনলাম, দামনে থাকবার এই সামান্য সুবিধেটুকু নাকি কয়েক বছর আগে ছিল না। ট্যুরিস্ট্-বাংলো নাকি তৈরি হয়েছে এই সেদিন। এই সেদিন ১৯৬৩ সালে নাকি তৈরি হয়েছে ৩৮ ফুট উঁচু 'ভ্যু টাবর'।

—ট্যুরিস্ট্‌রা আগে তাহলে কোথায় দাঁড়িয়ে দেখতেন? ড্রাইভারকে শুধিয়েছিলাম, কোথায় থাকতেন ওঁরা?

ড্রাইভার জবাব দিয়েছিল, থাকতেন না কোথাও। এসেই ফিরে যেতেন সব। আর দেখতেন এই পথে দাঁড়িয়েই।

বললাম, পথে দাঁড়িয়ে দেখতেন ?

—জী হুজৌর। পথেই, ড্রাইভার সুরু করল আবার, তবে এ পথটাকে সোজা কিছু ভাববেন না। এ বড় মজাদার ! শীতকালে এর দু'ধার রডোডেনড্রন ফুলে ছেয়ে থাকে। আর সেই ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে রঙ্‌-বেরঙের সব পাখি আসে এখানে।

শুধালাম, পাখিরা এখন কোথায় ?

ড্রাইভার বলল, ওদের কেউ কেউ এখন দেশান্তরী। কেউ আবার দেশেই মুখ গুঁজে বসে আছে রডোডেনড্রন-এর আশায়।

—আশা পুরবে কখন ? রডোডেনড্রন কখন ফুটবে ?

—ফুটবে সেই জানুয়ারি থেকে মার্চ অবধি। রডোডেনড্রন ছাড়াও অনেক রকম সব ফুল ফুটবে তখন। কিন্তু এই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ফুল নেই এদিকে। ফসল আছে। ঐ যে ! দেখুন না, বলেই পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা কিছু কৃষিক্ষেত্র দেখাল সে।

বললাম, আগেই দেখেছি ওদের।

—না দেখে উপায় নেই ! ড্রাইভার পরিতৃপ্তির হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠল একটু ; এবং তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে সুরু করল, কী জানেন ! এই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে শুধুমাত্র ওদের দেখেই অনেককে ফিরে যেতে হয়।

—কেন ? দূরের পাহাড়গুলো দেখতে পায় না ওরা ?

—না হুজৌর, পায় না। পাহাড় এ সময়ে মেঘে ঢাকা থাকে।

—কিন্তু আজ তো মেঘের ছিঁটেফোঁটাও দেখছি নে !

—আজ পাহাড়ের মেজাজ খুশি আছে বাবুজী। আর আপনার নসিবও ভালো আছে।

—নসিব-ফসিব বুঝি নে। তবে হ্যাঁ, পাহাড় যে বিলকুল খুশি এখন, তা তো নিজের চোখেই দেখছি।

—ফেব্রুয়ারিতে যদি আসতেন তো আরও খুশি দেখতেন পাহাড়কে।

—বলো কী! আরও?

—জী হুজৌর! আরও। গোটা দামনটাই তখন 'ভ্যু টাবর' হয়ে ওঠে। আর তখন যারা আসে, তারা পথে দাঁড়িয়েই দেখতে পায় সব।

ভাবলাম, তা হবে। হয়তো দেখতে পায়! কিন্তু উনি কী দেখছেন এতক্ষণ ধরে? আমার ওই বাঙালী সহযাত্রীটি? ড্রাইভার-সাহেবের সঙ্গে কথা বলার অবসরে একবার তাকালাম ওর দিকে। তাকিয়ে মনে হল, কিছুই দেখছেন না উনি। পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটায় হাত ঢুকিয়ে কী যেন গোছগাছ করছেন।

—এই যে! কী করছেন মশাই একা একা? 'টাওয়ার'-এ গেলেন না? ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধালাম একবার।

উনি তড়িতাহত হলেন যেন। যেন একেবারেই অপ্রত্যাশিত রকমের আঘাত পেয়েছেন, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বললেন, আরে দূর মশাই! দূর দূর! ওখানে গিয়ে কী হবে?

বললাম, তা তো বটেই! তা তো বটেই! কী হবে ওখানে গিয়ে!

সহযাত্রী এবার খুশি হয়ে উঠলেন আমার কথা শুনে। বললেন, ওসব কবিত্ব-টবিত্ব আমার আবার ধাতে সয় না। আমার বরং—

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সে-সবের কিছুই শোনা গেল না। গাড়ির গর্জনের মধ্যে হারিয়ে গেল তার বাকি কথাগুলো।

হ্যাঁ, গর্জন সুরু হয়েছে আবার। গাড়ি আবার চলতে সুরু করেছে। আমরা কাঠমাণ্ডুর দিকে এগোচ্ছি। বীরগঞ্জ থেকে দামন অবধি আমরা এগিয়েছি প্রায় ৭৬ মাইল। আর ৫৬ মাইল এগোলেই কাঠমাণ্ডু।

এদিকে নতুন একজন সহযাত্রী উঠেছেন আমাদের গাড়িতে। তিনি দামন থেকে উঠেছেন। যাবেন পালঙ্-এ।

দেখতে দেখতে আলাপ জমে উঠল তাঁর সঙ্গে। শুনলাম, নেপালে ইণ্ডিয়া এইড্ মিশনে কাজ করেন তিনি। কৃষি-গবেষণা বিভাগে টেকনিসিয়ান হিসেবে কাজ করেন। তাঁর নাম সুরেশচন্দ্র রক্ষিত।

ওই সুরেশবাবু আমার খুব কাছেই বসেছিলেন সেদিন। কিন্তু সেদিন আলাপ জমে ওঠা সত্ত্বেও ওই কাছের মানুষটির চেয়ে দূরের পাহাড়-পর্বতগুলো সম্বন্ধেই আমার কৌতূহলটা ছিল বেশি। এছাড়া দামন-পালঙ্ পথটাকেও পরম কৌতুকে উপভোগ করছিলাম যেন।

সোনালী উপত্যকা আর সবুজ পর্বতশীর্ষকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে পথটা। এঁকেবেঁকে ঘুরে-ফিরে পালঙ্-উপত্যকার দিকে নেমে গেছে।

পালঙ্কে দেখতে পাই আজও। আজও মনে পড়ে, দামন থেকে সর্পিল একটা পথ ধরে নামছি। আর দূরে, অনেক দূরে অতি সুন্দর ধূসর একটা উপত্যকা ছবি-আঁকা কার্পেটের মহিমা নিয়ে আমাদের সামনে স্তব্ধ।

আমরা দ্রুত এগোচ্ছি পাহাড়ী পথ ধরে। অতি সুন্দর একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে যেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামছি।

খানিকক্ষণের মধ্যেই তিন-চার হাজার ফুট নেমে এলাম আমরা। পালঙ্ এলাম।

পালঙ্ পৌঁছে দেখি, সোনায় ঢাকা চারিদিক। মাঠে-ময়দানে সোনালী ফসলের জোয়ার।

মনে পড়ে, এই জোয়ার দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম একবার। সুরেশবাবুকে বলেছিলাম, নেপালের অভাব নেই তবে! এত যার ঐশ্বর্য তার আবার অভাব কিসের?

—না মশাই, অভাব আছে। প্রতিবেশী সম্পর্কে আমার উঁচু ধারণাটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে দিলেন সহযাত্রী। বললেন, অভাব খুবই আছে মশাই।

সেদিন ওই সুরেশবাবুর কাছ থেকেই প্রতিবেশীর অভাব সম্পর্কে আরও কিছু শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, প্রায় এক কোটি লোক অধ্যুষিত নেপালে প্রতি বছর লোকসংখ্যা বাড়ছে ১ লক্ষ করে। কিন্তু খাদ্যের উৎপাদন বাড়ছে তো না-ই ; উল্টে কমে যাচ্ছে বরং। ১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদন কমেছে আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৭ ভাগ। আর ১৯৬৬-৬৭ সালে কমেছে শতকরা ১১ ভাগ।

—এই হারে যদি কর্মতির দিকে পা বাড়ায় নেপাল, তবে কয়েক বছরের মধ্যেই সে তো শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে ! সুরেশবাবুকে বললাম একবার।

—তা তো দাঁড়াবেই, সুরেশবাবু জবাব দিলেন, জমার চেয়ে খরচ যদি কারও বেশি হয়, তবে দেউলিয়া সে তো হবেই !

—কিন্তু আপনারা কী করছেন এজন্যে ? আপনারা টেকনিসিয়ানরা ?

—আমরা ? হো-হো করে হেসে উঠলেন সুরেশবাবু ; এবং তারপর কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, আমরা গবেষণা করছি।

বললাম, কেন ? গবেষণা সাক্সেস্ফুল হয়নি আপনাদের ?

—না, হয়নি ; সুরেশবাবু সুরু করলেন আবার, সাক্সেস্ফুল মোটেই হয়নি। কী করে হবে ! শুধুমাত্র ৪১টা রিসার্চ-সেণ্টার খুলেই সরকার যদি বলে ওঠেন, কাজ হাসিল !—আর সরকারী চাকুরেরা বলেন, কাজ পেয়েছি ! —তো কী করে হবে সাক্সেস্ফুল ? কাজের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন কোথায় ? সত্যিকারের প্ল্যানিং কোথায় দেশে ?

—প্ল্যানিং আপনারাই তো করবেন।

—হ্যাঁ করব ; ইণ্ডিয়া এইড্ মিশনের কাজে প্রথম এখানে এসে তাই ভাবতাম বটে। কিন্তু চার বছর বাদে এখন কী ভাবছি জানেন ? এখন ভাবছি, নেপালের প্ল্যানিং নেপালীরাই করুক।

—নেপাল সরকার এ নিয়ে কিছু ভাবছেন না ?

—ভাবছেন, প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠাচ্ছেন ওঁরা। আর দেশে এদিকে প্রতি বছরই খাদ্যের উৎপাদন কমছে। এখানে একটু থামলেন সুরেশবাবু এবং তারপর অনেকটা দার্শনিকের সুরে বললেন, তাই বলছিলাম,—আমরা ? আমরা গবেষণা করছি।

এদিকে কথা বলতে বলতে খেয়ালই করিনি, গাড়ি কখন এসে পালুঙ্-উপত্যকার এক লোকালয়ের সামনে দাঁড়িয়েছে।

সুরেশবাবু বললেন, আসি এইবার ! এইবার নামতে হবে।

বললাম, এখানেই নামবেন ?

—হ্যাঁ এখানেই ; এখানেই সুরু হবে নতুন গবেষণা। বলে হাসতে হাসতে সুরেশবাবু বিদায় নিলেন।

কিন্তু আমার সামনে থেকে এক মুহূর্তে সব হাসি কোথায় যেন উবে গেল। আমার যেন মনে হল, কান্না শুনতে পাচ্ছি ; নেপালের অসহায় বুভুক্ষুদের কান্না। আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি, নিরন্ন মুমূর্ষুদের আর্তনাদ। আর সেই আর্তনাদে পালঙ্-এর সোনাভরা প্রান্তর দেখতে দেখতে ভারী ও থমথমে হয়ে উঠল। যেন সব সোনা চাপা পড়ে গেল সোনার চেয়েও দামী কিছু হতভাগ্যের চোখের জলে।

কিন্তু হতভাগ্যেরা বড় অদ্ভুত। পৃথিবীর সব দেশেই বড় অদ্ভুত ওরা। হাজার বার পেটের নাড়ী শুকিয়ে গেলেও ওরা বলে, আমরা বাঁচব। হাজার ঝরনা চোখে জন্ম নিলেও ওরা বলে, আমরা হাসব।

হাসে ওরা ঠিকই। ঠিক ওরা বাঁচে। না যদি বাঁচত, তবে পালঙ্-এর এই মাঠে-ঘাটে নিশ্চয় শ্মশান দেখতাম আজ। নিশ্চয় দেখতাম, অতি সুন্দর এই উপত্যকা হঠাৎ অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে মহাশ্মশানের বিভীষিকা নিয়ে আমায় ভয় দেখাচ্ছে।

কিন্তু ভয় তো দেখায়নি পালঙ্। বিভীষিকাও হয়ে ওঠেনি ! বরং অভয়েরই শিখাটিকে প্রদীপ্ত করে তুলেছে। আশ্চর্য এক

জীবন-রঙ্গমঞ্চকে সামনে মেলে ধরে বলেছে, ছাখ! শত দুঃখের অনলে জ্বলেপুড়েও জীবন কত সুন্দর, তার সাক্ষী হও।

সাক্ষী তো হয়েই আছি, বার বার মনে হয়েছিল সেদিন, জীবন-নাটককে দেখব বলে প্রেক্ষাগৃহের একেবারে ভেতরেই তো বসে আছি।

আর নাটকও ঠিক অভিনীত হচ্ছে। সামনেই পালঙ্-উপত্যকা থেকে ঠিক ভেসে আসছে জীবনস্পন্দন।

ভাবলাম,স্পন্দন ভেসে আসবে না? মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য যদি আলোকসম্পাতে থাকে, যদি নগাধিরাজ থাকে মঞ্চসজ্জায় এবং সেই মঞ্চ যদি অগণিত পাত্র-পাত্রীর কলকোলাহলে কেবলই মুখরিত হতে থাকে, তবে আসবে না ভেসে স্পন্দন?

আমার ঠিক সামনেই তো স্পন্দিত জীবনের অভিসার দেখছি। দেখছি, কর্মযজ্ঞ চলেছে পাহাড়ীয়া পালঙ্-এর মাঠে-ময়দানে।

কৃষকরা চলেছে কোথাও; পাকা ফসল মাথায় নিয়ে গাঁয়ে ফিরছে। কোথাও চলেছে কৃষক-বধূরা; গাঁয়ে-আনা ফসল ঘরে তুলছে।

ঘরগুলো বড় সুন্দর ও ছিমছাম। ওদের কোনটা একতলা, কোনটা দোতলা। কোনটা ময়দানের মাঝখানে, কোনটা পথের গা ঘেঁষে। কোনটা দূরের পাহাড়ের গায়ে গায়ে, কোনটা আবার পাহাড়ের ঠিক পাদদেশে।

প্রতিটি ঘরেরই অর্ধেকটা পরিমাণ দেওয়াল গিরিমাটি দিয়ে রাঙানো। আর বাকি অর্ধেক রাঙানো চুন দিয়ে। ফলে, সাদাতে আর গেরুয়াতে মিলে ভারী রমণীয় হয়ে উঠেছে ওরা। দূর থেকে ওদের দেখে মনে হচ্ছে, হব নাকি অতিথি? ওদের কোন একটিকে আশ্রয় করে কাটিয়ে দেব নাকি কয়েকটা দিন?

কিন্তু তা আর হল কই! পালঙ্-উপত্যকায় কই আর থাকা হল! উপত্যকাটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সংকোচ কাটাতে না

কাটাতেই তো যাবার সময় হয়ে এল আমাদের। আমরা আবার পাহাড়-ঘেরা পালঙ-এর সমতল প্রান্তর ধরে ছুটলাম। প্রান্তরের উত্তর সীমায় রয়েছে ঘন সবুজ পর্বতশ্রেণী। সেই পর্বতের দিকে ছুটলাম আমরা।

ছুটতে ছুটতে, ছুটতে ছুটতে দম দিতে হল একবার। আমাদের গাড়ি একবার এসে এক পাহাড়ী পল্লীর সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার-সাহেব হুকুম দিলেন, চায় পী লেও!

বুঝলাম, টী-ইণ্টারভ্যাল, চা-পানের অবসর। কিন্তু কোথায় চা? সামনে একটি মাত্র যে দোকান চোখে পড়ছে এবং যে পরিমাণ ভিড় চোখে পড়ছে সেখানে, তা ঠেলে এগিয়ে গিয়ে আর যা কিছুই করি না কেন, চা-পান করতে পারব না। কারণ, চা নামক তরল পদার্থটিকে কাপ বা গ্লাস বা ভাঁড় নামক যে সব ভঙ্গুর পাত্রে রাখা হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে জনতার চাপ সহ্য করার মতো শক্তি তাদের নেই। এছাড়া চায়েরও শক্তি নেই জনতার ধাক্কা উপেক্ষা করে মাধ্যাকর্ষণের সূত্রকে লঙ্ঘন করার। তাই ঠেলাঠেলি যেখানে, পিপাসুর হাত থেকে সেখানে সে ছিটকে পড়বেই। অতএব এখন উপায়!

উপায় যে কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না এবং নিরুপায় হয়েই যে সামনের দোকানটির দিকে বার বার তাকাচ্ছি, তা বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালী সহযাত্রীটি। তাই হঠাৎ উপযাচক হয়ে আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করলেন তিনি। বললেন, চা খাবেন নাকি মশাই? যদি খান তো দিতে পারি। আমার ফ্লাস্কে আছে।

বললাম, ধন্যবাদ! চায়ের জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না আপনাকে।

—ব্যস্ত আবার কে হল মশাই! সামান্য একটু চা, কী যে বলেন!

বললাম, না না, থাক।

—থাকবে কেন? থাকবে কেন? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক এবং মুহূর্তের মধ্যে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে সুরু করলেন।

আমি প্রতিবাদের শেষ চেষ্টা করলাম, ফ্লাস্‌ক-এর চা আমার আবার ভালো লাগে না।

—ভালো লাগে না? সহযাত্রী আমার কথা শুনে থ; কিন্তু কেন ভালো লাগে না বলুন তো? সবিস্ময়ে শুধালেন তিনি।

বললাম, কারণ নেই কিছু। এমনি।

—এমনি কী আর্ হতে পারে! নিশ্চয় কিছু একটা কারণ আছে। নিশ্চয় ফ্লাস্‌ক-এর চা-তে সোঁদা সোঁদা গন্ধ পান আপনি। বলেই একটু থামলেন ভদ্রলোক; এবং তারপর আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে বললেন, কিন্তু এ চা সম্পর্কে নিশ্চিন্তি। খাঁটি দার্জিলিঙ্ চা এ। এ এতক্ষণ ছিল জাপানী ফ্লাস্‌ক-এ।

বললাম, জাপানী ফ্লাস্‌ক আবার কোথায় পেলেন?

—বলেছি তো! বিনয়ে গদগদ হয়ে জবাব দিলেন সহযাত্রী, আগেই তো বলেছি, আমার সব কিছু বাবা পশুপতিনাথের দয়ায়।

মনে হল, ভণ্ডামী—আবার ভণ্ডামী সুরু করেছে লোকটা।

এদিকে লোকটার সঙ্গে পেরে উঠলাম না বি চা শেষ পর্যন্ত খেতে হল।

চা খেলাম; কিন্তু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারলাম না কিছুতেই। কিছুতেই ঠাওর করতে পারলাম না, ওকে বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও এবং এমনকি অপমান করা সত্ত্বেও কেন ও আমাকে খুশি করার ফিকির খুঁজছে। আর কেনই বা এমনকি স্মাগ্‌লিঙ্-এর গোপন-রহস্য ফাঁস করে দিচ্ছে আমার কাছে।

এই সব 'কেন'-র জবাব পালঙ্-এর পথেই সেদিন পেয়েছিলাম। সহযাত্রী হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, বুঝলেন কিনা, আপনি হলেন ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাই আপনার একটু সেবা করেছি। তাই বিশ্বাসও করেছি আপনাকে।

বললাম, আমি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান তা জানলেন কী করে?

—কী করে জানলাম? এইবার হো হো করে হেসে উঠলেন সহযাত্রী। বললেন, জানলাম আপনার পোর্টফোলিও ব্যাগটা দেখে। ওরই গায়ে কার্ডের ওপর আপনার নাম লেখা দেখে।

বললাম, শুধুমাত্র নাম দেখেই আপনার এত ভক্তি? ব্রাহ্মণ-সন্তানের প্রতি এত বিশ্বাস আপনার?

—বিশ্বাস হবে না? বিশ্বাস হবে না? ব্রাহ্মণই যে দেবতা; দেবতাই যে ব্রাহ্মণ! বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন সহযাত্রী এবং আমার মনে হল, আমাকে উপলক্ষ্য করে সেই নমস্কার উনি জগতের সমস্ত ব্রাহ্মণের কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন।

কিন্তু উনি দিতে চাইলেই নমস্কার পৌঁছুবে কি? কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে উনি কি কোনদিন পৌঁছুতে পারবেন ন্যায় ও সত্যের আলোক-রাজ্যে? পারবেন না বোধ করি। কারণ, একশ্রেণীর মানুষকে কথায় কথায় যারা দেবতা বানায়, অপর শ্রেণীকে কথায় কথায় পশু বানাতে তাদের বিবেকে বাধে না। এবং এমনকি সেই অপরশ্রেণীর কোন একজনের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেও তাদের মনে হয় না, অন্যায় কিছু হয়েছে।

সেদিন পালঙ্‌-এর পথে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীর কাছ থেকে চা খাবার সময় ভাবছিলাম এসব। আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। এমন সময় হর্ণ কানে এল। ড্রাইভার-সাহেবের সাংকেতিক আহ্বান, ইণ্টারভ্যাল ওভার, অ্যাগেন টু স্টার্ট।

স্টার্ট দেওয়া হল আবার। আবার সুরু হল পথ-চলা।

এবার আমাদের পথটা একটু যেন আঁকাবাঁকা। একটু যেন ঢেউ-খেলানো প্রান্তর ধরে চলেছি আমরা। চলেছি আমাদেরই পথ-রোধ করে দাঁড়িয়ে-থাকা বিরাট এক পর্বত-প্রাচীরের দিকে।

শুনলাম, ওই প্রাচীরটিকে ডিঙোতে হবে আমাদের। প্রাচীর বেয়ে ওপরে উঠে অনেকটা নিচে নেমে আসতে হবে এবং নামলেই চোখে পড়বে কাঠমাণ্ডু-উপত্যকা।

কিন্তু কাঠমাণ্ডু কত দূরে আর! চলছি তো চলছিই, ছুটছি তো ছুটছিই। পথ যে আর ফুরোয় না! এদিকে আমাদের পথটা এখন যেন স্বর্গের দিকে উঠল। কাঠমাণ্ডু-প্রহরীটির গা বেয়ে আকাশের দিকে উধাও হল যেন।

আকাশের নাগাল হাত বাড়ালেই বুঝি পাব এবার। বুঝি একটু এগোলেই মেঘ নামক সামনের ওই পেঁজা তুলোগুলোর ভেতর হারিয়ে যাব।

কিন্তু হারিয়ে কই আর গেলাম! পেঁজা তুলো কই আর নিরুদ্দেশের গান গাইল! ত্রিভুবন রাজপথ ওকে যে সরু এক ফালি সুতোর মতো বিদীর্ণ করে দিয়ে চলে গেছে।

রাজপথ গেছে। আর সেই সঙ্গে গেছে রাজধানীগামী যাত্রীরা। লরী চেপে দাঁড়িয়ে গেছে কেউ, আবার কেউ গেছে শৌখিন 'প্রাইভেট কার'-এ চেপে। স্টেশন-ওয়াগনে গেছে কেউ, আবার কেউ গেছে বাস-এ।

আমাদের বাহন বাস। জোড়াতালি-দেওয়া একটা বাস। কিন্তু হলে হবে কি! শক্তি তার অসাধারণ। চড়াই বেয়ে সিংহবিক্রমে সে ওপরে উঠতে লাগল। এবং দেখতে দেখতে পাহাড়-প্রাচীরটিকে ডিঙিয়ে সে এসে দাঁড়াল কাঠমাণ্ডু-উপত্যকার মুখোমুখি।

উপত্যকাটিকে অপরূপ মনে হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে, পাহাড়-ঘেরা আশ্চর্য একটা দেশ রূপকথার জগৎ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছে। আর সে দেশে লক্ষ লক্ষ সবুজ নিশান উড়িয়ে রাজপুত্তুর ফিরেছেন দিগ্বিজয় সেরে।

হ্যাঁ, সবুজেরই সমারোহ কাঠমাণ্ডু-উপত্যকায় এবং সবুজ সেখানে দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্রের বিজয়-নিশানের মতোই উদ্ধত, উন্নত ও অপ্রতিরোধ্য। সে উপত্যকার মাঠ-ময়দান সবুজ, বন-উপবন সবুজ, সবুজ উপত্যকা-প্রহরী পর্বতগুলো।

প্রহরী-পর্বতগুলোরই একটির গা বেয়ে নিচে নেমে আসছি

আমরা। নামছি নেপালের সবচেয়ে বড় উপত্যকাগুলোর একটিতে। অথবা বলা যায়, নামছি সেই এক ও অদ্বিতীয় উপত্যকাটিতে, যাকে ঘিরে নেপালের ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে বরাবর ; যা' যুগ যুগ ধরে নেপালের ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পীঠস্থান।

পীঠস্থানটিকে ডিম্বাকৃতি মনে হচ্ছে। হয়তো বা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে অনেক উঁচু থেকে দেখছি বলেই মনে হচ্ছে এমন। আর মনে হচ্ছে নদীমাতৃক।

নদী বাগমতী মা হয়ে উঠেছে সে-দেশে। এবং অসংখ্য শিরা-উপশিরাকে নিয়ে মায়ের দেহটি যেমন, বহু-বিচিত্র উপনদী-শাখা-নদীকে নিয়ে বাগমতীও তেমনি সে-দেশে স্নেহাঞ্চল বিছিয়েছে। পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে আসার সময় হয়তো অনেকেই দেখতে পাবেন সেই স্নেহাঞ্চলটিকে। দেখতে পাবেন, বাগমতীর শাখানদী বিষ্ণুমতীও সেখানে স্নেহময়ী ঐশ্বর্যবতীকে চিরন্তনী করতে ব্যস্ত।

ভাবলাম, চিরন্তনী সে তো বটেই। বাগমতী ও বিষ্ণুমতীর দেশ কাঠমাণ্ডু-উপত্যকা চিরন্তন সৌন্দর্যেরই তো রসকুঞ্জ। তা' না হলে সে সৌন্দর্যে অবগাহন করে যুগ যুগ ধরে এত মানুষ বলবে কেন, অনির্বচনীয়কে দেখলাম। কেন বলবে, যা' দেখলাম এখানে, আর কোনদিন কোথাও তার দোসর খুঁজে পাইনি।

সেদিন কাঠমাণ্ডু-উপত্যকায় নেমে আসার সময় পাওয়া-না-পাওয়ার এই সব বিচিত্র ভাবনা ঘিরে ধরছিল আমায়। বার বার আমার মনে হচ্ছিল, রূপলিপ্সু অগণিত মানুষের প্রশস্তি শুনছি। প্রথম-দর্শনে রূপসীর মোহে আচ্ছন্ন হয়েছে ওরা। তাই যুগ যুগ ধরে ওরা বলছে, যা' দেখলাম এখানে, আর কোনদিন কোথাও তার দোসর খুঁজে পাইনি।

কিন্তু সত্যি কি তাই? আজ ভাবি, দোসর সত্যি কি খুঁজে পাওয়া যায় না?

আজ বার বার মনে হয়, কে বলল পাওয়া যায় না? কাঠমাণ্ডুর দোসর কি কাশ্মীর নয়? কাশ্মীরের দোসর কি নয় কুলু?

জানি নে, কে কার দোসর! তবে এটুকু বেশ জানি যে, সেদিন কাঠমাণ্ডু-উপত্যকায় অবতরণ করলাম যখন, তখন আমিও সেই প্রথম-দর্শনে আত্মবিস্মৃতদের মতোই মনে মনে উচ্চারণ করেছিলাম, অনির্বচনীয়কে দেখলাম! যা' দেখলাম এখানে, আর কোনদিন কোথাও তার দোসর খুঁজে পাইনি।

—কী অত দেখছেন মশাই? সেদিন চমক ভাঙল বাঙালী সহযাত্রীটির কথায়। উপযাচক হয়ে সেদিন তিনি আর এক দফা পরামর্শ দিলেন আমায়। বললেন, অত কী দেখছেন? তার চেয়ে বরং জিনিসপত্তরগুলো গোছগাছ করে নিন, কাজ হবে।

বললাম, কাজ?

—হ্যাঁ মশাই, কাজ, কাজের কাজ; সামনেই পড়বে ঠানকোট। ওখানে চেকিং হবে আবার। তাই বলছিলাম, সময় থাকতেই—

বাধা দিয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে স্মাগ্‌লার ভাবলেন?

—ভেবেছি তো কী হয়েছে! নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলেন সহযাত্রী। বললেন, ব্রাহ্মণ-সন্তানরা প্রায়ই এদিকে স্মাগ্‌লিং করে থাকে।

—কিন্তু আপনি তো দেখছি ব্রাহ্মণ-সন্তান না হয়েও দিব্যি ও বিদ্যেটিতে হাত পাকিয়েছেন! আমি চিমটি কাটলাম এবার।

সহযাত্রী জিভ্ কেটে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করে আর্তনাদ করে উঠলেন, আহা! করেন কী! করেন কী? কে—কোথায় শুনতে পাবে?

কিন্তু না, কেউ শুনতে পেল না; এবং আমরা দিব্যি নিশ্চিন্তে ঠানকোটের দিকে এগোলাম। ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া গায়ে লাগল

এসে এবং পথের ছু'পাশে ফল ও ফুলের সমারোহ বার বার স্মরণ করিয়ে দিল বীরগঞ্জের চুপ বাহাছুরের সেই কথাগুলো, ওয়েল্‌কাম্‌ টু নেপাল, স্যার! ওয়েল্‌কাম্‌!

মনে হল, ওয়েল্‌কাম্‌ তো বটেই; বটেই তো স্বাগতম্‌! সামনেই আবার তোরণ রয়েছে যে! পথের ছু'ধারে রয়েছে সারি সারি গাছ। স্বাগতম্‌ ওরাও জানাচ্ছে। ওরাও বলছে, ওয়েল্‌কাম্‌!

ওদেরই গড়া তোরণের ভেতর দিয়ে চলছি এখন। দ্রুত চলছি। কাঠমাণ্ডু-উপত্যকার সমতল প্রান্তর পেছনে পড়ে থাকছে। উপত্যকার ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়িগুলো দূরে সরে যাচ্ছে দেখতে দেখতে। কিন্তু ঘরবাড়ি অনেক ছিল বুঝি সেখানে। প্রান্তরটাও বুঝি ছিল বিরাট। তাই সামনেই আবার দেখা পাওয়া গেল ওদের। আবার মনে হল, পাহাড়-ঘেরা আশ্চর্য একটা দেশ রূপকথার জগৎ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছে।

এদিকে রূপকথার দেশের রাজধানী এগিয়ে এল দেখতে দেখতে। পথে এবার লোক চলাচল বাড়তে লাগল। আর দূরে, যেন অনেকটা দূরে চোখ পড়ল রাশি রাশি ইমারৎ।

ওই ইমারৎ-শোভিত বিচিত্র পুরীই হল রাজপুরী। ওই হল রাজধানী কাঠমাণ্ডু। এতক্ষণে খুবই কাছে পৌঁছে গেছি তার। তার ঘরে ঘরে ছুঃখ-সুখের যে খেলা চলছে, তার পথে পথে চলছে কান্নাহাসির যে কলকোলাহল, একবার মনে হল, এখানে দাঁড়িয়ে কান পাতলেই বুঝি সে-সব শুনতে পাব।

কিন্তু কান পাতার অবসর আর মিলল কই! দূর থেকে ভেসে-আসা রাজধানীর রহস্যময় ও অস্পষ্ট ঐকতানটুকু শোনার আগেই তো ঠানকোট এসে গেল। শহরতলীর কর্মমুখর একটা জায়গার অন্য এক ঐকতান ঘিরে ধরল আমাদের।

দেখলাম ঠানকোটে টোল-ট্যাক্‌স্‌ আদায় করা হয়। কিন্তু 'চেকিং'-এর কোনরকম কড়াকড়ি ওখানে দেখেছি বলে তো মনে

পড়ে না। মনে পড়ে না, বাঙালী সহযাত্রীটিকে ওখানে একবারও বলতে শুনেছি, ম্যঁয় তীর্থযাত্রী হুঁ!

ঠানকোটে দাঁড়িয়ে সহযাত্রী আমাকে অন্য কথা বলেছিলেন বরং। একবার বলেছিলেন, মশাই! আপনারা তো সব রাজা। রাজার হালে রক্সৌল থেকে কাঠমাণ্ডু যাচ্ছেন।

—কেন? আপনি কি যাচ্ছেন না? ওকে শুধিয়েছিলাম।

—আজ যাচ্ছি, একটু যেন রহস্য করে জবাব দিয়েছিলেন উনি, কিন্তু কয়েক বছর আগেও যাবার কোন উপায় ছিল না।

বললাম, উপায় কী করে আর থাকবে! ত্রিভুবন রাজপথ তখনও তৈরি হয়নি যে। বাবা পশুপতিনাথের প্রসাদ চলাচলের রাস্তাটা তখনও যে শেষ হয়নি!

—ঠিক বলেছেন মশাই, শেষ হয়নি। সহযাত্রী সুরু করলেন আবার, রাস্তা শেষ হল তো এই সেদিন, কিন্তু তার আগে এ-পথ ধরে যাতায়াত কী যে এক বিদঘুটে ব্যাপার ছিল!

বিদঘুটে ব্যাপারটা শোনবার জন্যে খুব একটা আগ্রহ আমার ছিল না। কিন্তু সহযাত্রীর আগ্রহাতিশয্যে তা' আমাকে শুনতে হল। উনি চোখ দুটিকে বিস্ফারিত করে সুরু করলেন, কী যে ছিল মশাই, কী আর বলব!……প্রথমে নেপাল-সরকারের ট্রেণে চেপে রক্সৌল থেকে আমলেখগঞ্জ আসতে হ'ত আমাদের। তারপর আমলেখগঞ্জ থেকে মোটরে আসতে হ'ত ভীম্‌পহেডী। এই ভীম্‌পহেডী জায়গাটা কাঠমাণ্ডু থেকে ১৮ মাইল দূরে। এখানে এসে ডাণ্ডী ভাড়া করতাম আমরা; চার-কুলি-ওয়ালা বাহনে চেপে নেমে আসতাম ঠানকোট।……ঠানকোটে নেমেই আমরা অবিশ্যি শাহানশাহ। কারণ, ওখানে ট্যাক্‌সি দাঁড়ানই থাকত। এবং হুকুম দিলেই ওরা এক নিঃশ্বাসে আমাদের পৌঁছে দিত কাঠমাণ্ডু।

শুধালাম, এক নিঃশ্বাসে পৌঁছে দিত?

সহযাত্রী বুঝিয়ে দিলেন, হ্যাঁ মশাই, দিত। কাঠমাণ্ডু এখান

থেকে মোটে তো পাঁচ মাইল। এইটুকুন পথ যেতে ট্যাক্সির কতক্ষণ আর সময় লাগে বলুন ?

বললাম না কিছু। কিন্তু মনে মনে ঠিক বুঝলাম, সহযাত্রীটির সঙ্গে কাঠমাণ্ডুর সম্পর্ক অনেক দিনের। অনেক দিন ধরে পশুপতিনাথের দেশে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন তিনি।

ওদিকে আমাদের যাত্রাপথ শেষ হয়ে এল। দেখতে দেখতে স্থুরু হল শহর কাঠমাণ্ডু।

স্থুরুতে কাঠমাণ্ডু দরিদ্র। তার বাড়ি-ঘর, দোকান-বাজার সবই কেমন যেন দায়-সারা গোছের। কাঠমাণ্ডুর আসল ঐশ্বর্য চোখে পড়ল আরও খানিকদূর এগিয়ে। চোখে পড়ল, ভর-সন্ধ্যের আগেই আলোয় আলোয় ঝলমল করছে সে। আর সেই ঝলমলানির মাঝখানে মূর্তিমান একরাশ অন্ধকারের মতো আমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন সেই বাঙালী সহযাত্রী। বলছেন, আসি তা হলে! এবার আসি! ভয় নেই, আবার দেখা হবে। হয়তো পশুপতিনাথেই দেখা হবে আবার।

তিন

দেখতে দেখতে পশুপতিনাথের খাসমহলে এসে পড়ি। পৌঁছুই কাঠমাণ্ডু।

কাঠমাণ্ডু পৌঁছে মনে হয়, রূপকথার রাজপুত্তুর আমি। গহন গিরিকন্দর পেরিয়ে এই আমি রাজধানীতে এলাম। রাজধানী আলো-ঝলমল। কী যেন একটা কাঠি, সোনার না রুপোর, ছোঁয়া পেয়েছে সে। পেয়ে অতিথি-সমাগমের সমারোহে মেতেছে।

অতিথি অনেক আসে এ-সময়ে। এই সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে মার্চের সুরু অবধি অনেকেই এখানে এসে ভাবে, আমি রূপকথার রাজপুত্তুর।

রূপকথার আর দোষ কী! দোষ কী রাজপুত্তুরের! বিরাট বিপুল একটা দেশ হঠাৎ যদি এই এতটুকু হয়ে উঠে সাঁঝের আলোয় নিজেকে মেলে ধরে তো কী উপায়!

কাঠমাণ্ডুতে পা দিয়ে মনে হল, তাই তো! কী উপায়! রহস্যপুরী নেপাল এখানে যে এতটুকু হয়ে উঠেছে! এখানে যে বড় নিজেকে ছোট করে মেলে ধরে বলছে, ছাখো আমাকে।

দেখব, কাঠমাণ্ডুর বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবি সেদিন। ভাবি, দেখব না কেন? রহস্যের এমন বাহারী রঙ্‌মহলের একবার যখন হদিস পেয়েছি, তখন কেন দেখব না? আর কেনই বা রঙ্‌মহলকে একবার একটু ছুঁয়ে নিয়েই বলব, যাই তবে?

রঙ্‌মহল জমজমাট ওদিকে; দূরাগত অতিথিদের ভিড়ে ভরো ভরো।

অতিথির আবার রকমফের আছে। আছে ক্যাটিগরী বা শ্রেণীবিভাগ। পয়লা নম্বর শ্রেণীতে যাঁরা পড়লেন, তাঁরা হলেন

রাজ-অতিথি বা 'স্টেট-গেস্ট্'। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে 'ডি-লুক্স্ হোটেল' আগে থাকতেই 'বুক' করা থাকে। আর যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর, তাঁরা এতসব বুক-টুকের ধার ধারেন না; তাঁরা হাতের কাছে সস্তা দরের যে-হোটেলটা পান, অথবা পান যে-ধর্মশালা বা আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি, তাতেই ওঠেন।

কাঠমাণ্ডুর অতিথি-তালিকায় আমি এই শেষোক্ত শ্রেণীর সর্বশেষ পংক্তিটাতে পড়ি। অর্থাৎ, পড়ি সেই দলে, যাঁরা হোটেলে না গিয়ে ধর্মশালায় যান এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মশালায় সুবিধে করতে না পেরে আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়েন।

কড়া আমিও নাড়লাম। এক সন্ধ্যায় কাঠমাণ্ডুতে বন্ধু শ্রীপ্রদীপ চৌধুরীর বাড়ির কড়াটা প্রাণপণে চেপে ধরলাম আমি।

বন্ধু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে এলেন এবং অভ্যর্থনার ভেল্কী দেখালেন অচিরেই।

অতএব অচিরেই তৃতীয় শ্রেণীর সর্বশেষ পংক্তির অতিথি হওয়া সত্ত্বেও আমি আবার নিজেকে রাজপুত্তুর বলে ভাবতে পারলাম।

ভাবতে কেন পারব না? সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি জায়গায় ততোধিক অপরিচিত একটা গলি ছত্রপটিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে যদি বিনা আয়াসেই বের করে ফেলতে পারি এবং যদি সেই গলিতে বসবাসকারী বন্ধুর বাড়িও বের করতে পারি নম্বর ছাড়াই, তবে কেন নিজেকে রূপকথার নায়ক ভাবতে পারব না?

রূপকথার নায়ক কি আমাদের চেয়ে বেশি দূরাভিসারী? একেবারে নতুন একটা জায়গায় আলো-ঝলমল রাজপথ পেরিয়ে হঠাৎ গা-ছমছমে গলিপথের অন্ধকারে ঢুকে পড়তে সে কি একবারও বিচলিত হয় না? একবারের জন্যেও কি তার মনে হয় না, পক্ষীরাজের মুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করি এবার?

জানি নে, এ-হেন সংকটের মুহূর্তে এমনিতরো সব ভাবনা তার

মনে আদৌ আসে কিনা। তবে এটুকু বেশ জানি যে, আমরা ভাবিনি এসব। জেব্রার গায়ের মতো ডোরাকাটা ট্যাক্‌সি নামক আমাদের পক্ষীরাজটি যখন হায়েনার দৃষ্টি মেলে গলির ভেতর ঘোরাঘুরি স্নুরু করল, তখন আমরা অবকাশই পাইনি ভাববার, যে কোন্‌টা ভালো, পশ্চাদপসরণ? না, ওই হায়েনার দৃষ্টিকে অনুসরণ?

আজ ভাবি, হায়েনাই বটে। পাহাড়পুরীর আঁধারে সব গাড়ির আলোই হায়েনার চোখ।

আর ভাবি, কাঠমাণ্ডুর রাজপথে ভাড়াটে সব গাড়িই জেব্রা,—ঠিক জেব্রারই মতো ডোরা ডোরা, কাটা কাটা।

কিন্তু তবু যাকগে, মরুক গে ডোরাকাটা জেব্রা। ওতে চেপে তো আর কাঠমাণ্ডুর রাজপথে চক্কর মারিনি, মেরেছি পায়ে হেঁটে। রাজধানীর বারো আনারও বেশি আমরা দেখেছি হাঁটা-পথে। অতএব আমাদের কাছে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর গল্প মানে, পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর গল্প, দেখে দেখে চেখে-বেড়ানোর গল্প।

বেড়ানোর স্নুরু কাঠমাণ্ডু পৌছুবার পরদিন থেকেই। পরদিনই খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের 'হোস্ট' প্রদীপ চৌধুরী পরামর্শ দিলেন, কাঠমাণ্ডু এসেছেন; পশুপতিনাথকে দর্শন করুন আগে।

বললাম, বেশ। তাই করব। চলুন পশুপতিনাথের দিকেই।

চললাম। ছত্রপটির কাঁচা ও এবড়ো-খেবড়ো গলিটাকে পেছনে ফেলে দ্রুত এগোলাম আমরা।

আমরা এগোলাম। কিন্তু কাঠমাণ্ডু কোথায়। রাজধানীর বহু লোকেরই যে ঘুম ভাঙেনি এখনও। এখনও যে ঘরবাড়িগুলোর অধিকাংশকেই তালা-আটকানো সিন্দুকের মত দেখাচ্ছে।

প্রদীপবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলাম, সিন্দুক আরও কিছুক্ষণ নাকি এইরকম দেখাবে; এবং তারপর খুলবে সব। তারপর ভার

চললাম আবার; খুব সাবধানেই চললাম। ভেড়া সিং সম্পর্কে একটা আতঙ্ক অনুক্ষণ ঘিরে ধরল আমায়।

ওদিকে খানিকদূর এগোতেই দেখি, পথের একপাশে দেয়ালে লাগানো একটা বোলতার চাক।

প্রদীপবাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, চাক নয় মশাই, ওই হল কিল-টোল। গাছের একটা গুঁড়িতে পেরেক মেরে মেরে ওইরকম করা হয়েছে।

কিন্তু গুঁড়ি কোথায়? এগিয়ে গিয়ে দেখি, গুঁড়ি অদৃশ্য; দৃশ্য শুধু পেরেক আর অসংখ্য লোহার টুকরো।

প্রদীপবাবু বললেন, লোহার টুকরো আর পেরেকের আড্ডা বলেই এর নাম কিল-টোল। স্থানীয়দের কী ধারণা জানেন? ধারণা, এই কিল-টোলে একটি কিল বা পেরেক ফোটাতে পারলেই দেহের সবরকম ব্যথা-বেদনা সেরে যায়।

শুধালাম, সারে নাকি সত্যি?

প্রদীপবাবু বললেন, আরে দূর মশাই! আমার বাড়িতে কাজ করে যে কাঞ্চীটা, সেই যে সেই গঙ্গারাণী, ওকেই তো কতবার দেখলাম কিল-টোলে যেতে। কিন্তু কোনদিন ওর কোন ব্যথা সেরেছে বলে তো শুনিনি।

—তবে হ্যাঁ, একটু থেমে আবার শুরু করলেন প্রদীপবাবু, একবার ও এক কাণ্ড বাধিয়েছিল বটে। কিল-টোলে গিয়ে কিল বসাবার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বেচারী···অজ্ঞান কেন হবে না মশাই? কারও পিলে যদি এভারেস্ট্-এর মতো ডাগর-ডোগর হয় এবং তারপর আবার যদি সেই পিলে পেকে ওঠে তো এতটা পথ হেঁটে এসে কিল-টোলে কিল বসাবার সময় কেন সে অজ্ঞান হবে না?

বললাম, অজ্ঞান হয়ে পথেই বুঝি পড়ে গিয়েছিল গঙ্গারাণী?

প্রদীপবাবু জানালেন, হ্যাঁ, গিয়েছিল। কিন্তু তখন আমাদের

রাণীটিকে পায় কে! দেবতার ভর হয়েছে ভেবে সবাই তখন ওকে পুজো করতে ব্যস্ত।

শুধালাম, পুজো আপনি দেখেছিলেন?

—দেখেছিলাম বৈকি! প্রদীপবাবুর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা, অফিস যাবার সময় সেই পুজো নিজের চোখে আমি দেখেছিলাম।

—কী দেখলেন আপনি?

—দেখলাম, ওর মাথা কিল-টোলে ঠেকানো; আর পা ঠেকানো ভক্তদের মাথায়। আর দেখলাম, ও অজ্ঞান এবং ভক্তরা সজ্ঞানে ওকে মেরে ফেলবার আয়োজন করছে।

—ভক্তদের হাত থেকে ওকে বাঁচালেন কী করে?

—সে অনেক কথা মশাই, অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে এটুকু শুধু বলতে পারি যে, ভক্তদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে আমার যে পরিশ্রম এবং অর্থদণ্ড হয়েছে, পিলের হাত থেকে বাঁচাতে তার অর্ধেকও হয়নি।

বললাম, হবে কী করে! পিলের ওষুধ ডাক্তার, আর ভক্তের ওষুধ ডাকিনী যে! এবং ডাকিনীর 'ভিজিটিং ফি' যে ডাক্তারের 'ফি'র চেয়ে চিরকালই বেশি।

প্রদীপবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন, বেশি। এবং সেদিন কিল-টোলে রীতিমত একটি পুজো দিয়ে ভক্তদের হাত থেকে আমি রেহাই পেয়েছিলাম।

—ভক্তরা চিরকালই এখানে উচ্ছ্বসিত। পথে-ঘাটে পুজো এখানে লেগেই আছে, কিল-টোল ছাড়িয়ে যেতে যেতে বললেন প্রদীপবাবু।

আমার মনে হল, ঠিকই বলেছেন উনি। পুজোর আসর পথে-ঘাটে অজস্রই তো দেখছি। দেখছি, ছোট-বড়-মাঝারি মন্দির। কাঠমাণ্ডুর রাজপথে কত যে মন্দির চোখে পড়ল, চোখে পড়ল কত যে বিচিত্র দেব-দেউল, তার ফিরিস্তি দিতে গেলে আমি তো কোন্

ছার, কয়েক ডজন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের মিলিত উদ্যোগও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শুনেছি, পুরু লেন্স্ নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক আসেন কাঠমাণ্ডুতে। আসেন স্থিতপ্রাজ্ঞ পক্বকেশ সব ঐতিহাসিক। কিন্তু কাঠমাণ্ডুর মন্দির-রহস্যকে ভেদ করতে পারেন কি ওঁরা?

পারেন না বোধ করি। কী করে পারবেন? কেমন করে পারবেন? এই যে আশান-চক অঞ্চল দিয়ে এখন আমরা চলছি এবং আমাদের ঠিক সামনেই এখন চোখে পড়ছে জরাজীর্ণ, শ্যাওলা-ঢাকা, প্যাগোডার ঢং-এ গড়া এক মন্দির, কে ওটা গড়েছে, কেন গড়েছে এবং কবে গড়েছে, তা জানা কি এতই সহজ?

ভাবলাম, সহজ যদি হ'ত তো রহস্যকে ভেদ করতে গিয়ে নতুন এক রাজধানীকে কবেই আবিষ্কার করতাম আমরা। তবে তো কবেই আমরা নেপালের ইতিহাসকে নতুন করে লিখে বলতাম, এই অমূল্য বস্তুটির পূর্ববর্তী সব সংস্করণে অমার্জনীয় কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে বলে লজ্জার অবধি নেই আমাদের।

কিন্তু ওদিকে পুব-আকাশ যে লজ্জিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সলজ্জ বধূটির মতো রাঙিয়ে উঠল সে। বধূটির চোখের আলো কোমল-মধুর; তাই পুব-পাহাড়ের চূড়ায় মিঠে রোদের হাতছানি।

—ওই পাহাড়গুলো খুব কাছে এখান থেকে, তাই না? প্রদীপবাবুকে শুধালাম একবার।

প্রদীপবাবু জবাব দিলেন, কাছে মানে দশ-বিশ মাইল দূরে।

—কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই নাগাল পাব ওদের।

—নাগাল ঠিক পাবেন। কিন্তু হাতটা তার আগে স্বয়ম্ভুর কাছ থেকে ধার করে নিতে হবে।

শুধালাম, স্বয়ম্ভু আবার কে?

প্রদীপবাবু বললেন, এখানকার সৃষ্টিকর্তা। আবার রক্ষাকর্তাও বটে।

বললাম, তার মানে?

—মানে-ফানে আমার জানা নেই, প্রদীপবাবু অকপটে স্বীকার করলেন, তবে ইতিহাস ঘাঁটলে মানে জানা যাবে হয়তো।

জানা যাবে? সত্যি যাবে? ভাবলাম একদিন; এবং কাঠমাণ্ডুর ইতিকথা লিখতে বসে সত্যি একদিন ইতিহাস-রাজপুরীর সদর দরজায় হত্যে দিলাম। দিয়ে দেখি, লাভটা হয়েছে অপরিমেয় এবং প্রদীপবাবু যেখানে শেষ করেছেন, ঠিক সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ইতিহাস।

সে-ইতিহাসে পাই বিস্ময়কর সব কিংবদন্তী আর উপকথা। পাই, একসময়ে কাঠমাণ্ডু-উপত্যকা ছিল জলভরা একটি হ্রদ। সেই হ্রদে বিচিত্র সব প্রাণী ঘুরে বেড়াত। কিন্তু কোন পদ্মফুল ফুটত না সেখানে। মানুষেরও সেখানে কোন চিহ্ন ছিল না।

চিহ্ন কী করে থাকবে? কী করেই বা মানুষ আসবে ওই হাজার-দু'হাজার ফুট গভীর জলপুরীতে? কিন্তু অবশেষে অবস্থার একদিন পরিবর্তন হল। দেবতার আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উঠল ওই জলপুরী। একদিন ভগবান বিপাস্য বুদ্ধ এলেন ওখানে এবং এসেই একটি পদ্মের কুঁড়ির ওপর মন্ত্র উচ্চারণ করে সেটিকে ছুঁড়ে দিলেন হ্রদের জলে। ভগবান ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই কুঁড়ি থেকে যখন পদ্ম ফুটবে, তখন জ্যোতির্ময় স্বয়ম্ভু আবির্ভূত হবেন এখানে। একটি শিখার আকারে তখন তিনি এখানেই প্রমূর্ত হবেন।

এই ঘটনার দীর্ঘদিন পর একদিন শিখিবুদ্ধকে বলতে শোনা গেল, হ্যাঁ, এখানেই; এই পুণ্যপুরীতেই একদিন তাঁর আশীর্বাদ আলোক ছড়াবে। সেদিন কত লোক আসবে এখানে, আসবে কত তীর্থযাত্রী ও পর্যটক। এ জায়গাটা সেদিন রমণীয় হবে বলেই আসবে ওরা।

তৃতীয় বুদ্ধ বিশ্বভূ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, আসবে তো বটেই ; ঠিক আসবে। ধনে-জনে এ অঞ্চল ঠিক একদিন ভরে উঠবে। কিন্তু তার আগে একজন বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হওয়া চাই। এ হ্রদের তলায় আছে যে মাটি, তার গায়ে সূর্যকিরণ লাগা চাই।

ইতিহাস বলে, বহু-বাঞ্ছিত ওই সূর্যকিরণ একদিন নাকি লাগল। জল সরে গিয়ে মাটি দেখা দিল ওখানে। কিন্তু কী করে দিল ? সব কিংবদন্তী এই একই জিজ্ঞাসায় এসে থমকে দাঁড়ায়। এবং নানা মুনি এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে থাকেন নানাভাবে।

একদিকে সনাতনপন্থীরা বলেন, কাঠমাণ্ডু উপত্যকার মুক্তির মূলে আছেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ ; আর অপরদিকে বৌদ্ধদের মত হল, মঞ্জুশ্রী মুক্তি দিয়েছেন একে। বিশ্বকর্মার মূর্তি ধরে এখানকার হ্রদটিকে তিনিই প্রদক্ষিণ করেছেন।

মঞ্জুশ্রী দেখলেন, হ্রদের জলকে ইচ্ছে করলেই সরিয়ে দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলেই নতুন একটা স্থলভাগ উপহার দেওয়া যায় বিশ্বলোককে। খড়্গপাণি তিনি। সেই খড়্গ দিয়ে পাহাড়ের খানিকটা জায়গা তিনি যদি কেটে দেন, তবে হ্রদের সব জল স্বচ্ছন্দেই বেরিয়ে যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কাটলেন তিনি পাহাড়। বাগমতী নদী-বরাবর হ্রদের সব জলকে দিলেন বের করে। আর দেখতে দেখতে সূর্য-কিরণ এসে লাগল হ্রদের তলাকার মাটিতে। কাঠমাণ্ডু-উপত্যকার জন্ম হল।

তখন মঞ্জুশ্রীর শিষ্যরা বললেন, পদ্মফুল এতদিনে ফুটেছে। স্বয়ম্ভূ আবির্ভূত হয়েছেন এতদিনে। অতএব গড়ো স্তূপ। পদ্মফুল যেখানে ফুটেছে, ঠিক সেখানেই স্বয়ম্ভূনাথের পুণ্যতীর্থ গড়ে তোল।

শোনা যায়, তীর্থ গড়ে উঠল অচিরেই। কাঠমাণ্ডু শহরের ঠিক পাশেই গড়ে উঠল স্বয়ম্ভূনাথের বিরাট স্তূপ।

পশুপতিনাথ যাবার সময় দূর থেকে সেই স্তূপ চোখে পড়ল আমাদের। স্তূপ রয়েছে পশ্চিমে, আর আমরা এগোচ্ছি পুবে।

কাঠমাণ্ডুর 'চৌরঙ্গী' ত্রিভুবন রাজপথ পেরিয়ে, রত্না-পার্ক ছাড়িয়ে এগোচ্ছি আমরা।

এতক্ষণে সূর্য উঠেছে। লোক-চলাচল বেড়েছে রাজধানীর পথে পথে; গাড়ি-ঘোড়াও চলতে শুরু করেছে। কিন্তু আমরা কতক্ষণ আর চলব! দেখতে দেখতে প্রাসাদ-আকীর্ণ কাঠমাণ্ডুকে যে পেছনে ফেলে এলাম! নিঃসঙ্গ ও নিঃস্তব্ধ একটি পথ ধরলাম এবার।

পথটা এক পাহাড়ীয়া নদীকে ডিঙিয়ে পশুপতিনাথের মহল্লা বরাবর চলে গেছে।

মহল্লাই বটে, আজ ভাবি, সত্যি বটে মহল্লা। মন্দির তো আসলে উপলক্ষ্য; লক্ষ্য মানুষ। এবং এই মানুষের কত দুঃখ-সুখের ইতিকথা প্রকীর্ণ এখানে।

এখানেই একদিন দক্ষিণ ভারত থেকে ছুটে এসেছিলেন প্রবল-পরাক্রান্ত ধর্মদত্ত। কাঞ্জিভরমের সম্রাট তিনি। তাঁর নির্দেশে লক্ষ সৈন্যের হাতে তরবারি ঝলসে ওঠে।

একদিন সৈন্যদের বড় কঠিন নির্দেশ দিলেন তিনি। বললেন, হিমালয়ের এক সুখী উপত্যকায় চলো। বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ো গিয়ে ওখানে।

সৈন্যরা সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য করল। রণ-দামামা বাজিয়ে কাঠমাণ্ডু-উপত্যকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিন।

সম্রাট বললেন, সুন্দর! বড় সুন্দর এই উপত্যকা। এর বাগমতী নদীর তীরে একটি মন্দির গড়লে কেমন হয়?

সৈন্যরা বলল, খুব ভালো হয় সম্রাট। ব্রাহ্মণরা তবে মন্দিরের আশেপাশে যাগ-যজ্ঞ নিয়ে থাকতে পারবে।

—তাই থাকুক, সম্রাট হুকুম দিলেন, মন্দির আমি ঠিক গড়ে তুলব।

গড়লেন তিনি মন্দির, পশুপতিনাথের মন্দির। আর ব্রাহ্মণরাও গড়ল মহল্লা, পশুপতি-মহল্লা।

কালক্রমে সেই মহল্লায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্ররাও এল। এল এমনকি রাজকন্যে।

হ্যাঁ, একদিন অশোক-দুহিতা চারুমতী এল এখানে। তার স্বামী দেবপালের সঙ্গে রাজনন্দিনী এখানেই এসে ঘর বাঁধল।

এ-সব অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। খ্রীস্টের জন্মেরও আড়াই শ' বছর আগেকার কথা। আজ পশুপতিনাথ মন্দিরের পথ ধরে যেতে যেতে হাজার বার মাথা খুঁড়লেও এ-সব কথার সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার উপায় নেই। এরা নেহাৎই কিংবদন্তী আজ। নেহাৎ প্রবাদ-প্রবচনের মতোই এরা আজ লোকের মুখে মুখে ফেরে।

কিন্তু কোথায় লোক! সামনের মাঠ-ময়দান খাঁ খাঁ করছে। দু'পাশের ঢেউ-খেলানো প্রান্তরে শুধুই চলছে সবুজের অভিসার।

শুনলাম, এই অভিসার নাকি ফেব্রুয়ারি অবধি চলবে; এবং তারপর শিবরাত্রি আসবে যখন, তখন ভক্তদের তাঁবু ছেয়ে ফেলবে এই মাঠ-ময়দান।

শিবরাত্রির সময় ভক্ত অনেক আসে এখানে। ভারতবর্ষ থেকেও আসে হাজার হাজার। বুড়ো আসে, বুড়ী আসে, কিশোরী আসে, যুবতী আসে, আসে ছেলে-বুড়ো, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে অগণিত লোক। নেপাল সরকার তীর্থযাত্রীদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেন তখন।

কিন্তু করলে কী হবে! যাত্রীদের বাসনা পূরণ করবে কে?

প্রদীপবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলাম, শিবরাত্রির সময় একবার এখানে এক জরাজীর্ণের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। শিব-চতুর্দশী উপলক্ষ্যে তিনি এসেছিলেন শিবের কাছে প্রার্থনা জানাতে। প্রার্থনা তাঁর সন্তান। শুধু একটি সন্তান লাভ করে শূন্য ঘরকে পূর্ণ করতে চান তিনি।

আর একবার এক সিনেমা-অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ হয় প্রদীপবাবুর। তিনি এসেছিলেন পূর্ণ ঘরকে শূন্য করতে; প্রথম

পক্ষের স্বামী এবং ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দ্বিতীয় পক্ষকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে।

—দ্বিতীয় পক্ষটিকে আপনি দেখেছিলেন? প্রদীপবাবুকে শুধালাম একবার।

—দেখছি বৈকি! প্রদীপবাবু জবাব দিলেন, তিনি ভারতবর্ষের একজন নাম-করা অভিনেতা। এই সেদিনও ইনকাম-ট্যাক্স্ ফাঁকি দেবার জন্যে খবরের কাগজে বড় অক্ষরে ওঁর নাম বেরিয়েছিল।

—আর অভিনেত্রীটি নাম-করা নয় বুঝি?

—তিনি একটি পতনশীল তারকা; ছাই হবার মুখে একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন।

—কিন্তু যে তারকা পতনশীল, আঁকড়ে ধরা কি তার পক্ষে সম্ভব?

—মোটেও সম্ভব নয়, বললেন প্রদীপবাবু,বরং যাকে সে আঁকড়ে ধরবে, তাকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া সম্ভব।

বললাম, সেই দ্বিতীয় পক্ষটি এতদিনে তাহলে ছাই হয়ে গেছে?

প্রদীপবাবু বললেন, জানি নে।

জানি নে, ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল আমারও; মনে হল, সেই শূন্য মাঠ-ময়দানও যেন একই কথা বলছে।

বলছে, জানি নে। জানি নে। জানি নে। তীর্থযাত্রী যারা এখানে এসেছিল, তাদের কার কী হয়েছে, জানি নে। জানি বোধ করি এই যে, এ অঞ্চলটা আসলে তীর্থযাত্রীদের নয়, বানরের রাজ্য। সারা বছর ধরে বানররা এখানে সুখে বসবাস করে এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চে শিবরাত্রির সময় ভক্তরা এসে অনধিকার-প্রবেশ করে ওদের রাজ্যে।

ভাবলাম, হ্যাঁ; রাজ্যটা বানরেরই বটে। রাশি রাশি বানর

এখানে হুড়োহুড়ি দাপাদাপি করছে। প্রদীপবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলাম, বানরদের কেউ নাকি কিছু বলে না। সবাই ধরে নিয়েছে, বাবা পশুপতিনাথের চেলা ওরা। ওদের কিছু বললে বাবাকেই নাকি বলা হয়।

কিন্তু কোথায় বাবা? খানিকটা দূরেই মন্দিরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন যে দেবতা, তিনি? তাঁর কানে সত্যি কি কিছু পৌঁছয়? বানরের চেয়ে আরও এক ধাপ উন্নত মানুষ নামক তাঁর যে চেলারা সারা পৃথিবী জুড়ে মার খাচ্ছে, সে খবর কি কোনকালে পৌঁছয় তাঁর কানে?

জানি নে পৌঁছয় কিনা। তবে প্রদীপবাবু দেখলাম পশুপতি-নাথের সদাজাগ্রত কর্ণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত।

—সব জানেন তিনি, তিনি সব শোনেন। বললেন প্রদীপবাবু।

ঠিকই বললেন বোধ করি। কারণ, পরে মিলিয়ে দেখি, আশ্চর্য! ইতিহাসও ঠিক একই কথা বলে, সব জানেন তিনি। তিনি সব শোনেন। তাই তাঁর নাম স্মরণ করে রাজ্য চলে যখন, প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি তখন হিমালয়কে স্পর্শ করে। দেশে তখন স্বর্ণযুগ আসে।

একবার স্বর্ণযুগ এসেছিল লিচ্ছবি রাজবংশের আমলে, যখন বাবা পশুপতিনাথকে স্মরণ করে সারা নেপাল চলত, যখন এমন কি বিভিন্ন মুদ্রায়ও পশুপতির প্রতীক থাকত। আর সত্যি বলতে কি, লিচ্ছবি আমলে রাজা একজনই ছিলেন নেপালে, এবং সে-রাজা হলেন বাবা পশুপতিনাথ।

বাবার আশীর্বাদে রাজ্য তখন সুখে-সম্পদে ভরো-ভরো, শিক্ষায়-দীক্ষায় মহিমময়। তখন এমন কি সাধারণ লোকও সংস্কৃতের চর্চা করত, দূর-দূরান্তরে ব্যবসা করতে যেত, মন্দির গড়ত প্যাগোডার ধরনে। সপ্তম শতাব্দীতে নেপালের মন্দির-স্থাপত্য যে খুব উন্নত ছিল, চৈনিক পরিব্রাজকরা সেকথা বার বার বলে গেছেন। আর

ওঁরা না বললেই বা কী! চীন যে প্যাগোডার ধরনে মন্দির গড়তে শিখেছে নেপালের কাছ থেকে, একথা আজ কে না জানে!

আসলে মন্দিরের কথা জানে সবাই। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর নেপালকে জানে না কেউ। কেউ আজ খবরও রাখে না যে, আসলে তখন নেপালের প্রতিটি বাড়িই ছিল প্যাগোডা, প্রতিটি গ্রামেই ছিল পঞ্চায়েৎ এবং প্রতিটি লোকের হাতেই ছিল বাবা পশুপতিনাথের নামাঙ্কিত মুদ্রা।

হ্যাঁ, পশুপতিনাথের নাম-গান করতে করতে নেপাল তখন বিজ্ঞানে, সাহিত্যে এবং শিল্পকলায় উন্নতির সোপান বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। চক্রপাণি আবির্ভূত হলেন এই সময়, সুশ্রুত-সংহিতার নবভাষ্য রচনা করলেন; আর বৃহস্পতি লিখলেন কবিতা।

কবিতা-রচনায় সে-যুগের অনেক রাজাও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আর প্রজারা? ওদের অনেকেই চাইল পাথর কেটে মূর্তি-গড়ার কাজে সিদ্ধহস্ত হতে, চাইল দেবভূমিকে সাক্ষী রেখে দেবমূর্তি গড়তে।

ওদিকে দেবভূমি পশুপতিনাথে এতক্ষণে এসে গেছি আমরা। আর আমাদের ঠিক সামনেই মহাকালের চাকাটা সপ্তম শতাব্দী থেকে ঘুরতে ঘুরতে একবারে ১৯৬৮-তে এসে ঠেকেছে।

হ্যাঁ, ১৯৬৮-রই পশুপতিনাথকে দেখছি আমরা। দেখছি, তার প্রবেশ-পথের একপাশে সারি সারি দোকান; দোকানগুলো যেখানে গিয়ে শেষ হল, মন্দির-চত্বর শুরু হল সেখানেই। সেখানেই চলেছে অগণিত ভক্ত। পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে চলেছে কেউ, কেউ চলেছে ভোগ নিয়ে; দেবতার জয়গান করতে করতে চলেছে কেউ, কেউ চলেছে ফ্যাশান-প্যারেডের ঝিলিক দিয়ে; ক্যামেরা-হাতে চুরুট-মুখে চলেছে কেউ, আবার কেউ চলেছে ট্র্যান্‌জিস্টার ঝুলিয়ে। চলেছে

সবাই। সবাই যেন আভাসে-ইঙ্গিতে এক কথা বলছে, পশুপতিনাথ, প্রসীদ! হে রাজরাজেশ্বর মহাদেব, প্রসন্ন হও! সুপ্রসন্ন, তোমার লীলা-নিকেতন দেখে চোখ জুড়োই। সুমহিম, তোমার করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হই। সুপ্রাচীন, তোমার আনন্দরস-সাগরে নিমগ্ন হই।

ভাবলাম, নিমগ্ন তো হয়েই আছি। ভক্তিরসে না হই, রূপরসে তো হয়েই আছি নিমগ্ন। তা' না হলে, সাত-সকালে উঠে ছত্রপটি থেকে পশুপতিনাথ অবধি এই দীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ পায়ে-হেঁটে আসব কেন! আর কেনই বা পশুপতিনাথের মন্দির-চত্বরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবব, অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয় এক দেব-দেউলকে দেখছি!

পশুপতি-মন্দির অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়ই বটে। সে অতুলনীয় তার পারিপার্শ্বিকের জন্যে; একদিকে নদী বাগমতীর এবং অপরদিকে বনাচ্ছাদিত পাহাড়ভূমির দাক্ষিণ্যের জন্যে। আর সে অবিস্মরণীয় তার অবয়বের জন্যে; প্রতিবেশী স্তূপ, মন্দির ও বিগ্রহদের সাক্ষী করে তার মন-ভোলানো প্রকৃতির জন্যে। যথার্থই মন-ভোলানো মূর্তিমান এক রহস্যময় পশুপতি-মন্দির। তার প্রাঙ্গণে যাবার বেলায় দুই ছাদ-ওলা তার শীর্ষদেশটির দিকে তাকালে মনে হয়, হিমালয়ের রূপের খনি থেকে এই বুঝি হঠাৎ করে জন্ম নিল সে, বুঝি এইমাত্র তার শুভজন্মকে উপলক্ষ্য করে আকাশ-আলো মুখরিত হয়ে উঠল। আর ঠিক এই মুহূর্তে পশুপতি-মন্দিরের ছাদে নগাধিরাজ তার সোনার ভাণ্ডারকে উপুড় করে দিল বুঝি।

সোনা কত আছে ওই মন্দিরে?

জানি নে। তবে ওই সোনা যখন প্রভাত-আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন তা যে সাত রাজার ধন মানিককেও হার মানায়, তা জানি।

ওই মানিকরাজ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সেদিন। মন্দিরের সোনা-সোহাগ কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সেদিন আমায় অভিভূত করেছিল।

কিন্তু সোহাগ কি শুধু সোনারই ? রুপোর নেই ? রুপোয় মোড়ানো পশুপতি-মন্দিরের দরজাগুলো কি কম সুন্দর ?

ভাবলাম, কে বলে, কম সুন্দর ! পশুপতি-মন্দিরের সব কিছুই সুন্দর।

মন্দিরের ঠিক সামনেই আছে যে-বৃষটি, যে শিবের বাহন নন্দী, সৌন্দর্য তার মধ্য থেকেও ঠিকরে বেরোচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, অতন্দ্র এক প্রহরী, পাথরের এক বেদীর ওপর অধিষ্ঠিত সোনালী এক অপরূপ শিল্প-কীর্তি অনুক্ষণ যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,—মা গৃধ্নু! লোভ করো না। সুন্দরকে দূরে দাঁড়িয়ে তারিফ করো। স্বর্ণখচিত এই শিবতীর্থকে মুমুক্ষুর মন নিয়ে ছাখো।

কিন্তু হায় রে মানুষের মন ! তার ত্যাগের সোনার কৌটোতে যে ভোগের ভোমরা লুকিয়ে আছে। বললেই কি মুমুক্ষু হওয়া সাজে তার ? যদি সাজত, তবে কি আর পশুপতিনাথের রত্নশালায় হাত পড়ত কারও ? তবে কি রাজা জয়প্রকাশ বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত রাজাধিরাজের ঐশ্বর্যের ওপর ?

অথচ ইতিহাস বলে, ঝাঁপিয়ে সে পড়েছিল। বাবা পশুপতিনাথের রত্ন-ভাণ্ডার সে লুঠ করেছিল।...তখন কাঠমাণ্ডুর রাজা ছিল জয়প্রকাশ; আর পশুপতি ছিল কাঠমাণ্ডুর বাইরে।...জয়প্রকাশ বললে, পশুপতি বাইরে থাকলে আপত্তি নেই, আপত্তি শুধু তার রত্নভাণ্ডারকে নিয়ে। বললে, ওই ভাণ্ডারটিকে আমার চাই।

—ভাণ্ডার চাই ! বলে কি লোকটা ? মাথায় হাত দিয়ে বসল কাঠমাণ্ডুর জনসাধারণ। বার বার ওরা বলাবলি করল, জয়প্রকাশের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জয়প্রকাশের কানে গেল এসব কথা ; এবং যেতেই রেগে আগুন হল সে। বলল, ভাণ্ডার কার ? আমার ? না, পশুপতির ?

মোসাহেবরা বলল, আপনার মহারাজ।

—তবে? জয়প্রকাশ চিৎকার করে উঠল, তবে ভাণ্ডার জবরদখল করছি বলে কানাঘুঁষো কেন?

শোনা যায়, কানাঘুঁষো বন্ধ হয়নি শেষ অবধি। তবে জয়প্রকাশ পশুপতির রত্নভাণ্ডার ঠিক জবরদখল করেছিল। ঠিক হাজার বছর ধরে সঞ্চিত পশুপতির রাশি রাশি রত্ন হাতে নিয়ে অষ্টাদশ শতকের এক সন্ধ্যায় সে বলে উঠেছিল, ভাণ্ডার কার? আমার? না, পশুপতির?

এবার কিন্তু মোসাহেবরাও স্তব্ধ। লজ্জায়, ঘৃণায় এবার ওরাও কোন জবাব দিতে পারেনি।

জবাব দিয়েছিল কাঠমাণ্ডু-উপত্যকার জনসাধারণ। বলেছিল, নাম করো না ওই পাপিষ্ঠের; ওর নাম মুখে আনলেও অকল্যাণ হয়।

—হ্যাঁ, অকল্যাণ হয়; বলেছিল গ্রামের মোড়লরা, নিজের অকল্যাণ নিজেই ডেকে আনল ও। নিজের চিতায় ও নিজেই আগুন দিল। তিলে তিলে দগ্ধ হল পাপিষ্ঠ।

ইতিহাসে পাই, সত্যি সে দগ্ধ হয়েছিল। সত্যি পৃথ্বীনারায়ণ শা'র কাছে একের পর এক যুদ্ধে হেরে শেষ পর্যন্ত সে আশ্রয় নিয়েছিল পশুপতিনাথেই।

পশুপতিনাথের মন্দির-সমীপে বাগমতী-তীরে আর্যঘাট। সেখানেই শেষ আশ্রয় নিয়েছিল জয়প্রকাশ। তার দেহ তখন জীর্ণ-শীর্ণ, পায়ে দারুণ ক্ষত।

সে পা ভেঙেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে।

শত্রু পৃথ্বীনারায়ণ শা' কিন্তু করুণাসাগর। জয়প্রকাশকে জীবনের শেষ ক'টা দিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, এবারে বিশ্রাম নাও বন্ধু; ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা কর।

কিন্তু কোথায় বিশ্রাম নেবে জয়প্রকাশ! রাজ্যের প্রতিটি লোকই যে তার শত্রু!

অবশেষে অনেক ভেবে বিশ্রামের উপযুক্ত একটা স্থান সে খুঁজে বের করল। পৃথ্বীনারায়ণকে একদিন সে বলল, পশুপতিনাথে রেখে এস আমাকে। ওই হোক আমার শেষ আশ্রয়।

পৃথ্বীনারায়ণ কথা রেখেছিলেন। জয়প্রকাশকে রেখে এসেছিলেন পশুপতিনাথে।

কিন্তু সেই বাজপাখি জয়প্রকাশ তখন কোথায়! পাখির ডানা তখন ভেঙে গেছে। আর ক্ষতস্থানে প্রলেপ বুলোতে গিয়ে সে তখন ভাবছে, বড় ভুল হয়ে গেছে। পশুপতিনাথের রত্ন-ভাণ্ডারে হাত দেওয়া ঠিক হয়নি।

—ঠিক হয়নি, ভুল হয়ে গেছে ; আর্যঘাটে মৃত্যুর সময়েও নাকি বলেছিল জয়প্রকাশ। স্বর্ণশীর্ষ পশুপতি-মন্দিরের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, না না ; ভাণ্ডার আমার নয়, পশুপতির।

কিন্তু কেন এখানে এই পশুপতি-মন্দির গড়ে উঠল ? রত্ন-ভাণ্ডার গড়তেই বা কে বলেছিল মানুষকে ?

জানি নে। তবে মন্দির নিয়ে নানা কিংবদন্তী আছে। শোনা যায়, একবার দুই দেবতায় লড়াই বাধল। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুতে শুরু হল তুমুল ঝগড়া।

ঝগড়া কেন ? না বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলছেন, আমি তোমার চেয়ে বড়।

লড়াই কেন ? না ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলছেন, বড় হলেম গিয়ে আমি।

এই যখন দেবলোকের সমস্যা, তখন দেবাধিপতি মহাদেবের কানে গেল সব। তিনি মরলোক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সব সমস্যার সমাধান করলেন।

মহাদেব এসে দাঁড়ালেন এই পশুপতিনাথেই ; দাঁড়িয়ে জ্যোতি ছড়িয়ে দিলেন ত্রিলোক জুড়ে,—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ভরে। ব্রহ্মা

ও বিষ্ণু দেবাধিপতির এই জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখে স্তম্ভিত। বাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে দু'জনেই মেনে নিলেন তখন, বড় আমরা কেউ নই। বড় দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব।

মহাদেবকে নিয়ে আরও অনেক কিংবদন্তী আছে এখানে। অনেকেরই ধারণা, দেবাধিপতির হাত, পা এবং মাথা ছাড়া সবটুকু অঙ্গই এখানে বিরাজিত। মর্ত্য-অমর্ত্যের রাজ-রাজেশ্বর সত্যি এখানে প্রত্যক্ষ। আর তিনি প্রত্যক্ষ বদ্রীনাথে। সেখানে তাঁর মাথা আছে। তাই লোকে বলে, বদ্রী আর পশুপতি দর্শন করা মানে, ত্রিলোকাধিপতি রাজ-রাজেশ্বরকে পূর্ণ-দর্শন করা।

পরে শুনেছি, পূর্ণ-দর্শনের মাহাত্ম্য কাঠমাণ্ডু-রাজদের অনেককেই নাকি ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই রাজাদের কেউ কেউ এগিয়ে এসেছিলেন পশুপতিনাথের মন্দির-সংস্কারে।

সকলের আগে এসেছিলেন জয়সিং রামদেব। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে পশুপতি-মন্দিরকে নতুন করে গড়েছিলেন তিনি; এবং আজকের যে-মন্দির আমরা দেখি, তা জয়সিং রামদেবেরই পরিকল্পিত।

পরিকল্পনায় অভিনবত্ব দেখালেন নেপালাধীশ অভয়মল্লও। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশুপতি-মন্দিরে লক্ষহোম ও মহাস্নান চালু করলেন তিনি।

কিন্তু কেন চালু করলেন? হঠাৎ এমন একটা ব্যয়-বহুল প্রথা চালু করার জন্যে কী তাঁর দায় পড়েছিল?

এসব প্রশ্নের জবাব ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন। লক্ষহোম ও মহাস্নান,—ওঁরা বলেছেন, নিরুপায় হয়ে চালু করেছিলেন অভয়মল্ল। কারণ, একবার দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে তাঁর রাজ্য টলমল করে উঠল। প্রজারা ধ্বংস হতে লাগল দেখতে দেখতে।

অভয়মল্ল সেই বিরাট ধ্বংসপুরীতে দাঁড়িয়ে কপালে করাঘাত করলেন। বললেন, সর্বনাশ হল! রাজ্য রসাতলে গেল! এখন উপায়?

পারিষদরা বললেন, উপায় আছে সম্রাট। পশুপতিনাথকে খুশি করুন। দেখবেন, উপায় আছে।

—কিন্তু খুশি কেমন করে করব তাঁকে? অভয়মল্লের কণ্ঠে এবার ব্যাকুলতা।

ওদিকে পারিষদরাও ব্যাকুল। রাজ্য-জোড়া হাহাকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওঁরা পরামর্শ দিলেন, ওঁকে খুশি করবেন লক্ষহোম আর মহাস্নান দিয়ে।

—বেশ! তাই করব। নিরুপায় অভয়মল্ল সম্মতি জানালেন শেষ অবধি।

সম্মতি শেষ অবধি জানালেন পরবর্তী অনেক মল্লরাজাও। বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গীতজ্ঞ রাজা প্রতাপমল্লকেও একদিন বলতে শোনা গেল, বেশ! তাই করব।

করলেন তিনি অনেক। আগের চেয়েও অনেক কিছু বেশি করলেন। পশুপতি-মন্দিরের গঠনে বৈচিত্র্য আনলেন তিনি। মন্দির-গাত্রের কারুকার্যের মধ্যে আনলেন অনির্বচনীয়ত্ব।

কিন্তু এত কিছু করেও মন ভরল না তাঁর। তিনি বললেন, দেবতার প্রসাধন হল, আর মানুষের হবে না?

পারিষদরা প্রতিধ্বনি তুললেন, তাই তো! মানুষের হবে না?

—হবে, বললেন প্রতাপমল্ল। তুলাদান হবে এই পশুপতি-মন্দির-প্রাঙ্গণে। তুলাদণ্ডের একপাশে থাকব আমি, আর অপর পাশে থাকবে সোনা। সোনা দিয়ে ওজন হবে আমার।

—কিন্তু এত সোনা দুনিয়ায় কি আছে সম্রাট? পারিষদরা চিন্তিত।

—হ্যাঁ, আছে; সম্রাট নিশ্চিন্ত করলেন ওঁদের। বললেন,

আমার রাজকোষেই আছে অনেক সোনা। প্রতিবেশী রাজ্য হিন্দুস্থানের সঙ্গে বাণিজ্য করে এ আমি সংগ্রহ করেছি।

—কিন্তু সেই সংগ্রহে হাত দেওয়া কি ঠিক হবে সম্রাট? পারিষদদের কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত।

—হ্যাঁ, ঠিক হবে। দ্বিধাহীন প্রতাপমল্ল জবাব দেন, সংগ্রহ-করা সোনা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে।

শোনা যায়, বিলানো হয়েছিল শেষ অবধি। তাল তাল সোনা এসেছিল পশুপতি-মন্দির-প্রাঙ্গণে, আর রাজা সেই সোনা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের হাতে উঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই নাও, ধরো। তোমাদের ঐশ্বর্য তোমরাই গ্রহণ করো।

শোনা যায়, গ্রহণ নাকি অনেকেই করেছিল। সপ্তদশ শতকের নেপালের রাজা প্রতাপমল্লের দেওয়া সোনা অনেক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের ঘরেই নাকি ঝলমল করে উঠেছিল।

প্রতাপমল্লের পুত্র নৃপেন্দ্রমল্ল সোনা ছড়ালেন অন্যভাবে। পশুপতি-মন্দিরের বৃষকে সোনায় মণ্ডিত করলেন তিনি। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই মন্দিরের ঠিক সামনেই তাঁকে একদিন বলতে শোনা গেল, রাজ-রাজেশ্বরের বাহন যে, তার কি গুরুত্ব কম? অতএব, তাকে ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করি কেন?

সুযোগ্য সেনাপতি ভীমসেন থাপাও প্রায় একই কথা বললেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পশুপতি-মন্দিরের দরজাগুলো সোনা এবং রুপো দিয়ে মুড়ে দিয়ে তিনি একদিন বললেন, এদেরই কি গুরুত্ব কম! অতএব ঐশ্বর্য থেকে এদেরই বা বঞ্চিত করি কেন? কেনই বা রাজ-রাজেশ্বরের পূর্ণ-দর্শন মাহাত্ম্যের অংশীদার যে-মন্দির, তার দরজাগুলোকে ঐশ্বর্য থেকে অপূর্ণ রাখি?

ঠিক কথা, কেন রাখা হবে অপূর্ণ? রাখা যদি হ'ত, তবে তো আজকের পশুপতি-মন্দিরকে দেখে পূর্ণতার আস্বাদ আমরা পেতাম না।

সত্যি, পূর্ণতা মন্দিরটির সর্বত্র। তার দেওয়ালে, দরজায়, প্রাঙ্গণে, প্রকোষ্ঠে সর্বত্র পূর্ণতার ছাপ।

প্রকোষ্ঠটির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, ভিড় ঠেলে তার ভেতরে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, যখন দেখলাম শিবলিঙ্গটিকে, তখন আশ্চর্য এক অনুভূতি ঘিরে ধরেছিল আমায়। তখন বার বার আমার মনে হয়েছিল, সঙ্গ পাচ্ছি। যুগ-যুগান্তকাল ধরে এইখানে ছুটে-আসা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্তের সঙ্গ পাচ্ছি। গায়ের গন্ধ পাচ্ছি ওদের। ওদের প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছি, পশুপতিনাথ, প্রসীদ!

পশুপতিনাথ, প্রসীদ! ওইখানে দাঁড়িয়ে একবার আমিও বললাম বুঝি। কিন্তু কা'কে বললাম? পাষাণে গড়া নিষ্প্রাণ শিবলিঙ্গকে? না, করুণায় ভরা জাগ্রত শিবশম্ভুকে? কারুকার্যে ভরা নির্বাক শিবগেহকে? না, মমতায় ভরা সর্বপাপহর শিবসুন্দরকে? কা'কে বললাম?

মনে নেই, কা'কে বললাম। কিন্তু সব বলা সেদিন যেন আরও নানাজনের নানা বলার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেল।

সব যেন হারিয়ে-যাওয়া শতাব্দীগুলোর পথ ধরে অভিসার করে লক্ষজনের বলার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে গেল।

লক্ষ কাহিনী, কোটি দীর্ঘশ্বাস এখানে। কোটি কোটি মানুষের এখানে এসে একই প্রার্থনা, পশুপতিনাথ, প্রসীদ! কিন্তু প্রার্থনা কি হারিয়ে যায়? দীর্ঘশ্বাস নিঃশেষিত হয়ে যায় বায়ুভূতে? যারা এখানে একদিন এসেছিল, তাদের সবকিছুই কি আজ নিশ্চিহ্ন?

মনে হল, কে বলে নিশ্চিহ্ন? ওদের সঙ্গ পাচ্ছি যে! প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছি ওদের, পশুপতিনাথ, প্রসীদ!

ওরা এসেছে দূর-দূরান্তর থেকে, দূরের ওই পাহাড়গুলোর ওপার

থেকে; ওপারের অরণ্য পেরিয়ে আছে যে-জনপদ, সেই জনপদ থেকে। ওরা বিচিত্র, অদ্ভুত ও রহস্যময়। পথের দুঃখ ওদের সুখ, প্রকৃতির অভিশাপ ওদের আশীর্বাদ, সকলের মন্দ ওদের ভাল। ওরা পর্বতের শাসন মানে না, নদীর নিষেধ শোনে না, অরণ্যের অত্যাচার বোঝে না। ওরা বোঝে শুধু পশুপতিনাথকে, শোনে শুধু পশুপতিনাথকে। মানেও শুধু পশুপতিনাথকে। সকল শাসন, সকল নিষেধ ও সকল অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়েও ওরা বলে, পশুপতিনাথ, প্রসীদ!

মনে পড়ে, সেদিন পশুপতি-মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম যখন, তখনও যেন ওদের এই ঐকতান কানে আসছিল। তখনও মনে হচ্ছিল, অতীতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে-আসা বিরাট এক মিছিলের স্মৃতি একটুক্ষণ আগে দেখা স্বপ্নের মতো আমাকে ঘিরে রেখেছে। মহাকালের মহা-রাজপথ থেকে ভেসে-আসা অস্ফুট এক কলকোলাহল বহুদূর হতে শোনা শব্দের মতো আমাকে আচ্ছন্ন করেছে, শতাব্দীর ওপার হতে ছুটে-আসা আশ্চর্য সব অনুভূতি বহুদিন আগে পাওয়া সুবাসের মতো আমাকে উতলা করেছে।

কিন্তু আমি কী? পর্যটক? না, তীর্থযাত্রী? রূপলিপ্সু? না, ভক্তিপ্রাণ? মানুষ ও প্রকৃতির রসপিয়াসী? না, ঈশ্বরের করুণাভিলাষী? কী আমি?

সেদিন পশুপতি-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, জানি নে, আমি কী। আমি স্রোতের টানে ভেসে-চলা তৃণখণ্ড? না, ঘূর্ণি-হাওয়ায় উড়ে-বেড়ানো পত্রখণ্ড? আমি রূপের আগুনে ঝাঁপিয়ে-পড়া পতঙ্গ? না, রসের সাগরে তরী ভাসিয়ে-চলা নিরুদ্দেশ-যাত্রী? জানি নে, আমি কী! তবে আমি যে প্রতিবেশীর উঠোনে পা দিয়ে তার তুলসীতলার রত্নবেদীটিকে দেখছি, তা জানি।

হ্যাঁ, রত্নবেদী। নেপাল যদি হয় প্রতিবেশী, পশুপতিনাথ তবে তার তুলসীতলার রত্নবেদী। আমরা তুলসীতলায় প্রণাম করে

যেমন প্রতিবেশীর ঘরে যাই, পশুপতিনাথকে প্রণাম করে ঠিক তেমনি নেপাল দেখি। আবার তুলসীতলায় যেমন প্রদীপ জ্বলে, এই পশুপতি-মন্দিরকে পরিবেষ্টন করেও ঠিক তেমনি জ্বলে সারি সারি প্রদীপ। তবে এ-প্রদীপ আর সে-প্রদীপে ফারাক আছে। সেখানে একটিমাত্র শিখা কাঁপতে কাঁপতে, ধুঁকতে ধুঁকতে আলো ছড়ায়; আর এখানে অনেক শিখা ঊর্ধ্ববাহু অনেক ভক্তের মতো মূর্তিমান শ্রদ্ধা হয়ে জ্বলতে থাকে।

সেই জ্বলা আমি দেখিনি; তবে শিখার আধার প্রদীপগুলোকে দেখেছি। দেখেছি, পশুপতি-মন্দিরকে ঘিরে আছে ওরা, দেওয়ালী-উৎসবের দিনে তুলসী-মঞ্চটিকে যেমন বহু প্রদীপ ঘিরে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে ঘিরে আছে।

পশুপতিনাথে প্রতি রাত্রেই দেওয়ালী, প্রতিদিনই উৎসব। পশুপতি-মন্দিরের বারান্দায় এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন,—এখন আমি সেই উৎসবেরই শরিক।

কিন্তু আমার শরিকানা আর কতক্ষণের! আমি এই মুহূর্তে আছি এখানে, কিন্তু একটু পরেই তো এই উৎসব-পুরী থেকে বিদায় নেব! একটু পরেই তো এই তুলসী-মঞ্চ আমার কাছে সুদূরের বস্তু হয়ে যাবে!

মনে হল, সুদূর অদূর হয় না? নিত্য-শরিক কেউ হয় না উৎসব-পুরী পশুপতির?

—হয়, পশ্চিমদিককার পশুপতি-প্রাঙ্গণের দিকে তাকাতেই মনে হল, নিত্য-শরিকও হয়।...ঐ তো! সামনেই তো দেখছি একজনকে, প্রায় পনের-বিশ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভের ওপর করজোড়ে বসে থাকতে।...

কে উনি? আজকের নেপাল-অধিপতি রাজা মহেন্দ্র না? সোনালী ধাতুতে গড়া রাজা মহেন্দ্রেরই একটি মূর্তি ওখানে শোভা পাচ্ছে না?

এগিয়ে গিয়ে দেখি,—হ্যাঁ, রাজাই বটে। রাজাই হাঁটু গেড়ে বসে পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। এবং রাজার ঠিক পাশেই রয়েছে আর একটি স্তম্ভ। সেখানে রাজরাণী রত্না দেবতার কাছে অঞ্জলি প্রদানে উদ্যতা।

রত্নার মূর্তিটিও সোনালী। রাজা মহেন্দ্রের মতো তাঁর মূর্তিটিও জীবন্ত।

ভাবলাম, জীবন্ত তো হতেই হবে। জীবন্ত না হলে রাজা-রাণী উৎসব-পুরী পশুপতিনাথের নিত্য-শরিক হবেন কী করে? আর কী করেই বা ওঁদের প্রণাম দেবতার চরণে গিয়ে পৌঁছুবে?

দেবতার চরণে আরও অনেকে প্রণাম জানাচ্ছেন দেখলাম। ওই পশুপতি-প্রাঙ্গণেই দেখলাম রাজা ত্রিভুবন এবং আরও কয়েকজন ভূতপূর্ব রাজা-রাণীকে। তবে ভূতপূর্বরা বর্তমানেরটির তুলনায় অনেক ছোট। বর্তমান রাজা মহেন্দ্রের মতো বিরাটকায় কোন ছত্র নেই ওঁদের মাথার ওপর; এবং এছাড়া মহেন্দ্রের মতো ঐশ্বর্যদীপ্ত কোন স্তম্ভের ওপরেও নেই ওঁরা। ওঁদের অবস্থান একটু যেন অনাড়ম্বর ও অজ্ঞাত পরিবেশে। একটু যেন দূরে দাঁড়িয়ে, বর্তমানের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পশুপতি-বন্দনা করছেন ওঁরা।

ভাবলাম, এমনই হয়। বর্তমান অতীতকে ঠিক এমন করেই আড়াল করে। একদিন বর্তমান রাজা মহেন্দ্রও হয়তো ঠিক আড়ালে চলে যাবেন এবং যে-স্তম্ভটির ওপর বিরাট-বিপুল মহিমা নিয়ে তাঁর সোনালী মূর্তি আজ শোভা পাচ্ছে, সেখানে সেদিন শোভা পাবে নতুন কোন রাজার কোন নতুন মূর্তি।

শোভা তো পাবেই। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল আমার। মনে হল, রাজার আসা-যাওয়া আর রাজ্যের হাতবদল তো চলবেই। রাজা সকলের ওপরে তার দণ্ডটি হাতে নিয়ে বসে আছেন বলেই কি মহাকাল তাঁর দিকে ফিরে তাকাবে না?

তাকাবে ঠিক। মহাকালের শ্যেনদৃষ্টি রাজাকেও ঠিক নামিয়ে আনবে সেই পথে, যে-পথে অসীম অনন্ত যুগ ধরে অগণিত প্রজাদের মরণাভিসার।

পশুপতি-মন্দিরের পার্শ্ববর্তী কালভৈরব-মন্দিরটি বিচিত্র সেই অভিসার-পথেরই নীরব সাক্ষী যেন। কালভৈরব যেন অনন্ত-পথযাত্রী বিদায়ী সব মানুষেরই অতি বিশ্বস্ত দ্রষ্টা। রুদ্রচক্ষু মেলে, ভৈরব-ভীষণ আকৃতি নিয়ে উপস্থিত তিনি। আর তাঁর মন্দিরে উপস্থিত বিদায়ী রাজাদের কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন,—কিছু ছবি।

ওই ছবিগুলোও একদিন শেষ হয়ে যাবে,—কালভৈরব-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভাবলাম একবার, কিন্তু রুদ্রচক্ষু ভৈরব সেদিনও হয়তো থাকবেন অতন্দ্র। হয়তো সেদিনও তাঁর অতিকায় লিঙ্গটি বিশ্বাসীদের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আর অবিশ্বাসীদের মনে বিদ্বেষ ও বিরক্তি উৎপাদন করবে।

কিন্তু কোটিলিঙ্গ কী উৎপাদন করবে সেদিন? শ্রদ্ধা, না বিদ্বেষ? ভক্তি, না বিরক্তি? ভৈরব-মন্দির থেকে বেরিয়ে প্রতাপমল্লের গড়া শিবলিঙ্গগুলো প্রদক্ষিণ করতে করতে নিজেকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সেদিন কোন জবাব পাইনি জিজ্ঞাসার। এবং পাইনি বলে যন্ত্রচালিতের মতো রাশি রাশি শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করার সময় কোন বেদনাও বোধ করিনি।

বেদনা বোধ করছি আজ। আজ মনে হচ্ছে, উন্মুক্ত আকাশতলে সারি সারি সাজানো ওই শিবলিঙ্গগুলোর অদ্ভুত একটা মহিমা আছে। এবং আজ যদি ওদের আবার দেখবার সুযোগ পেতাম তো বলতাম, বিরক্তি নয়, শ্রদ্ধাই উৎপাদন করে ওরা। সান-বাঁধানো বেদীর ওপর স্থাপিত ওদের শতাধিক শিলামূর্তি ভক্তিরই উদ্রেক করে।

ভক্তিরস পশুপতি-সংলগ্ন আরও অনেক মন্দির থেকে উচ্ছ্বসিত।

রামচন্দ্র মন্দির, লব-কুশ মন্দির সবই যেন নদী বাগমতীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অ-দৃষ্ট অথচ অবশ্যম্ভাবী আর একটি স্রোতস্বিনীকে সঞ্জীবিত করছে এবং সেই স্রোতস্বিনীতে ছড়িয়ে আছে যে রস, ভক্তের মর্মমূল থেকে ক্ষরিত না হলে তার আবির্ভাব সম্ভব নয়।

ভক্ত ছিলেন বটে জয়স্থিতি মল্ল। বিদ্যার ভক্ত, রাজকার্যের ভক্ত, দেবতার ভক্ত,—ভক্ত ছিলেন তিনি অনেক কিছুরই।

১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন রাজা হলেন, তখন তাঁর ভক্তমানসের উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় প্রজারা পায়নি। সেই পরিচয় পেতে সময় লাগল প্রায় ৪০ বছর। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রজারা দেখল, বাগমতীর তীরে পশুপতির খুব কাছেই তিনি গড়ে তুলেছেন অপরূপ তিনটি মন্দির এবং সেই তিনটির একটি রামচন্দ্র মন্দিরকে তিনি গড়েছেন তাঁর রাণী রক্তিল্লা দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে।

জয়স্থিতি মল্লের গড়া অপর দুটি মন্দির লব ও কুশ তাঁর দুই যমজ পুত্রের স্মৃতিকে বহন করছে। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন করেন অনেকেই। বলেন, পুত্র বা পত্নীর নামে মন্দিরের নামকরণ না করে রাজা রামায়ণের দ্বারস্থ হলেন কেন? কেন বাল্মীকির কাব্য থেকে নাম আহরণ করলেন?

এই প্রশ্নের জবাব নেপালের ইতিহাস দিচ্ছে। সেখানে পাই, রামায়ণ খুবই প্রিয় ছিল এই রাজার। তাঁর রাজত্বকালে রাজ্য যেমন, রাজগৃহও তেমনি অনুক্ষণ রামায়ণ-গানে মুখরিত হ'ত।

কিন্তু রাণীর মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন সব গান বন্ধ হয়ে গেল।

রাজা বললেন, রাণীর স্মৃতির উদ্দেশে মন্দির গড়ো পশুপতিনাথে, আর সেই মন্দিরের নাম দাও শ্রীরামচন্দ্র মন্দির। গান সেখানেই হবে।

হল গান। রামায়ণ গানে বাগমতীর তীরে-গড়া শ্রীরামচন্দ্র মন্দির একদিন মুখরিত হল।

কিন্তু গান যদি বন্ধ হয়ে যায় কোনদিন? জয়স্থিতি মল্লের

ভাবনা ধরল একবার, কোনদিন যদি রামায়ণ গান ওখানে থেমে যায় ?

পারিষদরা রাজার এই সংশয়ের কোন সুরাহা করতে পারলেন না। উল্টে ওঁরাও মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তাই তো! যদি থেমে যায় ?

অবশেষে একদিন রাজা নিজেই করলেন সংশয়ের সুরাহা। বললেন, না না, থামবে না গান। পথ পেয়েছি। লব-কুশের মন্দির গড়তে হবে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এবং গান গাইবে লব-কুশ।

মন্দির গড়া হল অচিরেই। রাজার দুই যমজ পুত্রের স্মৃতির উদ্দেশে গড়ে উঠল আরও দুটি মন্দির। প্রজাদের অনেকেই তখন নাকি বলাবলি করেছিল, এ আর বুঝলে না! রামচন্দ্র হতে চান জয়স্থিতি মল্ল স্বয়ং; লব-কুশের কাছ থেকে রামায়ণ গান তিনি নিজেই শুনতে চান। তাই না মন্দির নিয়ে এত তাঁর ভাবনা!

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, জয়স্থিতি মল্লের ভাবনা সফল হয়েছিল কি ? রামায়ণ গান শুনেছিলেন কি তিনি শেষ অবধি ? শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরে তিনি কি শেষনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন ?

এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখি, ঐতিহাসিকরা নিরুত্তর ; কিন্তু কিংবদন্তী সহস্রমুখ। ওই কিংবদন্তীগুলোরই একটিতে পাই,—হ্যাঁ, রামায়ণ গান শুনতে পান জয়স্থিতি মল্ল। কারণ, শেষনিঃশ্বাস ফেলবার সময় দেহ তাঁর যেখানেই থাক না কেন, মন থেকেছিল শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরে। তাই শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরেই 'বায়ু ভূতো নিরাশ্রয়ঃ' শেষ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। আর লব-কুশও খুঁজে পেয়েছিল ওদের আপনজনকে। তাই গান ওরা ঠিক গেয়েছিল।

কিংবদন্তী বলে, সেই গান আজও নাকি শোনা যায়। আজও রাতের গভীরে পশুপতি-মহল্লা যখন থমথমে হয়ে ওঠে, যখন নদী বাগমতী মূর্তিময়ী একটা প্রহেলিকার মতো শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে যায়, যখন দূরের বন থেকে ভেসে-আসা ঝিঁঝিঁর

চিৎকার শতাব্দী-প্রাচীন মন্দিরগুলোর গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, তখন গান নাকি শোনা যায়। তখন রামায়ণের সেই হারিয়ে-যাওয়া আরণ্যক পরিবেশটা পশুপতি-মহল্লায় হঠাৎ করে ফিরে আসে নাকি। তখন হঠাৎ নাকি মনে হয়, শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরে কিসের যেন একটা গুঞ্জরন সুরু হয়েছে। যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় সমাগত ব্রাহ্মণদের গুঞ্জরনের মতো কিছু একটা সুরু হয়েছে। এবং তার ঠিক পরেই সুরু হয়েছে বীণাবাদ্য। দুটি বীণা বাজছে যেন, এবং সেই বীণাবাদনের সঙ্গে সঙ্গে দুটি বালকের অদ্ভুত মিষ্টি গান শোনা যাচ্ছে। সেই গান দেখতে দেখতে বিশ্বভুবনকে মুগ্ধ করে দিল, মর্ত্যে অমর্ত্যের কণা ছড়িয়ে দিল ; গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষকে স্তম্ভিত করে দিল, আকাশ-বাতাসকে ভারী, বিষণ্ণ ও মর্মস্পর্শী করে দিল।

কিংবদন্তী এইরকম আরও কত কথা বলে। অবিশ্বাস্য, অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য ঘটনার মায়াজাল রচনা করে। দিনকে রাত্রি আর রাত্রিকে দিন করে।

করে তো বটেই! আজ ভাবি, তা না হলে দিনের পশুপতি-মহল্লার কথা লিখতে বসে হঠাৎ রাত্রির কুহক নিয়ে মাথা ঘামাব কেন? আর কেনই বা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ষোল আনা অবাস্তব একটা স্বপ্নজগতের কথা তুলব? স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয়?

—না, স্বপ্ন সত্যি হয় না। পশুপতি-মহল্লার কথা লিখতে বসে বার বার মনে হচ্ছে, তবে সত্যি কখনও কখনও স্বপ্ন হয়ে ওঠে। পশুপতি-মহল্লা আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে উঠেছে আজ। ওখানকার বিশ্বনাথ মন্দির, পঞ্চদেউল ও গোর্খনাথ-মন্দির কিছুদিন আগে দেখা স্বপ্নের মতো আমার স্মৃতিতে আজ ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

ঝাপসা হয়নি শুধু গুহ্যেশ্বরী মন্দির ও আর্যঘাট। দেখে-আসা

অবধি বার বার ওদের স্বপ্ন দেখেছি বলেই হয়তো হয়নি। আর্য-ঘাটকে আজও দেখতে পাই যেন। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, পশুপতি-মন্দিরকে সাক্ষী করে নদী বাগমতীর তীরে দাঁড়িয়ে-থাকা এক মহাশ্মশান। সেখানে নদীর ঠিক ওপরেই চিতাশয্যা রচিত হয়েছে। চিতায় আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। আর সেই আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে স্বজনহারা কিছু মানুষ জীবনের অনিত্যতা নিয়ে হাহাকার করছে।

কিন্তু জীবন তো অনিত্যই। আর্যঘাট যেন বলছে, অনিত্যতাই তো জীবন। বলছে, পশুপতি-মন্দির-মহলকে দেখবার পরেও এ নিয়ে যদি কারও সংশয় থাকে, তো এখানে একটু দাঁড়াও। একটুক্ষণ চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে ভাব, তোমার শেষ আশ্রয় কোথায়। ভাব, রাজায় এবং প্রজায় আসলে তফাৎ কতটুকু।

রাজারও তো শেষ আশ্রয় এখানেই। জয়প্রকাশ আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে; আবার এখানেই এই সেদিনের রাজা ত্রিভুবনেরও আশ্রয়।

ত্রিভুবনকে বাঁচাবার জন্যে কত উদ্যোগ, কত আয়োজন হল সেদিন। চিকিৎসার ব্যবস্থা হল জুরিখ-এর হাসপাতালে। কিন্তু রাজা বাঁচলেন না। রাজ্য থেকে অনেক দূরে সুইজারল্যাণ্ড-এর এক পাহাড়-ভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বিশেষ এক বিমানে করে তাঁর মরদেহ কাঠমাণ্ডু নিয়ে আসা হল। রাজধানী তখন শোকাচ্ছন্ন। আর্যঘাটে তখন তিলধারণের জায়গা নেই। কী ব্যাপার? না, রাজাকে ওখানে দাহ করা হবে।

দাহ করা হল শেষ অবধি। আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিরা দেখলেন, রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ বাহাদুর বাগমতী-তীরে আর্যঘাটে দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেলেন।

তারপর ছাই ভাসল বাগমতীর জলে। প্রজাদের ছাই যেমন

করে ভাসে, ঠিক তেমন করেই ভাসল। রাজায়-প্রজায় এক হয়ে গেল আর্যঘাটে।

আর্যঘাট সেই এক হয়ে-যাওয়ার কথাই বলছে আজও। তার ঠিক সামনেই বাগমতীর জলে ভেসে-যাওয়া ছাই বলছে, সব সমান। রাজা যা, প্রজাও তাই। তুমি যা, ত্রিভুবনও তাই।

তুমি যা, ত্রিভুবনও তাই—সেদিন আর্যঘাট থেকে একটু দূরে বাগমতীর ওপর গড়ে-তোলা সেতুটি পেরোবার সময় বার বার মনে হল আমার। অনতিদূরে চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সব সমান। রাজা যা, প্রজাও তাই। পশুপতিনাথ যেমন, সামনের ওই গুহ্যেশ্বরী মন্দিরও তেমন রাজা-প্রজা সবাইকে এক সূত্রে ধারণ করে আছে।

চার

বাগমতী-তীরে রাজধানী কাঠমাণ্ডু। আর কাঠমাণ্ডুকে ঘিরে রাজাধিরাজ বাবা পশুপতিনাথ ও রাজরাজেশ্বরী মা গুহ্যেশ্বরী। মা-বাবা আছেন বাগমতীর এপার-ওপার।

ওপারে বাবা পশুপতিনাথকে দেখে এলাম। এপারে মা গুহ্যেশ্বরীকে দেখতে চলেছি। সামনেই গুহ্যেশ্বরী। অপরূপ আর এক দেব-দেউল ঠিক সামনেই।

বাগমতী পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠি। ওপর বলতে পাহাড়, খাড়া পাহাড়।

সিঁড়িগুলোও খাড়া, বেশ খাড়া। এক একটি আট-দশ ইঞ্চি করে উঁচু তো হবেই, বেশিও হতে পারে। তা হোক। তবু বলব, সুপরিকল্পিত ওরা। খানিকদূর উঠে উঠে ওরা থেমে গেল এক একটি চত্বরে আমাদের পৌঁছে দিয়ে। আর আমরা সেই চত্বরগুলো পেরোবার সময় জিরোবার অবকাশ পেলাম।

লক্ষ্য করেছি, জিরোবার বিশেষ ব্যবস্থাও আছে ওখানে। জায়গায় জায়গায় সিঁড়ির গা ঘেঁষে আছে বসবার আয়োজন। শান-বাঁধানো মজবুত আসন আছে, এবং যে কেউ প্রাণ চাইলেই সে-আসনে বসতে পারেন।

বসলাম একবার আমরাও। ছায়ায় ঢাকা সেই সিঁড়িপথে বসে বিচিত্র সব পাখির কলকাকলী শুনলাম। সে-পথে পাখি অনেক আছে। ছায়াও আছে অনেক। কিন্তু ছায়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যিনি, সেই জং বাহাদুর আজ আর নেই; ছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। সেই কবে নদী বাগমতীর জলে ভেসে গেছে তাঁর ছাই। ভাসতে ভাসতে কবে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু তবু জং বাহাদুরকে অনেকেই ভোলেনি আজও। আজও অনেকেই মুক্তকণ্ঠে তারিফ করে তাঁর। কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য উজাড় করে দিয়ে দিয়ে বলে, হ্যাঁ, পৃথ্বীনারায়ণ শা'র পরাক্রান্ত ও পরোপকারী সেনাপতি রামকৃষ্ণের যোগ্য পৌত্র ছিলেন তিনি। প্রজানুরঞ্জনের শুভবুদ্ধি পিতামহের কাছ থেকে তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছিলেন। তা না হলে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার এই সুন্দর পথটুকু নেপালের জনসাধারণকে তিনি উপহার দিতেন না। পার্বতীপুরী গুহ্যেশ্বরীকে তিনি সুগম্য করতেন না।

সত্যি, পার্বতীপুরী আজ সুগম্য। আজ নেহাত দুর্বল পঙ্গু না হলে যে কেউ ওখানে যেতে পারেন।

দেখলাম, যাচ্ছেনও অনেকেই। বুড়ো-বুড়ী যাচ্ছেন। ছেলে কোলে নিয়ে যাচ্ছেন মায়েরা।

এক মায়ের কথা মনে পড়ে। ছোট্ট এক ছেলের বায়নাক্কা সহ্য করতে না পেরে অতিষ্ঠ সে। ছেলেকে সে ভয় দেখাচ্ছে। সিঁড়ির ওপর তাকে বসিয়ে রেখে একাই এগোচ্ছে।

ওদিকে ছেলেটিও কম যায় না। মা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-ফাটা আর্তনাদ শুরু করে সে। আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়াই আমরা। ছেলেটির দিকে ভালো করে তাকাই।

ছেলেটিও তাকায় আমাদের দিকে। চকিতে আমাদের একবার দেখে নিয়েই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে। আমরা চিৎকার করে উঠি, গেল—গেল।

কিন্তু তার আগেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে ও। সিঁড়ি-বরাবর বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেছে। আমরা ছুটে গিয়ে ওকে ধরি এবার। দেখি, আঘাত মারাত্মক কিছু নয়; জায়গায় জায়গায় বেচারার হাত-মুখ ছড়ে গেছে শুধু।

এদিকে মা-ও এসে গেছে এতক্ষণে। বলতে গেলে ঝড়ের বেগে এসেছে।

কিন্তু এ কী! ঝড়ের পাশেই কে উনি? ঝড়বৃষ্টির দেবতা, ইন্দ্র? দেবরাজ বজ্রপাণি?

মনে হল, হ্যাঁ, দেবরাজই বটে। এই বটে ছেলেটির বাবা। আর মনে হল, এই দেবরাজটি চাষবাস করে কায়ক্লেশে সংসার চালান। কিন্তু আপাততঃ সংসারধর্মকে ভুলে গেছেন উনি, অসুর-নিহন্তা আসল দেবরাজের মতো মহা-ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন। সন্তানকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবার জন্যে মা-টিকে শাস্তি দেবেন বলে প্রস্তুত হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের ওই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে-থাকা ইন্দ্রটির হাত থেকে মাকে রক্ষা করা গেল না। কিল-চড়-চাপড় তার ওপর যে হারে বর্ষিত হল, অতি বড় দুর্যোগের দিনেও পৃথিবীর ওপর সেই হারে শিলাবর্ষণ হয় না।

মা সিঁড়ির ওপর পড়ে গোঙাতে লাগল। আর আমরা অসহায় দর্শক সেজে 'স্ট্যাচু'র মতো নির্বাক, নিথর ও নীরব হয়ে রইলাম।

নীরবতা প্রথমে ভাঙলেন সহযাত্রী প্রদীপবাবু। বললেন, ছেড়ে দিন। ওদের ব্যাপার, ওরাই ফয়সালা করুক। আমাদের ও নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।

বললাম, ঠিক। ঠিক বলেছেন! মাথা না ঘামানোই ভালো। ঘামাতে গেলে শেষ পর্যন্ত আমাদের মাথাগুলোই···

প্রদীপবাবু বাকি অংশটা পূর্ণ করে দিয়ে বললেন, গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। অতএব····

অতএব আমরা কাউকে কিছু না বলে এগিয়ে চললাম আবার। আবার ছায়ায় ঢাকা পাখি-ডাকা পথটা আমাদের অভ্যর্থনা করল এবং দূরের কোন্ হিমবাহকে ছুঁয়ে-আসা কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া জানিয়ে দিয়ে গেল, শীত আসতে আর দেরি নেই।

ভাবলাম, দেরি তো নেই-ই। বেলা এগারোটার রোদকেও মিঠে মনে হচ্ছে বলে দেরি নেই। আশেপাশের ওই বুনো গাছগুলো

পাতা ঝরাতে শুরু করেছে বলে দেরি নেই। গাছের ছায়া এক একবার শীতের হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে বলে দেরি নেই।

কিন্তু কোথায় শীত? ওপরে উঠে দেখি, ভরা-শরৎ তার ভরা-দাক্ষিণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। দেখি উত্তুরে হাওয়ার ছিটে-ফোঁটাও নেই, অথচ রসবতী শরতের আমেজটুকু আছে। দেখি, পাতা ছড়াবার উদ্দামতা নেই, অথচ ফুলে ফুলে চারিদিক ছেয়ে রাখার আয়োজন আছে।

ভাবলাম, এ কেমন হল! একই জায়গায় একই ঋতুলগ্নে পেছনে রিক্ততা আর সামনে পূর্ণতা নিয়ে এ কেমন পথ-চলা হল!

মনে পড়ে, এই 'কেমন'-এর কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলি সেদিন। চলি প্রায় সমতল এক প্রান্তর ধরে। চলতে চলতে হঠাৎ—আমাদের সামনেই একেবারে হঠাৎ দেখি, গুহ্যেশ্বরী মন্দির। দেখি, একেবারে কাছেই পবিত্র পার্বতীপুরী।

পুরাণে পাই, পার্বতী যিনি, তিনিই আবার সতী। তিনিই শিব-জায়া। তিনি একবার দেহত্যাগ করলে, শিব তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং তারপর যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্বরা খবর পেলেন একদিন, সতীর দেহ ছিন্ন হয়েছে; খণ্ড খণ্ড হয়ে লুটিয়ে পড়েছে দেশ-দেশান্তরের নানা জায়গায়।

সেই জায়গাগুলোরই একটিতে আজ গুহ্যেশ্বরী মন্দির।

এই গুহ্যেশ্বরী সম্বন্ধে বহু প্রবাদ, বহু কিংবদন্তী আছে নেপালে এবং নেপালের জনসাধারণ আজও এদের পরম সমাদরে রক্ষা করছে।

এইসব কিংবদন্তীরই একটিতে পাই, শোভাবতী থেকে নেপালে তীর্থ করতে এসেছেন কণক-মুনি বুদ্ধ। আর বারাণসী থেকে এসেছেন কাশ্যপ বুদ্ধ।

কণক-মুনি মুগ্ধ হলেন নেপালের দেব-দেউল দেখে, স্বয়ম্ভুনাথ ও গুহ্যেশ্বরীর মহিমা দেখে। তাই পরবর্তীকালে বাংলার রাজা

প্রেমচাঁদ দেবকে নেপালে পাঠালেন তিনি। বললেন, যাও ওই আশ্চর্য দেশে; গিয়ে জাগ্রত ওই দেব-দেবীর বন্দনা কর।

প্রেমচাঁদ বন্দনা করার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়েই ছিলেন। তাই কণক-মুনির নির্দেশে সাড়া দিতে তাঁর সময় লাগল না। ভিক্ষুর বেশে নেপালের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেও তাঁর কষ্ট হল না এতটুকু। অবশেষে ভিক্ষুর বেশেই একদিন তিনি গুহ্যেশ্বরীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখন রাজরাজেশ্বর প্রেমচাঁদকে কেউ জানে না; সবাই জানে শান্তিকরশ্রী নামে সংসার-বিরক্ত এক ভিক্ষুকে।

হ্যাঁ, শান্তিকরশ্রী নামেই নেপালের ইতিহাসে গৈরিক নিশান উড়িয়েছেন প্রেমচাঁদ এবং সেই নিশানের দিকে তাকিয়ে আজও অনেককে বলতে শোনা যায়, প্রেমচাঁদ সংসারের রঙ্গমঞ্চে খেলা শেষ করে কবে চলে গেছেন; কিন্তু শান্তিকরশ্রী যেতে পারলেন না আজও। গুহ্যেশ্বরীর পুণ্যতীর্থে গৈরিক নিশানটি হাতে নিয়েই থেকে গেলেন।

গুহ্যেশ্বরীর ইতিহাসে গৈরিক নিশানের খুব কাছাকাছি উড়ছে রাঙা নিশান। শেষের নিশানটি প্রতাপ মল্ল উড়িয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন এই রাজা।

কিন্তু রাজার কি রুদ্রাক্ষ ও রক্তাম্বর প্রিয় ছিল? তন্ত্রের আলোকে পথ চিনে নেওয়া অভ্যেস ছিল?

লোকে বলে, ছিল বোধ করি। তা না হলে সমগ্র মন্দিরটিকে তিনি তান্ত্রিক যন্ত্রের আকার দেবেন কেন? আর কেনই বা সেই যন্ত্রটিকে দেখে সন্তানদায়িকার অঙ্গ-বিশেষের কথা মনে হবে? মনে হবে, মহামায়ার এক মুক্তাঙ্গনে তন্ত্রসাধনার এক রহস্যপুরীতে এলাম।

পুরীটি বড় বিচিত্র। গুহ্যেশ্বরী মন্দির বড় অদ্ভুত ও রহস্যময়। মন্দিরের শীর্ষদেশে শোভা পাচ্ছে ধাতুতে গড়া চকচকে চারটি সাপ।

সাপ চারটি মন্দিরের চূড়াটিকে যেন একটা মুকুটের মতো ধারণ করে আছে। আর সাপগুলোকে ধারণ করে আছে যে ছাদ, তা যেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর এক সাধন-বেদী। যেন সবই প্রস্তুত ওখানে। সন্ন্যাসী এলেই সাধনা আবার নতুন করে শুরু হবে।

কিন্তু কোথায় সন্ন্যাসী? রক্তাম্বরধারী, ত্রিশূল-পাণি, জটাজুট-বিলম্বিত যোগী কোথায়? গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে গৃহী লোকেরই যে আনাগোনা দেখছি! দেখছি, কামনা-বাসনার উচ্ছ্বসিত এক একটি প্রস্রবণকে পার্বতী-পাদপীঠের দিকে এগিয়ে যেতে।

এদিকে দেখতে দেখতে যন্ত্র-প্রতিম মন্দিরটির অন্দরমহলে প্রবেশ করি আমরা। সারি সারি বিশ্রামালয়-পরিবেষ্টিত এক রহস্যপুরীর প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াই। প্রাঙ্গণটির একেবারে মাঝখানে দেবী পার্বতীর লীলাভূমি। তাই তাঁকে ঘিরে ভক্তদের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। ধূপে-দীপে, সিঁদুরে-চন্দনে, পুষ্পে-মাল্যে ভক্তরা সেখানে পার্বতীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। সেখানে দেবী গুহ্যেশ্বরীর প্রসাদ-প্রার্থনায় নিমগ্ন সবাই।

কিন্তু আমরা কিসে নিমগ্ন? দেবী গুহ্যেশ্বরীর কাছে সেদিন কোন্ প্রার্থনা জানিয়েছিলাম আমরা?

জানি না। সেদিন যেমন আজও তেমনি জবাব পাচ্ছি, জানি না।

জানব কী করে? খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছি যখন, তখন কী করে জানব যে, কুটোটি ডাঙার কোথায় গিয়ে লাগলে বা কোন্ ঘাটে গিয়ে ঠেকলে প্রার্থিতের হদিস মিলবে?

কত প্রার্থনা এখানে! যুগে যুগে এই গুহ্যেশ্বরী মন্দিরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কত খড়কুটোর নিরুদ্দেশ-যাত্রা!

শুনেছি, রাজারা যুদ্ধে হেরে গিয়ে আশ্রয় নিতেন এখানে। এখানকার শান্ত-স্নিগ্ধ বনচ্ছায়াতলে একটুক্ষণ জিরিয়ে নিতেন। এবং তারপর শুরু করতেন যুদ্ধ। হঠাৎ একটা উল্কার মতো শত্রুপক্ষের ওপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কিন্তু এখান থেকে ছুটে-যাওয়া

উল্কারা সুবিধে করতে পারেননি মোটেই। শত্রুকে আঘাত হানবার আগেই ওরা জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষিত হয়েছেন।

নিঃশেষিত কেন হবেন না? কেন ছাই হবেন না পুড়ে? গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের সুরম্য পরিবেশে মানুষকে যে স্তব্ধ করে দেবার যাদু আছে! সেই যাদুর কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পিছিয়ে-পড়া স্তব্ধ মানুষ আর কি পারে যুদ্ধ জিততে? পারে নতুন করে শত্রু-পক্ষকে আঘাত হানতে?

বোধ করি পারে না। যদি পারত, তবে নেপালের ইতিহাস আজ অন্যরকমের হ'ত; তবে বিজয়ী রাজাদের কৃতজ্ঞতার দৌলতে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের দেওয়ালগুলো আজ সোনার হ'ত।

কিন্তু তা তো হয়নি। গুহ্যেশ্বরী আগে যেমন, এখনও তেমনি পাষাণপুরীই থেকে গেছে। ঠিক আগের মতোই এখনও গম্ভীর ও স্তব্ধই থেকে গেছে।

মন্দিরটি থেকে ফিরে আসার সময় বার বার ভাবছিলাম এসব। ভাবছিলাম, আর কতকাল গুহ্যেশ্বরী তার গাম্ভীর্যকে রক্ষা করবে? কতকাল আর অরণ্যে ধ্যান-নিমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো তার স্তব্ধতাকে সে অটুট রাখবে?

বেশিদিন রাখবে না বোধকরি। কারণ, জনপদ তো ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। বাগমতীর তীরে গড়ে-ওঠা মহল্লাগুলো ধীরে ধীরে হাত বাড়াল তার দিকে।

মনে পড়ে, গুহ্যেশ্বরী থেকে ফিরে আসার সময় সেই হাতগুলোকে যেন দেখলাম একবার। যেন একবার স্পষ্ট মনে হল, প্রয়োজনের অক্টোপাশ তাঁর রাক্ষুসে শুঁড়গুলোকে মেলে ধরে আরণ্যক শান্তিকে পিষে ফেলার আয়োজন করছে।

কিন্তু তবু অরণ্য এখনও আছে গুহ্যেশ্বরীর আনাচে-কানাচে; এবং আমরা সেই আরণ্যক পথ ধরেই ধীরে ধীরে নিচে নামলাম। সিঁড়ি বেয়ে আবার চলে এলাম বাগমতীর তীরে।

এখন পশুপতি-মন্দির থেকে তিন ফার্লং আন্দাজ দূরে আছি আমরা এবং আছি বাগমতীর বামতীরে। বাগমতী কলমুখরা। কলকল খলখল করতে করতে দুষ্টু কোন পাহাড়ীয়া মেয়ের মতো ছুটছে সে।

ভাবলাম, এবার আমাদেরও বুঝি ওই তালে ছুটতে হবে। কারণ, ঘড়িতে এখন একটা; আর পশ্চিমাকাশে সূর্য এখন হেলান দিয়েছে।

সেদিন ছত্রপটিতে আমাদের আস্তানায় পৌঁছুতে বেলা তিনটে বেজে গেল। কাঠমাণ্ডু থাকার সময় প্রায়ই হ'ত এমন। প্রায়ই আমরা ঘুরতে বেরোতাম সাত-সকালে; আর ঘরে ফিরতাম পশ্চিমাকাশে হেলান-দেওয়া সূর্যকে মাথায় নিয়ে। মনে পড়ে, স্বয়ম্ভুনাথ দেখবার দিনেও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল; মধ্যাহ্ন আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল অপরাহ্ণের সিংহদ্বার অবধি।

স্বয়ম্ভুনাথকে আজও দেখতে পাই। আজও স্পষ্ট মনে আনতে পারি একটা মেঠো পথকে। ছত্রপটির একপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে পথটা স্বয়ম্ভুনাথ-বরাবর জ্যামিতির একটা সরলরেখার মতো চলে গেল।

তবে পথ একটাই নেই স্বয়ম্ভুনাথে যাবার। আছে একাধিক। রাজপথ আছে একটি, যা হনুমানঢোকা থেকে বেরিয়ে সৌলটি হোটেল ও নেপাল মিউজিয়াম হয়ে স্বয়ম্ভু-চিহ্নিত পাহাড়ের দিকে এগোল এবং তারপর পাহাড়টিকে অতিকায় একটা সাপের মতো বেষ্টন করতে করতে উঠল পুণ্যতীর্থের দিকে। তীর্থভূমি স্বয়ম্ভু-স্তূপের প্রায় দরজা অবধি গেল রাস্তাটা এবং গিয়ে হঠাৎ যেন অরণ্যের গায়ে মিশে গেল। যাঁরা গাড়ি নিয়ে স্বয়ম্ভুনাথে যেতে চান, তাঁদের জন্যে এই রাস্তা; আর যাঁরা যেতে চান পায়ে হেঁটে,

জ্যামিতির সরলরেখার মতো মেঠো পথটি তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমরা পদযাত্রী। তাই অপেক্ষমাণ মেঠো পথটির অভ্যর্থনা অকৃপণভাবেই আমাদের ওপর বর্ষিত হল। আমরা ভোরের আলো গায়ে মাখতে মাখতে, ভোরের হাওয়ায় স্নান করতে করতে এবং পথের দু'পাশে ফুটে-ওঠা রাশি রাশি বুনো ফুলের সুবাসে সাঁতার কাটতে কাটতে স্বয়ম্ভুনাথের দিকে এগোলাম। অদূরবর্তী দেবদারুরা আমাদের অভ্যর্থনা করল, আর আশেপাশে চারিদিকে লক্ষ পাখির কলকাকলী আমাদের জানিয়ে দিল, আমরাও আছি।

আমরাও আছি,—জানিয়ে দিল একদল কৃষক। লাঙল-কাঁধে চাষবাস করতে চলেছে ওরা। চলেছে আমাদের চেয়ে তিনগুণ জোরে।

একটি কৃষককে দেখলাম। চলতে চলতে হঠাৎ থামল সে এবং তারপরেই পথের ধারে গিয়ে কয়েকটা বুনো ফুল কুড়িয়ে নিল।

ভাবলাম, কেন ও কুড়োল বুনো ফুল ? কৃষক-বধূকে দেবে বলে ? না কি দেবে বলে দেবতাকে ?

ভালো করে তাকাতেই দেখি, দেবতা তো কৃষকটি নিজেই। ও নিজেই সেদিন দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল না ? ইন্দ্রের মতোই শিলাবর্ষণ করছিল না ও সর্বংসহা ধরিত্রীরূপিণী ওর বধূটির গায়ে ? ওর কিল-চড়-চাপড়ের মাহাত্ম্য সেদিন গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে যেতে কি দেখিনি ?

মনে হল, হ্যাঁ, ওকেই দেখছি বটে। কিন্তু ও বেচারী কি ভগবৎমহিমা হারিয়ে ফেলল এখন ? হারিয়ে ভক্ত সাজল ভগবতী-রূপিণী বধূটিকে পুষ্প-অর্ঘ্য নিবেদন করবে বলে ?

জানি নে। তবে অনুমান করি যে, অর্ঘ্যটা বড় রকমের না হলে সেদিনের সেই আঘাতের চিহ্নগুলো মুছে যাবার কথা নয়।

কিন্তু অনুমান কেন আর ? কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই

দেখি,আঘাতের সব চিহ্ন মুছে ফেলে শরৎকালের সহাস্য প্রভাতের মতো সেদিনের সেই কৃষক-বধূটিও হাজির।

এবার দয়িতার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দয়িত এবং তারপর কী হল, দয়িতার খোঁপায় ক'টা ফুল শোভা পেল আর ক'টা ফুল মাটিতে পড়ল, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, সেদিনের সেই দেবরাজের হাত থেকে ফুল উপহার পেয়ে বধূটি যখন হাসিতে লুটিয়ে পড়ল, তখন মেঘমুক্ত আকাশতলে হঠাৎ যেন একঝলক বিদ্যুৎচমক অভিভূত করল আমাকে। তখন হঠাৎ আমার মনে হল, সেদিন গুহ্যেশ্বরীর পথে বধূটির যে চোখের জল ঝরেছিল, সেই জলই শিশির হয়ে এসে এই ফুলগুলোকে ফুটিয়েছে।

আজ ভাবি, ফুল-ফোটাবার খেলা জগৎ জুড়ে ঠিক এমনি করেই চলে বুঝি। শিশির চোখের জল থেকে জন্ম না নিলে ফুল বুঝি ফোটে না। বুঝি কান্না হাসি হয়ে ঝরে না।

কিন্তু ওদিকে কী ঝরছিল সেদিন? ওই স্বয়ম্ভু-স্তূপের দিকে? তাকাতেই মনে হল, রাশি রাশি হাসি বুঝি। বুঝি সোনালী শরতের প্রভাত-আলোকে নীলাম করে কাঠমাণ্ডু-অধিদেবতা ওদিকে সহাস্য হয়ে উঠেছিলেন।

অধিদেবতার পীঠস্থানটিকে বেশ খানিকটা দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমরা। আমরা স্পষ্ট অনুভব করছি, অনতিউচ্চ একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা স্বয়ম্ভুপুরী মহিমায় ও গৌরবে এভারেস্ট্‌কেও ছাড়িয়ে গেল।

এদিকে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম আমরা। শহর কাঠমাণ্ডুকে পেছনে ফেলে সোজা পশ্চিম দিকে এগোলাম। কাঠমাণ্ডুর ঘরবাড়িগুলোকে প্রায়-ভুলে-যাওয়া স্মৃতির মতো ঝাপসা মনে হল; আর মনে হল, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে যে স্বয়ম্ভু-পাদপীঠ, তার চেয়ে সত্যি বস্তু পৃথিবীতে আর বুঝি কিছু নেই।

শুনেছি, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ-স্তূপগুলোর মধ্যে এটি একটি। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং এখানে এসেছিলেন। কিন্তু সে আসায় আর আজকের রূপলিপ্সু পুণ্যলোভাতুরদের আসায় কত তফাৎ! আজ কত সহজে স্বয়ম্ভু-পাহাড়ে যাওয়া যায়। কত নিশ্চিন্তে পাহাড়টির চূড়ায় পৌঁছুন যায়। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে ওপরে উঠলেই হল আজ; হাত বাড়ালেই স্বয়ম্ভু-স্তূপের নাগাল পাওয়া যাবে।

ওপরে উঠি আমরাও। স্বয়ম্ভু-পাহাড়ের গা বেয়ে এগোই।

এগোতে কষ্ট নেই। সিঁড়ি সোজা চলে গেছে পুণ্যতীর্থ বরাবর। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা কোথায়? গোটা সিঁড়ি-পথটা খাঁ খাঁ করছে! সিঁড়ির ওপর পড়ে-থাকা ঝরা-পাতায় খস খস শব্দ উঠছে।

ভাবি, শব্দ তো উঠবেই। জনমানবহীন এই অরণ্যপুরীতে ঝরা-পাতার দীর্ঘশ্বাস তো কানে আসবেই। তাছাড়া শরৎ এলো এখন; এখন তো পাতা ঝরবেই।

এদিকে দেখতে দেখতে ওপরে উঠে আসি আমরা। দু'শো ফুটেরও বেশি উঁচু স্বয়ম্ভু-পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়াই।

দাঁড়াতেই হাঁফ ধরে একবার। মনে হয়, শ'পাঁচেক সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রম আমার হৃৎপিণ্ডটাকে নিয়ে যেন লোফালুফি শুরু করেছে। যেন পায়ের গাঁটগুলো আলগা হয়ে গেছে আমার; আর যেন কপালের শিরাগুলো বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে।

মনে হল, এই বুঝি ফাটে বেলুন। শিরা এই বুঝি ছেঁড়ে। কিন্তু না, কিছুই হয় না। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠি। চোখে পড়ে, ঠিক সামনেই হাজার হাজার বছরের পুরাতন স্বয়ম্ভু-স্তূপ তার পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

স্বয়ম্ভুনাথের মহিমা কে না জানে আজ! কাঠমাণ্ডুর কে আজ খবর রাখে না যে, এ অঞ্চলটা যখন হ্রদ ছিল, তখন একদিন

ঠিক এখানেই আবির্ভূত হন স্বয়ম্ভু; পদ্মফুল এখানেই ফোটে এবং এই ফুল থেকেই ঠিক্‌রে বেরোয় স্বয়ম্ভুর পাঁচটি রঙীন জ্যোতি।

—সেই জ্যোতি নেই আজ; লোকে বলে, কিন্তু জাগ্রত স্বয়ম্ভু ঠিক নাকি তেমনি আছেন। পদ্মের জায়গায় পাষাণবেদীটিকে ঘিরে ঠিক তেমনি বিভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।

বেদীটি চোখে পড়ে। অর্ধবৃত্তাকার একটি বিরাট বেদী,—ইটে মাটিতে পাথরে গড়া, সিমেন্টের আস্তরণ দেওয়া।

লোকে বলে, এই নাকি গর্ভ। সৃষ্টির ভ্রূণ এখানেই নাকি বিকশিত। বলে, সৃষ্টির আদি-অন্ত খুঁজে পাও না বলে হাহাকার কেন? আদি তো এখানেই। এখানে, ঠিক তোমার সামনেই। আজকের উন্মীলিত বিশ্বচরাচর এখানেই তো একদিন ভ্রূণ হয়ে নিমীলিত ছিল।

আজ অবাক লাগে ভাবতে। অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক মনে হয় এসব কথা। কিন্তু সেদিন এরাই কত সত্যি হয়ে উঠেছিল। স্বয়ম্ভু-স্তূপ যেন হাজার বছরের ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল সেদিন। যে যুগ হারিয়ে গেছে, যে কাহিনী বিশ্বাসের পরীক্ষায় বাতিল হয়ে গেছে, তারাই যেন সেদিন কত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

মনে পড়ে, বিশ্বাসীর দৃষ্টি নিয়েই তাকিয়ে আছি রহস্যময় স্বয়ম্ভু-স্তূপের দিকে। স্তূপটিকে ছাপিয়ে-ওঠা বর্গাকার স্তম্ভটি থেকে সোনালী আভা উৎসারিত হচ্ছে আর স্তম্ভের ঠিক গায়েই আছে বুদ্ধের যে দুটি চোখ, তা থেকে উৎসারিত হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক করুণা-ধারা। চোখ দুটিতে লাল, সাদা আর কালো রঙের ত্রিবেণী-সঙ্গম। স্তম্ভের চারপাশে দুটি দুটি করে মোট আটটি চোখ আছে এমন।

বর্গাকার স্তম্ভটির উপরিভাগ শঙ্কু-আকারের। সেই শঙ্কুটি আবার চক্রবেষ্টিত। চক্ররা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেল ওপরের দিকে এবং সবশেষে একটি চন্দ্রাতপকে মেলে ধরল। সেই চন্দ্রাতপও সোনালী। সোনালী আভা তা থেকেও ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে।

কে যোগাল এত সোনা? প্রাগৈতিহাসিক রহস্যময়কে এই সোনার বরণ কে দিল? সেদিন স্বয়ম্ভু-স্তূপের দিকে তাকিয়ে ভাবি।

কিন্তু সেদিন এর কোন জবাব পাইনি। জবাব পেয়েছি আজ। আজ জেনেছি, সোনা দিয়েছেন এক ঋষি। তাঁর সঞ্চিত রত্নভাণ্ডারকে ওখানে উজাড় করে দিয়েছেন।

স্বয়ম্ভুনাথে সোনা উজাড় করলেন ঋষি, আর শিল্পী উজাড় করলেন তাঁর প্রতিভা।

ইতিহাসে পাই, একদিন অনেক শিল্পী এসেছিলেন এখানে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একদিন চীন থেকে এখানে এসেছিলেন সেরা চিত্রকররা। নেপালের তৎকালীন শাসনকর্তা জঙ্ বাহাদুর ডেকে এনেছিলেন ওঁদের। উনি হুকুম দিয়েছিলেন, যত টাকা লাগে লাগুক; যত খরচ হয় হোক; নেপালের বৌদ্ধ-বিহার ও চৈত্যগুলোকে সুন্দর করে গড়ে তোল।

জঙ্ বাহাদুরের হুকুম তামিল করা হল অচিরেই; এবং অচিরেই দেখা গেল, হিন্দু ও বৌদ্ধরা স্বয়ম্ভু-স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, ভগবানের পাদপীঠ শিল্পীর হাতে নবজন্ম লাভ করল।

কিন্তু হায়! কে শিল্পী, আর কে ভক্ত! কে রাজা, আর কে প্রজা! শিল্পী এখানে এসে ভক্ত হয়ে ওঠেন, রাজা হয়ে ওঠেন প্রজাদেরই একজন। তা না হলে চৈনিক-শিল্পীরা স্বয়ম্ভুনাথের কাজ সেরে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে দেশে ফিরবেন কেন? আর কেনই বা রাজা জ্যোতির্মল্ল শৈব হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ-স্তূপ স্বয়ম্ভুনাথকে উদ্ধার করার জন্যে ব্যাকুল হবেন?

জ্যোতির্মল্লের কথা নেপালের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ওখানে পাই, ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতা স্থিতিমল্লের মৃত্যুর পর নেপালের সম্রাট হলেন তিনি।

কিন্তু সম্রাট হয়ে তিনি কী করলেন?

ইতিহাস বলে, তিনি যা করলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম

রাজাই তা করেছেন। তিনি নিজে শৈব হয়েও বৌদ্ধ-মন্দিরকে রক্ষা করলেন এবং নিজে অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে বললেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

মাত্র চার বছর রাজত্ব করেছিলেন জ্যোতির্মল্ল। কিন্তু এই চার বছরেই স্বয়ম্ভুনাথে যে পরিমাণ ভক্ত-সমাগম হয়েছিল, সচরাচর চার যুগেও তা হয় না।

কিন্তু যুগ তো স্বয়ম্ভুনাথের সামনে বুদ্বুদের মতো, ক্ষণস্থায়ী একটা মুহূর্তের মতো, চোখের একটা পলকের মতো। তাই যদি না হবে তো কোথায় গেল সব? এত প্রার্থনা, এত প্রেম, এত অর্ঘ্য, এত আরাধনা, যুগ যুগ ধরে এত শত ভক্তের এত আকুল নিবেদন,—এতসব কোথায় গেল? লিখি-লিখছি করতে করতে এদের কথা লিখে রাখতে ভুলে গেলেন বুঝি ঐতিহাসিকেরা? নাকি 'লিখব' বলে কলম হাতে নিয়েও লেখার আর সময় পেলেন না ওঁরা? বুদ্বুদ হয়ে ওঁরা নিজেরা যেমন, ওদের দেখা ঘটনাগুলোও তেমনি হারিয়ে গেল?

বুদ্বুদ, সবাই বুদ্বুদ আমরা, সেদিন মনে হল একবার। মনে হল, আমাদের ভিতরকার কামনা-বাসনাগুলোও বুদ্বুদ হয়ে স্বয়ম্ভু-স্তূপের গায়ে আছড়ে পড়ছে।

কিন্তু স্তূপের পাশেই কে উনি? বুদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন যেন?

ভালো করে তাকাতেই দেখি, এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। গৈরিক বসন পরে আমাদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—কিছু চাইছি। পরিষ্কার বাংলায় ভিক্ষুটি বললেন।

—কিন্তু আমরা কিছু দিচ্ছি না। আমাদের সহযাত্রী প্রদীপবাবুরও পরিষ্কার জবাব।

বৌদ্ধ ভিক্ষুটি হাল ছাড়েন না তখনও। আমার কাছে এসে হাত পাতেন আবার, কী? কিছু পাব?

প্রদীপবাবু আমার হয়ে জবাব দেন, বললাম যে, এখানে সুবিধে হবে না।

ভিক্ষু কোন জবাব দেন না প্রদীপবাবুর কথার। বুদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ধীরে ধীরে চলে যান।

আমি শুধাই, লোকটা কে?

প্রদীপবাবু বলেন, কে তা কেউ জানে না। কেউ বলে, ভারতীয় ভাষার সঙ্গে নেপালী ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ও উন্মাদ হয়ে গেছে। আবার কেউ বলে, সব বুজরুকি, সব। আসলে ও একটা খুনী; আইনের হাত এড়াবার জন্যে ভারত থেকে পালিয়ে নেপালে এসেছে।

—প্রথম অনুমানটা যদি সত্যি হয়—এবারে টিপ্পনি কাটি আমি, তবে ওকে পয়সা না দিয়ে অন্যায় করেছি।

এদিকে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে যাকে নিয়ে এত বাক্-বিতণ্ডা, তার কণ্ঠ ভেসে আসছে খানিকটা দূর থেকে

—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। উদাত্তকণ্ঠে বলে চলেছেন তিনি।

—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন অধর্ম অনুরণিত হচ্ছে একবার।

—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। পরমুহূর্তেই বিদ্বান বলে মনে হচ্ছে ওঁকে।

কিন্তু হায় রে বিদ্বান আর অবিদ্বান! স্বয়ম্ভুনাথে এসে অতি বড় বিদ্বানেরও কি মাথা নত হয়ে যায় না? আবার অতি বড় অবিদ্বানেরও কি মনে হয় না, অজ্ঞানের আঁধার ভেদ করে আলোকিত সঙ্ঘকে খুঁজে পাচ্ছি?

জানি নে, বিদ্বান-অবিদ্বান আর আঁধার-আলোর 'ফ্যালাসি'। জানি শুধু এই যে, স্বয়ম্ভুনাথ বহু বিপরীতের মিলনক্ষেত্র। একদিকে বহু বৌদ্ধের এবং অপর দিকে বহু শৈবের পুণ্যতীর্থ।

স্বয়ম্ভুনাথের মূল স্তূপটির আশেপাশেই চোখে পড়ে ছোট-

খাট আরও অনেক দেবদেবী, অনেক পুণ্যস্তম্ভ এবং অনেক পবিত্র মন্দির।

মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শীতলাদেবী। স্বয়ম্ভুনাথের প্রধান চৈত্যটির খুব কাছেই আছে এটি এবং এটির গায়ে আছে অপরূপ সব কারুকার্য।

কিন্তু কারুকার্য বড় কথা নয় এখানে, বড় কথা শৈব দেবতা শীতলার অধিষ্ঠান, বসন্ত রোগবাহিকা ও বসন্ত-বিনাশিনীর অবস্থান।

বসন্ত রোগ ছাড়াও আরও অনেক মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা রয়েছেন এখানে। এখানেই রয়েছেন কাঠমাণ্ডু-উপত্যকার শিশুদের অভিভাবিকা দেবী হারাতি।

এই হারাতি-মন্দিরটি প্যাগোডার ছাঁচে গড়া।

কিন্তু প্যাগোডা নয়, স্তূপ নয়, স্তম্ভ নয়, দেবীমূর্তি নয়, সেদিন যা আমাকে সবচেয়ে বেশি স্তম্ভিত করেছিল, তা হল স্বয়ম্ভুনাথে বিপরীত দুই ধর্মের সহাবস্থান; বিপরীত দুই শ্রেণীর দেবদেবীর দ্বৈত-অধিষ্ঠান।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীরা ঠিক এমনি করেই পাশাপাশি অধিষ্ঠিত নেপালে। নেপাল-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই এই। হিন্দুধর্মকে যেমন, বৌদ্ধধর্মকেও তেমনি সে গ্রহণ করেছে এবং উভয়কে মিলিয়ে সে গড়ে তুলেছে আশ্চর্য এক সমন্বয়ধর্মী সভ্যতা।

স্বয়ম্ভুনাথ নেপালের এই সমন্বয়ধর্মিতার প্রতীক। অথবা আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে, নেপাল-আত্মার প্রতীক। তবে কি স্বয়ম্ভুনাথই নেপাল? নেপালই স্বয়ম্ভুনাথ? বার বার নিজেকেই প্রশ্ন করি সেদিন। স্বয়ম্ভু-পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে নিজের কাছেই জানতে চাই, তবে কি স্বয়ম্ভুনাথই নেপাল?

ওদিকে দূরে নেপাল-মধ্যমণি কাঠমাণ্ডুকে চোখে পড়ছে। অনেকটা উঁচু থেকে এবং বেশ খানিকটা দূর থেকে দেখছি বলে একসঙ্গে সবটুকু চোখে পড়ছে কাঠমাণ্ডুর।

কাঠমাণ্ডু তখন আলো-ঝলমল। শরৎ-সূর্যের বন্দনা করতে

করতে সে তখন মধ্যাহ্নের সিংহদ্বারে উপনীত। আর আমরা উপনীত হাজার বছর আগেকার শান্ত, স্তব্ধ একটা যুগে। আমাদের চারিদিকে বুদ্ধমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে যেন। যেন শ্রমণরা এসেছে দূর-দূরান্তর থেকে।

দেখতে দেখতে স্বয়ম্ভু-স্তূপের চারিদিকে ধর্মচক্রগুলো ঘুরতে লাগল। বৌদ্ধ-সাধনার বিচিত্র সব মুদ্রা প্রকটিত হল আমাদের সামনে। জ্ঞান-মুদ্রা, তর্জনী-মুদ্রা, অভয়-মুদ্রা ও ধর্মচক্র-মুদ্রা দেখতে দেখতে আমরা যেন হঠাৎ পিছু হটে অদ্ভুত ও আশ্চর্য একটা যুগে ফিরে গেলাম। সে যুগ প্রার্থনার যুগ, আত্মনিবেদনের যুগ, প্রেম-প্রীতি ও অহিংসার যুগ। সে যুগে মঞ্জুশ্রী সত্য, অবলোকিতেশ্বর সত্য, সত্য বজ্রপাণি। সে যুগে পথে-ঘাটে একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হয়; এবং সেই মন্ত্র হল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। একটু আগে দেখা সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুটি আবৃত্তি করে চলেছেন তখনও।

—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। তখনও তাঁর উচ্চারিত বুদ্ধমন্ত্র স্পষ্ট কানে আসছে।

—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই উচ্চারিত সঙ্ঘ-স্তুতি শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকি আমরা।

নামতে সময় লাগে না বেশি; কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা ধরে। দারুণ ব্যথা। মনে হয়, এই বুঝি পা দুটো দেহ থেকে আলগা হয়ে যাবে।

প্রদীপবাবু পরামর্শ দিলেন, অভয়-মুদ্রায় বসবেন নাকি একবার? একটুক্ষণ জিরিয়ে নেবেন?

আমি বললাম, না থাক। মুদ্রাটা বাড়িতে ফিরে গিয়ে প্র্যাক্টিস্ করা যাবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেদিনও বেলা হল অনেক। সেদিনও সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলান দিল।

কিন্তু কাঠমাণ্ডুর আকাশটা কতটুকু ? দূরের ওই পাহাড়গুলো অবধি ?

আজ ভাবি, আরও অনেক দূর অবধি বোধহয়।

বোধহয় ওই পাহাড় ছাড়িয়েও আছে নেপালের যে মালভূমি, উপত্যকা আর তরাই, কাঠমাণ্ডুর আকাশ সেখানেও আলো ছড়ায় ; সেখানেও রাজধানী কাঠমাণ্ডু দুঃখ-সুখের মায়াজাল বোনে।

মায়াজাল রাজধানীর পথে পথেও কত যে! কত যে পথিক আজ কাঠমাণ্ডুর পথ ধরে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়! শতাব্দী-প্রাচীন ইমারতগুলোর দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ভাবে, এ কোন্ দেশে এলাম ? এই ইমারতরা কোন্ যুগের কথা বলছে ? মহাকালের কোন্ গহ্বর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে এরা ? ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়ের কতটুকু জায়গা এদের নিয়ে হাহাকার করছে ?

—জানি নে। ইমারতের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার ভাবে পথিক, জানি নে।

কাষ্ঠমণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও ভাবি একদিন, জানি নে।

জানলাম পরে। কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে চোখ ফিরিয়ে কাঠমাণ্ডুর ইতিহাসের দিকে তাকালাম যেদিন, সেদিন জানলাম এই মণ্ডপ থেকেই রাজধানীর নাম হয়েছে কাঠমাণ্ডু। আর মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে একটিমাত্র গাছের কাঠ থেকে।

ইতিহাসে পাই, রাজা লক্ষ্মী নরসিংহ মল্লের আমলে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়েছে এই মণ্ডপ। তবে তৈরির পেছনে রাজার প্রত্যক্ষ কোন অবদান ছিল কিনা, ঐতিহাসিকদের মধ্যে তা নিয়ে সংশয় আছে।

সংশয় থাকবারই কথা। কারণ, রাজা লক্ষ্মী নরসিংহ, যিনি নিজের পায়ে নিজে কুঠার চালিয়ে ভীম মল্লের মতো বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন এবং যিনি ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন কিছুটা বিকৃত-মস্তিষ্ক, তিনি আর যা কিছুই হোক না কেন, কাষ্ঠমণ্ডপের

মতো সুন্দর একটা মন্দির গড়ার স্বপ্ন যে দেখতে পারেন না, এ-কথা একরকম জোর করেই বলা যায়।

হ্যাঁ, জোর করেই বলা যায় যে, এমনকি কাষ্ঠমণ্ডপের ঐশ্বর্যও অকৃতজ্ঞ লক্ষ্মী নরসিংহের পাপকে ঢেকে রাখতে পারল না। সুযোগ্য মন্ত্রী ভীম মল্লের সঙ্গে যে বেইমানী করেছিলেন তিনি, তা মুছে দিতে পারল না। ভীম মল্ল কাষ্ঠমণ্ডপের চেয়েও অনেক বেশি ঐশ্বর্য নিয়ে নেপালের ইতিহাসে সোনার হরফ হয়ে রইলেন, আর নেপালের পথে-প্রান্তরে গুঞ্জরিত হল তাঁর কথা।

লোকে বলল, ভীম মল্লের মতো বুদ্ধিমান্ এদেশে খুব অল্পই জন্মেছেন। আর শুধু এদেশে কেন, বিদেশেও বোধ করি তাঁর মতো বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী খুব অল্পই জন্মে থাকেন। একদিকে তিব্বতের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন তিনি, আর অপরদিকে কাঠমাণ্ডুর পথে পথে পণ্যশালা গড়ে তুলে দেশকে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু মূর্খ ও বিকৃত-মস্তিষ্ক সম্রাট লক্ষ্মী নরসিংহ এত কিছু বুঝলে তো! তিনি বুঝলে তো যে, ভীম মল্ল দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই প্রতিবেশী রাজ্য তিব্বতের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছেন!

লক্ষ্মী নরসিংহ উল্টো বুঝলেন বরং। তিনি ভাবলেন, ভীম মল্ল সিংহাসন থেকে তাঁকে হটিয়ে দিয়ে নিজে রাজা হতে চায়। অতএব—

লোকে বলল, অতএব নির্বোধ রাজা মারলেন নিজের পায়ে নিজের কুড়োল। ভীম মল্লের রক্তাক্ত শির একদিন কাঠমাণ্ডুর রাজপথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অট্টহাসিতে লুটিয়ে পড়লেন।

—কিন্তু একি! বলাবলি করে সবাই, একি! রাজার হাসি যে আর থামে না! রক্ত শুকিয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ভীম মল্ল; কিন্তু রাজার হাসি থামে না যে!

—থামবে কী করে! বলাবলি করে পারিষদরা, কী করে থামবে! রাজা কী আর রাজা আছেন! উন্মাদ হয়ে গেছেন যে!

—উন্মাদকে তাহলে গারদে পোরো। পরামর্শ দিল শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

শোনা যায়, শেষ অবধি গারদেই পোরা হল রাজাকে। এবং দীর্ঘ ষোল বছর ধরে গারদের প্রহরীরা উন্মাদ রাজার অট্টহাসি শুনল।

—রাজার অনুতাপ হচ্ছে রে। প্রহরীরা গুন্‌গুন্ করল এক-এক সময়। বলল, বন্ধু ভীম মল্লকে মেরে রাজা একেবারে খেপে গেছেন।

আজ আশ্চর্য লাগে ভাবতে, ওই খ্যাপা রাজা লক্ষ্মী নরসিংহের আমলেই একদিন গড়ে ওঠে কাষ্ঠমণ্ডপ। শহরের একেবারে মাঝখানে গড়ে ওঠে।

ওই মণ্ডপটিকে দেখা যায় এখনও। এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি, শহর কাঠমাণ্ডুর পুরনো রাজমহল হনুমান-ঢোকার খুব কাছেই মূর্তিমান একটি রহস্যময়ের মতো দাঁড়িয়ে অপরূপ এক প্যাগোডা।

প্যাগোডাটি তিনতলা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মন্দির এ নয় ; এ বুঝি পথের পাশে সুরম্য কোন আশ্রয়-শিবির। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত যে কেউ যে কোন সময় এখানে আশ্রয় পেতে পারে।

শোনা যায়, একসময়ে পথিকরা আশ্রয় পেত এখানে। অন্তত একটি রাত্তিরের জন্যেও এখানে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেত।

কিন্তু আজ দিনবদল হয়েছে। কাষ্ঠমণ্ডপে ঠাঁই পাবার কথা কেউ কল্পনাও করে না। কারণ, আজ দেবতা গোর্খনাথ ওখানে থাকেন। স্বয়ং দেবতা পাষাণ-প্রতিমার মধ্য দিয়ে ওখানে নাকি আলো ছড়ান।

কাষ্ঠমণ্ডপে দাঁড়িয়ে পাষাণ-প্রতিমাটির দিকে তাকাই। বার বার নিরীক্ষণ করি গোর্খনাথের মূর্তিটিকে। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও কোন আলো খুঁজে পাই না সেখানে। বরং বার বার খুঁজে পাই সামনের রাস্তা থেকে ভেসে-আসা কলকোলাহল। স্পষ্ট শুনি সাইকেল-রিক্সার ক্রীং ক্রীং আর মোটর গাড়ির শোঁ শোঁ।

গাড়ি অনেক চলে ওদিকে। অনেকেই কাষ্ঠমণ্ডপের একেবারে দরজা অবধি গাড়ি নিয়ে যান।

দরজার ঠিক সামনেই আছে ফুট ছয়েক উঁচু বেড়া। মণ্ডপটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে আছে। অতএব, যে যত বড় রথে চড়েই ওখানে যান না কেন, রথটিকে বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড় করাতে হবে।

আমরা রথী নই। গাড়ি বা সাইকেল-রিক্সার কোনটাই আমাদের কাষ্ঠমণ্ডপে পৌঁছে দেয়নি। আমরা মণ্ডপে গেছি পায়ে হেঁটে। এবং গেছি বলেই কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাঠমাণ্ডুই শুধু নয়, কান্তিপুরকেও বোধ করি খুঁজে পেয়েছি আমরা।

হ্যাঁ, পেয়েছি খুঁজে কান্তিপুরকেও। কাষ্ঠমণ্ডপে যাবার সময় সহযাত্রী প্রদীপবাবুর কাছ থেকে শুনেছি তার কথা। শুনেছি কিছু; কিছু আবার নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছি। এবং সেই সবকিছু মিলিয়ে কান্তিপুরের একটা ছবি এঁকেছি মনে মনে। ছবিটা প্রায় হাজার বছর আগেকার এক শহরের। শহরটি পত্তন করেন সম্রাট গুণকাম দেব। আজ যেখানে কাঠমাণ্ডু, ঠিক সেখানেই নতুন এক জনপদের পত্তন করেন তিনি।

গুণকাম দেব সম্বন্ধে নেপালের ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই বড় বেশি মিতভাষী। একটি দুটি মাত্র বিশেষণ প্রয়োগ করে তাঁকে বোঝাতে চেয়েছেন প্রায় সবাই। প্রায় সবাই একবাক্যে বলেছেন, তিনি ছিলেন সত্যিকারের এক পরাক্রান্ত ও সম্পদশালী রাজা। কিন্তু তিনি যে সুন্দরের পূজারীও ছিলেন, সেকথা প্রায় কেউ-ই বলেননি।

এদিকে আমি কান্তিপুরের যে ছবি এঁকেছি মনে মনে, সেখানে পরাক্রান্ত ও সম্পদশালী রাজ-রাজেশ্বরের চেয়ে সৌন্দর্য-রসিক সহজ মানুষ গুণকাম দেবই বেশি উজ্জ্বল। সেখানে বাগমতী ও বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে-থাকা রূপদর্শী একটি ব্যক্তিই বেশি উজ্জ্বল।

রূপদর্শীটিকে দেখতে পাই যেন। যেন স্পষ্ট চোখে পড়ে, বাগমতী

যেখানে এসে বিষ্ণুমতীর সঙ্গে মিলল, ঠিক সেখানেই কান পেতে বসে নেপালের হৃদ্‌স্পন্দন শুনছেন তিনি। শুনতে শুনতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হচ্ছেন বার বার। বলছেন, এখানেই, ঠিক এখানেই পত্তন করো রাজধানী। এই দুই নদীর তীর ঘেঁষে দূরের ওই পাহাড়ীয়া বনভূমিকে সাক্ষী রেখে রাজধানী পত্তন করো। আর এত সুন্দর এই জায়গা! এখানকার এই নদী, পাহাড় আর ঝরনা এত সুন্দর! এর নাম দাও কান্তিপুর; অর্থাৎ শ্রীভূমি নাম দাও এর। নাম দাও গৌরব-নিকেতন।

সেই থেকে কান্তিপুর নাম হল রাজধানীর; এবং তারপর কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে হল কাঠমাণ্ডু।

পাঁচ

কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে নাম হল কাঠমাণ্ডু। আর সম্রাট গুণকামদেবের দেওয়া কান্তিপুর নামটা তোলা থাকল ইতিহাসের পাতায়।

কিন্তু কোথায় সেদিনের সেই কান্তিপুর আর কোথায় আজকের এই কাঠমাণ্ডু! এদের দুটিতে কত তফাৎ আজ!

আজ কাঠমাণ্ডুর সৌখিন ও সুপ্রশস্ত রাজপথ 'নিউ রোড' ধরে চলার সময় সেদিনের কথা কে আর মনে রাখে!

অথচ এই সেদিনও কত কী আজব ব্যাপার ঘটত এখানে! রূপসী মেয়েরা রাজধানীর এই পথে বেরোতে সাহস পেত না; আর বেরোলে অক্ষত ফিরত না কেউ।

এছাড়া এই সেদিনও কত উৎসব হ'ত এ-পথে। নাগ-পঞ্চমী হ'ত, হ'ত কাক-তিহার।

নাগ-পঞ্চমী ছিল নাগ-দেবতার উৎসব। দেবতাকে নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা চলত এই উৎসবে। নাগদের বিচিত্র সব ছবি এঁকে দেবতার প্রসাদ প্রার্থনা করা হ'ত।

ছবি আঁকা থাকত পথের দু'ধারে, ঘরের দরজায় দরজায়। আর স্থানীয়েরা ওই ছবি দেখিয়ে বলত, ওই হলেন গিয়ে নাগ-দেবতা। অপদেবতাদের হাত থেকে উনিই বাঁচাবেন আমাদের।

কিন্তু আজ দিনবদল হয়েছে কান্তিপুরের। অপদেবতারা আজ আর শহরের বড় রাস্তায় হানা দেন না। গলি-ঘুঁজিগুলোর ভেতরেই কোনরকমে টিঁকে থাকেন।

এছাড়া কাকদেরও আগের সেই খাতির আর নেই। খোদ রাজ-পথের ওপর 'কাক-তিহার' এখন আর বড় একটা চোখে পড়ে না।

চোখে পড়ত সেকালে, সেই গুণকামদেবের আমলে। তখন

'কাক-তিহার' নিয়ে মেতে উঠত সারা কান্তিপুর। 'তিহার'-এর প্রথম দিনে ভোর না হতেই আহ্বান জানানো হ'ত কাকদের। নানা-রকম 'সুখাদ্য' ছড়িয়ে রেখে প্রাণপণে ওদের ডাকা হ'ত।

ওরা আসত ঠিক। দলে দলে আসত। আর ভক্তরা সেই অভ্যাগত দলগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রণাম করত থেকে থেকে। বলত, ওরা হলেন গিয়ে যমদূত। ওদের খুশি করা মানে, যম-দেবতাকে খুশি করা।

'কাক-তিহার'-এর দ্বিতীয় দিনে খুশির আয়োজন চলত অন্য-ভাবে। যম-দেবতার 'দ্বার-রক্ষক' কুকুরকে অভ্যর্থনা করা হ'ত ঐদিন। এবং ঐ অভ্যর্থনার বহরটাও ছিল রাজসূয়।

কুকুরকে মালা পরানো হ'ত প্রথমে। তারপরে পুজো করা হ'ত; এবং সবশেষে হ'ত খাওয়ানো।

'তিহার'-উৎসবের তৃতীয় দিনে পূজা পেত গরুরা। লোকে বলত, ঐশ্বর্যের দেবতা লক্ষ্মী ইনি। একে পূজা করা মানে, সাক্ষাৎ ঐশ্বর্যকে ঘরে আনা।

ওদিকে ঘরে ঘরে আলো জ্বলত সন্ধ্যে হলেই। আমাদের দেওয়ালী-উৎসবে যেমন জ্বলে, ঠিক তেমন করেই জ্বলত।

আজকাল এই 'তিহার'-উৎসব একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, তা বলব না। বরং বলব, আজও প্রতি বছরই কার্তিক মাসে নেপালীরা এই উৎসব করে থাকে। উৎসবে আলোও জ্বলে ঠিক। তবে কাক, কুকুর ও গরু নামক অতিথিরা আগের মতো এখন আর ঠিক সমাদর পায় না।

কান্তিপুরের রাজপথে এই সমাদরের পাট এখন তো একরকম চুকেই গেছে বলতে গেলে। এখন হাল-ফ্যাশানের 'নিউ রোড'কে দেখে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না, 'কাক-তিহার' নেপালীদের কত প্রিয় ছিল। এই কান্তিপুরের রাজপথকে ঘিরেই একদিন কত উৎসব হ'ত নেপালে।

উৎসবে অনেকেই যোগ দিত তখন। ছেলে, বুড়ো অনেকেই দিত। কিন্তু যোগ দিত না শুধু মেয়েরা ; এবং বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েরা। ওরা বলত, 'কাক-তিহারে' দু'রকমের কাক আসে যে! দু'রকমের যমদূত আসে। রাজদরবার থেকে আসে যে দূতরা, তাদের নিয়েই ভয় আমাদের। ভয় কেননা, যমরাজের কাছে শিকারকে ওরা জ্যান্ত নিয়ে যায়।

শুনেছি, এমনিতরো জ্যান্ত শিকার নিয়ে কারবার এই সেদিনও ছিল নেপালে। মাত্র কয়েক যুগ আগে রাণাদের আমলেও ছিল।

কিন্তু আজ আমূল বদলে গেছে কান্তিপুরের চেহারা। রূপসীরা আজ হামেশাই তার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

কত রূপসীকে আমরাই তো দেখলাম সেদিন। কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসে নিউ রোড ধরে চলার সময় কতজনকে দেখলাম।

এদের এই মিছিল সেকালের কান্তিপুরে চোখে পড়ত না নিশ্চয়। নিশ্চয় আজ নিউ রোড-এর দু'পাশে সারি সারি দোকান যেখানে, একদিন সেখানে ছিল সারি সারি কিছু বুনো গাছ আর ছাড়া ছাড়া কিছু ঘরবাড়ি। ঠিক আজকের মতো কোন অপরাহ্নে হয়তো বা পাখি ডাকত সেখানে। হিমালয়ের নাম-না-জানা বিহঙ্গেরা বিনা আমন্ত্রণেই সেখানে জলসা সুরু করত।

কিন্তু আজ কোথায় জলসা! কোথায় আরণ্যক কান্তিপুর! আজ নিউ রোড নামক জপমালাটিকে বুকে চেপে ধরে রাজধানী আধুনিকতার নামগান করছে।

হ্যাঁ, আধুনিকতাই বটে! নিউ রোড-জাতীয় কাঠমাণ্ডুর নতুন-গড়া মহল্লাগুলোর দিকে তাকালে উগ্র আধুনিকতারই ঝাঁজ এসে গায়ে লাগে। মনে হয়, পাহাড়ীয়া কয়েকটি গ্রাম্য বধূকে লিপস্টিক মাখিয়ে, টেরিলিন পরিয়ে, বব-ছাঁট দিয়ে হঠাৎ বাইরে ছেড়ে দিলে যেমন দেখাবে, এদেরও দেখাচ্ছে ঠিক তেমনি।

নিউ রোড-এর দোকানগুলো দেখলাম। দেখলাম, বিদেশী পণ্যের সেখানে ছড়াছড়ি। সেখানে জাপান থেকে এসেছে টেরিলিন, ট্র্যান্‌জিস্টার ও ছাতা ; চীন থেকে এসেছে কাগজ, কলম ও খেলনা ; রাশিয়া থেকে এসেছে বিচিত্র সব ছিট-কাপড় ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুড্‌স্ এবং ইয়োরোপ থেকে এসেছে ঘড়ি ও ওষুধ। এছাড়া ভারতবর্ষ থেকেও কত কী যে এসেছে সেখানে।

নেপাল ওই একরকমের। সারা পৃথিবীর রূপ-রস কিছু কিছু করে নিয়ে সে এখন তিলোত্তমা হতে চাইছে।

মনে পড়ে, তিলোত্তমা-সম্ভবা আজকের নেপালকে প্রদীপবাবুর বাড়িতেও খুঁজে পেলাম। সেখানে দেখলাম, কাপড় কাচা হচ্ছে রুশ সাবান দিয়ে, লেখা চলছে চীনা কলম দিয়ে, আর রান্না চলছে ভারতীয় মশলা দিয়ে। এছাড়া প্রদীপবাবুর বাড়ির ময়দা অষ্ট্রেলীয়, চিনি সুইডিস, চাল চীনা এবং সুজি ভারতীয়।

—টেব্‌ল্ ক্লথ্‌টি কোথাকার ? একবার শুধিয়েছিলাম ওঁকে।

উনি জবাব দিয়েছিলেন, রাশিয়ার।

—টেব্‌ল্-এর ওপরকার ফুলদানীটি ?

—জাপানী।

—বেড্‌-সীট ?

—মার্কিনী।

—নেপালের নিজের কি আছে তবে ? বিরক্ত হয়েই ওঁকে শুধিয়েছিলাম একবার।

উনি জবাব দিয়েছিলেন, ঠিক নিজের বলতে শিল্পদ্রব্য বিশেষ কিছু নেই।

—কিছু নেই ?

—না, নেই। তবে শিল্পায়নের চেষ্টা চলছে এখানে। পাট, চিনি, সিমেণ্ট, কাগজ, প্লাইউড্‌, সাবান এবং সুতি-কাপড় ও উলের উৎপাদন বাড়াবার আয়োজন চলছে।

বললাম, আয়োজনটা যদি সুপরিকল্পিত হয়, তবে তো নেপালের বৈষয়িক উন্নতি অবধারিত।

প্রদীপবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, রাখুন মশাই উন্নতি! গোটা দেশটা এখন কচ্ছপের গতিতে এগোচ্ছে।

শুধালাম, কচ্ছপের গতি? সে আবার কী?

প্রদীপবাবু বুঝিয়ে দিলেন, হল এই যে, দেশটা চলি চলি করেও যেন ঠিক চলছে না। শিল্প গড়ি গড়ি করেও যেন ঠিক গড়ে উঠছে না এদেশে।

বললাম, শিল্প গড়ে উঠতে বাধাটা কোথায়?

—বাধা অজস্র। একনম্বর বাধা, এখানকার পরিবহণ-ব্যবস্থা অনুন্নত। তাছাড়া কাঁচামালের অভাব এখানে, অভাব বাজারের এবং উপযুক্ত কারিগরী-শিক্ষার। তাই শিল্পায়নের দিক থেকে যা কিছু করছে নেপাল, তারই জন্যে তাকে বিদেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

—কিন্তু বিদেশ তো নেপালকে সাহায্য করার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত!

—হলই বা প্রস্তুত! তাই বলে শুধুমাত্র বিদেশের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কোন দেশ কি আর বড় হতে পারে?

বললাম, তা হয়তো পারে না। কিন্তু অনুন্নত থেকে অধোন্নত হতে পারে নিশ্চয়!

প্রদীপবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন আবার, না, তাও পারে না। কারণ, সত্যিকারের কিছু উন্নতি করতে গেলে দেশকে নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করতেই হবে।

—নিজের শক্তির ওপর নেপাল কি নির্ভর করছে না?

—করছে, তা কী করে বলি! কারণ, নির্ভর যদি সে করত, তবে কাঁচামালের অভাবে তার চিনির কল বন্ধ হয়ে যেত না।

—চিনির কল বন্ধ হয় নাকি?

—হ্যাঁ, হয়। আখের অভাবে প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায় কল। অথচ দেখুন, বিদেশী সাহায্যের তো অভাব ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন সবরকম যন্ত্রপাতি দিয়েই সাহায্য করেছিল নেপালকে।

শুধালাম. অন্যসব কলকারখানার কী অবস্থা ?

প্রদীপবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অবস্থা প্রায় একই রকম। অর্থাৎ কিনা, এ বলে, ওকে ছ্যাখ।

বললাম, এর মানে ?

—মানে হল এই যে, একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রদীপবাবু শুরু করলেন আবার, এখানকার সিগারেট-কারখানা চলে তো প্লাইউড্-এর অভাবে দেশলাই-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। আবার দেশলাই চালু থাকে তো তামাকের অভাবে সিগারেট অচল হয়ে পড়ে।

—ইস্পাত-শিল্পের কী হাল এদেশে ?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রদীপবাবু বললেন, হাল খুবই খারাপ। কাঁচামাল আর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে এ-শিল্পটি এখন সারা নেপাল থেকে পাততাড়ি গুটোতে ব্যস্ত।

বললাম, শিল্পের আর দোষ কী! অবস্থার উল্টো যদি হয় ব্যবস্থা, তবে শিল্প তো পাততাড়ি গুটোবেই !

—ঠিক বলেছেন মশাই, ঠিক বলেছেন ! প্রদীপবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন এইবার। বললেন, এতক্ষণে মনের মতো একটা কথা বলেছেন। কী জানেন, অবস্থার ঠিক উল্টো ব্যবস্থাই এখানে হচ্ছে। আর তাই যদি না হবে তো হঠাৎ মদের কারখানা খোলার কী দরকার ছিল ? নেপালে কি দেশী মদের অভাব আছে কিছু ? আর সে-মদ কি বিলিতী কায়দায় গড়ে-তোলা 'ডিস্টিলারি'র মদের চেয়ে কিছু খারাপ ?

বললাম, খারাপ কিনা জানি নে। তবে স্টেইনলেস স্টীল আর নাইলন-তৈরীর কারখানা নেপাল এখন না গড়লেও পারত।

এখন 'এসেনসিয়্যাল কমোডিটি'র ওপরেই জোর দিলে ভালো করত সে।

প্রদীপবাবু বললেন, তা তো করতই। কিন্তু এই সত্যি কথাটা *জোর-দেনেওয়ালাদের কে বুঝিয়ে বলে, বলুন? কে ওদের বলে যে,* বাসন-পত্তর তৈরীতে নেপাল এমনিতেই দক্ষ। শত শত বছর ধরে বিদেশে বাসন রপ্তানি করে সে সুনামও কুড়িয়েছে প্রচুর; এবং এই সুনামের জন্যে কারখানা গড়তে হয়নি তাকে, কুটির-শিল্পই তাকে শক্তি যুগিয়েছে।

বললাম, যুগিয়েছে তো বটেই। তা না হলে তিব্বতের সঙ্গে তার দোস্তি হ'ত কী করে?

প্রদীপবাবু বললেন, না, ঠিক তা নয়। তিব্বতের সঙ্গে দোস্তির অন্য কারণও আছে। আমার ধারণা, ঘরে-বোনা তাঁতবস্ত্র দিয়েই তিব্বতের মন ভুলিয়েছে নেপাল।

—কিন্তু এই তাঁতশিল্পের এখন কী হাল জানেন? অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা ফেলে দিয়ে প্রদীপবাবু আবার শুরু করলেন, খুবই খারাপ। বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত আজও চালু হল না এদেশে। অথচ নাইলন নিয়ে কোলাহল শুরু হল। আরে মশাই, নাইলন আর স্টেইন্‌লেস্ স্টীল-এর 'র-মেটিরিয়্যাল' আসবে কোত্থেকে? বিদেশ থেকে না?

বললাম, বিদেশ থেকে আসবে তখনই, যখন নাকি বিদেশকে সেলামী দেবার মতো 'ফরেন্ এক্‌স্‌চেঞ্জ' পাওয়া যাবে।

প্রদীপবাবু লাফিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, ঠিক বলেছেন; ফরেন্ এক্‌স্‌চেঞ্জ। কিন্তু ভাই, এ-জিনিসটি নেপালের খুব একটা আছে কি?

বললাম, যতদূর শুনেছি, নেই।

—তাহলেই বুঝুন! প্রদীপবাবু বোঝাতে সুরু করলেন আবার, যা নেই তাকে মূলধন করে শিল্প। যা অসম্ভব তাকে ভিত্তি

করে বাণিজ্য। সেই শিল্প বা সেই বাণিজ্য কি কখনও উন্নত হতে পারে?

মনে পড়ে, কয়ালবাবুও ঠিক একই কথা বলেছিলেন, কখনও উন্নত হতে পারে?

কয়ালবাবুর কথা এখানে একটু বলে রাখি। ছত্রপটিতে 'শ্রেষ্ঠ নিবাস' নামক যে বাড়িটিতে আমরা থাকতাম, সেই বাড়িরই তিন-তলার একটি ফ্ল্যাটে ছিল তাঁর আস্তানা। এছাড়া প্রদীপবাবুর মতোই 'ইণ্ডিয়া এইড্ মিশন'-এ কাজ করতেন তিনি। 'একাউণ্টস্ সেক্সন্'-এর দায়িত্বপূর্ণ কোন পদে কাজ করতেন।

কিন্তু কয়ালবাবু সম্বন্ধে এগুলো বড় কথা নয়। বড় কথা হল নেপালের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা। নেপালের শিল্প নিয়ে কথা উঠলেই মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন তিনি। নিখুঁত পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলতেন, কী যে বলেন! ঠিক এইভাবে চললে দেশ কখনও উন্নত হতে পারে?

আমি আর প্রদীপবাবু ওঁকে উস্কে দিতাম এক একসময়। বলতাম, কোন্ভাবে চললে?

উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে। বলতেন, কোন্ভাবে আর? যেভাবে চলছে, ঠিক সেইভাবে চললে। এই ধরুন না কেন, নেপালের পরিকল্পনার কথা। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে সে খরচ করল মাত্র ২ কোটি টাকা। আরে মশাই! এই সামান্য টাকায় এতবড় একটা দেশের কী হবে? আমার ঘরে যদি লোক থাকে ২১ জন তো ২১ পয়সার বাজারে কার পেট ভরবে?

বললাম, পেট হয়তো একজনেরও ভরবে না। কিন্তু তবু তো পয়সা হাতে নিয়ে বাজারে যাওয়াটা হবে।

কয়ালবাবু বিরক্ত হতেন এই ধরনের কথা শুনে। বলতেন, অমন বাজারে লাভ?

প্রদীপবাবু টিপ্পনী কাটতেন, বাজার একদম না হওয়ার চেয়ে কিছু হওয়াটা লাভের বৈ কি।

এইখানে আমিও যোগ দিতাম প্রদীপবাবুর সঙ্গে। বলতাম, অনুন্নত দেশে একেবারে কিছু না হওয়ার চেয়ে সামান্য কিছু হওয়ারও একটা মূল্য আছে। বিশেষ করে, যে দেশের 'ইন্টারন্যাল রিসোর্স' নগণ্য, সে দেশে সামান্য কিছু কাজও অসামান্য হয়ে উঠতে পারে অনেক সময়।

কয়ালবাবু বলতেন, সামান্য-অসামান্যের মারপ্যাঁচ বুঝি নে মশাই। তবে হ্যাঁ, নেপালের 'ইন্টারনাল রিসোর্স' নগণ্য।

—কিন্তু নগণ্য বলে কি—, একটু থেমে আবার সুরু করতেন তিনি, দ্বিতীয় পরিকল্পনার তিন বছরে মাত্র ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে? তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে বরাদ্দ করতে হবে মাত্র ২৫০ কোটি টাকা?

এইখানে আমি মন্তব্য করি, তৃতীয় পরিকল্পনায় শুনেছি অনেক দূর এগিয়েছে নেপাল।

কয়ালবাবু আপত্তি করেন, অনেক দূর নয়; বলুন যে, কিছুদূর। এবং এগোবার একটা বড় কারণ হল, গত কয়েক বছরে নেপালের 'ইন্টারন্যাল রিসোর্স' অনেকটা বেড়েছে।

প্রদীপবাবু ফোঁড়ন কাটেন, বেড়েছে বললেই কেউ তো আর মাথা পেতে মেনে নিচ্ছে না!

—মেনে নিচ্ছে না মানে? কয়ালবাবু রীতিমতো উত্তেজিত এইবার। পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও মেনে নিচ্ছে না? যদি বলি ১৯৫৮-৫৯ সালে উন্নয়ন-খাতে 'ইন্টারন্যাল রিসোর্স' থেকে মাত্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছে নেপাল আর ১৯৬৭-৬৮ সালে দিয়েছে ১৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, তবু মেনে নিচ্ছে না?

এইখানে আমি একটা উপসংহারে পৌঁছুবার চেষ্টা করি।

কয়ালবাবুকে বলি, মেনে নিলে তো আপনার আগেকার যুক্তি আর টিঁকছে না। বরং দেখা যাচ্ছে, এইভাবে চললেই দেশ উন্নত হতে পারে।

কয়ালবাবু বলেন, এর নাম উন্নতি নয়। একে বলে, একুশ জন লোকের জন্যে ২১ পয়সার বাজার না করে ২ টাকা ২১ পয়সার বাজার করা।

আমি বলি, টাকার অংকটা আগের চেয়ে ১০ গুণ যদি বাড়ে তো বাজার আগের চেয়ে ভাল হবে নিশ্চয়!

কয়ালবাবু তীব্র আপত্তি জানান, ভালো হবে তা কী করে বলি! ভারতবর্ষ বা নেপালের মতো দেশে, যেখানে আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জিনিসপত্তরের দাম, সেখানে ভাল হবে তা বলি কী করে!

প্রদীপবাবু তীক্ষ্ণ একটা মন্তব্য করেন এইবার, কিন্তু দেশের লোকে যদি তাই বলে তো আমরা না বললেও যায়-আসে না কিছু!

—রেখে দিন মশাই দেশের লোক! ওরা বোঝেটা কতটুকু? কয়ালবাবুর কণ্ঠস্বরে রীতিমতো বিরক্তি।

বিরক্ত হই আমিও। বলি, কিন্তু ওরা এটুকু তো বোঝে যে, ২১ পয়সার জায়গায় ২ টাকা ২১ পয়সা নিয়ে বাজার করা ঢের সুবিধের।

—সস্তা সুবিধের এই আনন্দেই থাকুন! কয়ালবাবু বিদ্রূপ করেন যেন, তবু যদি ২ টাকা ২১ পয়সা সব ক'টি একুশ জনই পেত!

পাওয়া না-পাওয়ার সূক্ষ্ম হিসেব কয়ালবাবুর মতো আমরা জানি নে। তবে এটুকু বেশ জানি যে, তিনি নিজে আনন্দেই আছেন। তাঁর আপনজনদের নামকরণের মধ্যে দিয়েই এই আনন্দ উচ্ছ্বসিত। তাঁর নাম শৈলেন্দ্র, তাঁর বড় ছেলে শৈবেন্দ্র,

আর ছোট ছেলে শৈবালেন্দ্র। এছাড়া স্ত্রীকে তিনি শৈবলিনী বলেন।

শৈবলিনী বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু হলে কী হবে! শৈলেন্দ্রের ওপর এই ছোটর প্রভাব অপরিসীম।

শৈবলিনী একবার বললেই হল, অমুক শাড়িটা চাই; অথবা চাই অমুক গয়নাটা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছুটলেন শাড়ি আনতে অথবা গয়না গড়াতে।

এছাড়া শৈলেন্দ্রের পোশাক-আশাকের দিকেও শৈবলিনীর সজাগ দৃষ্টি। সাদার ওপর লাল স্ট্রাইপ-ওয়ালা জামা পরলে শৈলেন্দ্রকে নাকি ভাল মানায়। অতএব, ওই মানানসই জামা ছাড়া অন্য কিছু উনি পরতেন না।

মনে পড়ে, মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে ঘুরতে বেরোতেন যখন, তখনও ওই বিশেষ ধরনের কোন একটি জামাকেই উনি বেছে নিতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য কয়ালবাবুর। জামা বেছে নিয়েও বোধনাথে আমাদের সঙ্গে উনি যেতে পারলেন না। কয়াল-গিন্নী হঠাৎ বাধা দিলেন, আজ থাক। আরেক দিন যাবে।

আমরাও বললাম, থাক তবে।

অগত্যা কয়ালবাবুকে ছাড়াই বোধনাথ রওনা হলাম। শহর কাঠমাণ্ডু থেকে মাইল দু'য়েক দূরে স্তব্ধ গম্ভীর প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে-থাকা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ-স্তূপটির দিকে পা বাড়ালাম।

কিন্তু স্তূপ বলব বোধনাথকে? না কি বলব মানুষের গড়া ছোট-খাটো একটা পাহাড়?

মানুষের গড়া বলব? না কি বলব আপনা থেকেই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা?

জানি নে, কী বলব। তবে প্রথম-দর্শনে বোধনাথ যে হতবাক করে দিয়েছিল, তা জানি। স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি এখনও যে, কাঠমাণ্ডুর উত্তর-পুব কোণ-বরাবর এগিয়ে সেদিন একটা প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময়কে দেখেছিলাম। বিস্ময়টা ধান ও ভূট্টার ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে যেন রাজধানীর সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখতে ব্যস্ত।

স্বাতন্ত্র্য কোথায়? না বোধনাথের পরিবেশে, আকারে, প্রকারে সর্বত্র।

এত বিরাট বৌদ্ধ-স্তূপ আর কোনদিন কোথাও দেখিনি। এত গম্ভীর ধর্মক্ষেত্রও আর চোখে পড়েনি কখনও।

কিন্তু ধার্মিকেরা কোথায় ওখানে? বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কই?

আশ্চর্য! একটিও ভিক্ষু চোখে পড়ল না বোধনাথে।

বোধনাথে আমাদের অভ্যর্থনা করল একরত্তি একটা ছেলে, বুদ্ধি বাহাদুর।

—কে তুমি? কী চাও? অভ্যর্থনার শুরুতেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলাম বুদ্ধিকে।

বুদ্ধি জবাব দিয়েছিল, কুছ্ নঁহী চাহতা সা'ব। মেরা নাম বুদ্ধি বাহাদুর হ্যাঁয়। ম্যঁয় কুছ্ নঁহী চাহতা।

—চাও না তো আমাদের সঙ্গে কেন? বুদ্ধি বাহাদুরের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজি।

কিন্তু বুদ্ধি কোন জবাব দেয় না। ধীরে ধীরে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলে।

আবার শুধোই ওকে, কী চাও তুমি?

—কুছ্ নঁহী সা'ব।

—কোথায় থাক?

—কঁহী নঁহী সা'ব।

—কে কে আছে তোমার?

—কোঈ নঁহী হজুর।

ভাবলাম, মহা বিপদে পড়া গেল যা হোক। এই ছোকরাটা কি তাহলে গাইড্ হতে চায়? চালাকি করে কিছু পয়সা বাগিয়ে নিতে চায় আমাদের কাছ থেকে?

ছোকরা ওদিকে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। বোধনাথ স্তূপকে দেখিয়ে বলতে শুরু করেছে, মান দেব নে বনায়া থা হজুর।

কিন্তু কে এই মান দেব? সেদিন অনেক চেষ্টায়ও বুদ্ধি বাহাদুরের কাছ থেকে তার কোন জবাব পাইনি।

জবাব পেয়েছি আজ। আজ দেখছি, সত্যি উনি ছিলেন। নেপালের সিংহাসনে অদৃষ্টপূর্ব এক মহাশক্তিধরের মতো ছিলেন উনি। শত্রুরা ওঁকে সমীহ করত, মিত্ররা ওঁকে বিশ্বাস করত, পারিষদরা ওঁকে শ্রদ্ধা করত।

কেন করবে না শ্রদ্ধা? বিশ্বাস কেন করবে না? ওঁরই আমলের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে উনি যে সত্যিকারের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। সত্যিকারের বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন যে উনি। ছেলেবেলা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো সাহস যে ওঁর ছিল।

—হ্যাঁ, সত্যি সাহস ছিল ওঁর। শিলালিপি বলছে, সাহস না থাকলে বিদ্রোহী শাসনকর্তার হাত থেকে দেশকে তিনি রক্ষা করতে পারতেন না।

বিদ্রোহী হয়েছিল পূর্ব-প্রদেশের এক শাসনকর্তা। রাজা বালক মাত্র, এই ভেবে বিদ্রোহী তরবারি উঠিয়েছিল মান দেব-এর শির লক্ষ্য করে।

কিন্তু মান দেব এতটুকু বিচলিত হলেন না এতে। বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করবেন বলে সৈন্যদল সহ নিজেই করলেন যুদ্ধযাত্রা।

যুদ্ধে পরাজিত হল শত্রু। তার উদ্ধত তরবারি ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। আর মান দেব যখন জয়ী হয়ে ঘরে ফিরলেন, তখন লক্ষ

লক্ষ প্রজা বালক-রাজাকে সম্বর্ধনা করবে বলে ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে।

মালা অনেক পেয়েছেন মান দেব। সারা জীবন ধরেই পেয়েছেন। গণ্ডক নদীর ওপারে সাম্রাজ্যকে যখন বিস্তৃত করলেন তিনি এবং যখন তাঁরই চেষ্টায় ভারত ও তিব্বতের সঙ্গে নেপালের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠল, তখনও মালার চাপে তিনি প্রায় সমাধিস্থ হতে চলেছিলেন। তখনও অনেকেই বলেছিল, দাও ওঁকে। মালা দাও।

এদিকে মান দেব তো ব্যাপার দেখে অবাক।

—মালা আমাকে কেন? বললেন তিনি, ওগুলো দাও শৈব আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের। সম্বর্ধনা ওঁদেরই হোক।

হল সম্বর্ধনা। রাজ-দরবার সাধু-সজ্জনে ভরে গেল। আর রাজা সমাগত অতিথিদের হাতে মূল্যবান সব উপহার উঠিয়ে দিয়ে বললেন, প্রসন্ন হোন আপনারা। আশীর্বাদ করুন।

আশীর্বাদ সবাই করেছিলেন নিশ্চয়। লোকে বলে, নিশ্চয় সবাই আশীর্বাদ করেছিলেন। তা না হলে রাজার চরিত্র ষোল কলায় বেড়ে-ওঠা চাঁদের মতো অমন স্নিগ্ধ ও সুন্দর হবে কেন? আর কেনই বা গৌরবে ও মহিমায় তিনি ভারত-সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমকক্ষ হয়ে উঠবেন? কেনই বা তিনি গড়বেন অপরূপ বৌদ্ধ-স্তূপ বোধনাথ?

—মান দেব নে বনায়া থা হজুর। বোধনাথকে দেখিয়ে সেদিন বুদ্ধি বাহাদুর বলেছিল।

—কিন্তু কে এই মান দেব? শুধিয়েছিলাম ওকে।

ও এর কোন জবাব দিতে পারেনি। শুধু বলেছিল, ক্যা জানেঁ মালিক!

সত্যিই তো! কে জানে! বোধনাথের দিকে এগোতে এগোতে ভাবি, সত্যিই তো! যে ধর্মপ্রাণ রাজা এই মহাস্তূপ গড়েছেন,

তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত এই পনের-ষোল বছরের কিশোর কী করে জানবে!

তবে কিশোরটি দেখলাম, মান দেবের ঠিকুজী না জানলেও অন্য অনেক কিছুই খুব জানে। বোধনাথের প্রায় সব কিছুই মুখস্থ তার।

বোধনাথ স্তূপের পাদদেশ ধরে যাবার সময় একবার সে বলে ওঠে, ইধার হ্যাঁয় লামা কা কুঠি!

শুধালাম, লামারা থাকে এখানে?

—জী হজুর! উনকা আপনা মহল্লা ইধার হ্যাঁয়।

—ওরা তিব্বত থেকে আসে বোধ করি?

—জী হজুর! তিবেত সে আয়া হ্যাঁয়। ওয়ে হরবখৎ আতে হ্যাঁয়।

বুঝলাম, তিব্বত থেকে প্রায়ই আসে ওরা। কিন্তু আসে যদি তো গেল কোথায় সব? প্রাঙ্গণের চারিদিকে কুঠি চোখে পড়ছে। কিন্তু কুঠিয়াল লামা একটিকেও তো কই দেখছি না!

একবার ভাবি, না দেখলাম! প্রাঙ্গণ আর বোধনাথ স্তূপটিকে তো দেখছি। ওদের দেখেই খুশি আমি।

প্রাঙ্গণটি স্তূপকে মালার মতো ঘিরে আছে। আর প্রাঙ্গণকে ঘিরে আছে কুঠি।

কুঠিগুলোর অধিকাংশই নেপালের কুটির-শিল্পে সুসজ্জিত। কিন্তু সেই সজ্জা দেখার তখন সময় কোথায়? বুদ্ধি বাহাদুর ওদিকে তাড়া দিচ্ছে, হজুর!

তাড়া খেয়ে একবার তাকাই ওর দিকে। শুধোই, কিছু বলছ?

—য়হ্‌ হ্যাঁয়—, আবার শুরু করে সে, বুধ কা সব সে উঁচা মন্দির। বড়ী আজব চীজ হ্যাঁয়!

বুদ্ধের সব চেয়ে উঁচু মহল এটি! সত্যি এ এক অদ্ভুত জিনিস?

বোধনাথের গা বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবি, তা হবে। স্তূপটা অদ্ভুতই বটে! বিলকুল এক আজব চীজ আমার সামনে।

আমার একেবারে সামনেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ-চৈত্য।

চৈত্যটিকে দেখতে ঠিক একটা গোলাধের মতন।

গোলার্ধটি শ্বেতশুভ্র। জ্ঞানের দেবতা বোধনাথের 'গর্ভ'গৃহ বলেই এত শুভ্র হয়তো। আটকোণী এক সমতলক্ষেত্রের ওপর এই 'গর্ভ'গৃহটি গড়ে উঠেছে।

আটকোণী ক্ষেত্রটিকে ঘিরে দেওয়াল আছে একটি; আর সেই দেওয়ালটির গায়ে আছে প্রায় আশিটি কুলুঙ্গি বা কোটর। প্রতিটি কুলুঙ্গিতে বুদ্ধমূর্তি আছে একটি করে।

কিন্তু বুদ্ধমূর্তি নয়, 'গর্ভ'গৃহ নয়, বোধনাথের সবচেয়ে বড় বিস্ময় তার 'চূড়ামণি'—অর্থাৎ, পিড়ামিডের ঢঙ্-এ উঁচু হয়ে-ওঠা তার শীর্ষদেশ।

পিরামিডটি উঠল গোলার্ধের চূড়া থেকে; চূড়াকে ঘিরে আছে যে বর্গাকার ভূমিদেশ, ঠিক সেইখান থেকে।

পিরামিডের গায়ে গায়ে অনেক সোনার ঝলকানি। তাকে ঘিরে রেখেছে তেরোটি সোনার বলয়। তাই ঝলকানি এত।

সোনার ওই বলয়গুলো পিরামিডের চূড়ার দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেল; এবং তারপর চূড়ার খুব কাছাকাছি এসে একটি অতি সুন্দর ছত্রকে ধারণ করল যেন।

ছত্রটি মসৃণ সব ধাতু দিয়ে গড়া। কিন্তু কী ধাতু, তা ঠিক জানি নে।

—জানি কতটুকু আর? বার বার মনে হল সেদিন। মনে হল, এই যে পিরামিডের বর্গাকার ভূমিদেশটির ঠিক ওপরেই চারিদিকে চার জোড়া বুদ্ধ-চক্ষু উন্মীলিত, এরই কি মানে জানি?

বুদ্ধি বাহাদুর অবিশ্যি বলেছিল, বুধ্ কী আঁখ হ্যাঁয় ওহ্। ওহ্ হ্যাঁয় দেউতা কী লীলা।

—বুদ্ধ-দেবতা লীলা করছেন অমন করে চোখ মেলে?

—জী হজুর। দেউতা সব কুছ দেখতা হ্যাঁয়। দুনিয়াকী হালত সমঝনা চাহ্‌তা হ্যাঁয়।

বুঝলাম, দেবতা দেখেন সব কিছু। দুনিয়ার হালত বুঝতে চান।

—কিন্তু ভাই বুদ্ধি। আমার খুদে গাইড্‌টিকে শুধিয়েছিলাম একবার, তোমার হালত এমন কেন? তোমার এই জীর্ণ-জীর্ণ বেশ দেখে দেবতা তো খুশি হবেন না! বরং দুঃখ পাবেন মনে মনে।

—দুখ্‌ত মেরে দিল মেঁ হ্যাঁয় হজুর! বুদ্ধি আমার কথার বাঁকা জবাব দিল; মুখ নিচু করে এগিয়ে চলল চুপচাপ।

খানিক দূর এগিয়ে হঠাৎ মুখ তুলল সে। ডাকল, হজুর!

বললাম, কী?

—মেরা কোঈ নঁহী, ওহ্‌ তো আপকো বাত্‌লা দিয়া।

বললাম, ঠিক ঠিক। তোমার কেউ নেই, তা তুমি আগেই বলেছ বটে। কিন্তু সব গেল কোথায়?

বুদ্ধি ওপরের দিকে আঙুল তুলে জবাব দিল, আকাশ মেঁ।

—কিন্তু সবাই একসঙ্গে জোট বেঁধে চলে গেল যে বড়? শুধালাম আমি।

বুদ্ধি আমার এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

সেই জবাবটির বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়—

বুদ্ধির বাবা বীরবাহাদুর বোধনাথ স্তূপ রঙ্‌ করার সময় পা হড়্‌কে পড়ে মারা যায়।

স্তূপের কর্তৃপক্ষ সান্ত্বনা দেন, চিরকালের মতো সঙ্ঘকে পেয়ে গিয়েছে ও। ওর আর জন্ম হবে না।

কথা শুনে বুদ্ধির মা বাগমতী আকাশ থেকে পড়ে, ও মা! এ কি কথা! ওর না হয় জন্ম হবে না। কিন্তু যাদের জন্ম হয়েছে, তারা বাঁচবে কী করে? আমাদের কী উপায় হবে?

দু' একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পরামর্শ দেন, উপায় একটা হবেই। বুদ্ধকে স্মরণ করো, ঠিক উপায় হবে।

—কিন্তু স্মরণ তো দিনরাত করছি। কিছুই যে হচ্ছে না তবু! বাগমতী আর্তনাদ করে ওঠে।

—হবে, ঠিক হবে। সময় হলেই হবে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সান্ত্বনা দেন আবার।

কিন্তু সময় আর হয় না। বোধনাথ স্তূপের চুনকাম শেষ হয়ে যায়। ভক্তরা আসে দলে দলে। অথচ বাগমতীর অভাব আর ঘোচে না। কেউ একবার জানতেও চায় না, তিন-তিনটি শিশুকে নিয়ে ওর সংসার চলছে কী করে। শিশুরা ওদিকে কান্নাকাটি করে। বলে, খেতে দাও।

বাগমতী বলে, বুদ্ধকে ডাকো বাবা। খেতে উনিই দেবেন।

কিন্তু কোথায় উনি?

ওনাকে ডাকতে গিয়ে দশ বছরের ছেলে বুদ্ধি বাহাদুর চোখে অন্ধকার দেখে। ছোট দুটি বোন নাগমতী আর বিষ্ণুমতীকে নিয়ে হাহাকার করে।

অবশেষে শুভাকাঙ্ক্ষীরা বুদ্ধিকে পরামর্শ দেন, এক কাজ কর। খুম্‌জুঙ্‌-এ চাচার বাড়িতে থাক গিয়ে। সুখে থাকবে।

এই খুম্‌জুঙ্‌ জায়গাটা দারুণ দুর্গম। কাঠমাণ্ডু থেকে ১৫০ মাইল দূরে পায়ে-হাঁটা পথে নাম্‌চেবাজার। ওই নাম্‌চে থেকে থিয়ান্‌বোচে ও দুধ-কুশী উপত্যকা হয়ে ওখানে যেতে হয়।

নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত খুম্‌জুঙ্‌-এর দিকেই পা বাড়ায় ওরা। এক শীতের শুরুতে দুধ-কুশী পেরিয়ে খুম্বু-উপত্যকার দিকে রওনা হয়।

কিন্তু গন্তব্যস্থলে ওরা কিছুতেই যেতে পারে না। পথে সর্বনাশা এক তুষার-ঝড় হঠাৎ ওদের ঘিরে ধরে।

এদিকে দীর্ঘদিন না খেতে পেয়ে দুর্বল ছিল সবাই। কাজেই, সবাই একে একে সেই জনমানবহীন খুম্বু-উপত্যাকায় মুখ থুবড়ে পড়ে সঙ্ঘের শরণ নিল।

বেঁচে রইল শুধু বুদ্ধি বাহাদুর। কিন্তু সে খুম্‌জুঙ্‌-এ আর গেল না। থিয়ানবোচের বৌদ্ধ-বিহারে কিছুদিন থেকে আবার

কাঠমাণ্ডুতেই ফিরে এল। আবার অপরূপ বৌদ্ধ-স্তূপ বোধনাথের দিকে তাকিয়ে ভাবল, চিরকালের মতো সঙ্ঘকে পেয়ে গিয়েছে ওর বাবা।

কিন্তু সঙ্ঘকে এত সহজে পাওয়া যায় কি? বুদ্ধি বাহাদুর ভাবে।

—ইত্‌নি জলদি মিল যাতা হৈ? আমাকে শুধায় সে।

আমি বলি, জানি নে।

—জানি নে, সেদিন বোধনাথ স্তূপ দেখে ফিরে আসার সময় বুদ্ধি বাহাদুরকে এই আমি শেষকথা বলেছিলাম। ওর হাতে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক গুঁজে দিয়ে কথাটা বলেছিলাম।

কিন্তু বুদ্ধি বাহাদুর কিছুতেই আমাদের ছাড়তে চায় না। বলে, কশ্যপ বুধ্‌ কী কহানী শুনো সা'ব। বোধনাথ মেঁ দেউতা কী কুঠি দেখো।

আমাদের এক সহযাত্রী বলেন, জানি। কাশ্যপ বুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ আছে বোধনাথে। কিন্তু সেই অবশেষের সবটুকুরই তো জন্ম প্রবাদ থেকে।

বুদ্ধি বাহাদুর আপত্তি করে, নহী সা'ব। বিলকুল সাচ্‌ হ্যাঁয়।

সহযাত্রীটি বাধা দেন, সাচ্‌ তুমি নিজে। আর সাচ্‌ সব হারিয়ে তোমার এই বসে-থাকা।

আজ ভাবি, বুদ্ধি বাহাদুর এখনও হয়তো ঠিক বসে আছে। ঠিক বোধনাথ স্তূপের দিকে তাকিয়ে এখনও সে ভাবছে, চিরকালের মতো সঙ্ঘকে পেয়ে গিয়েছে ওর বাবা।

কিন্তু কোথায় সঙ্ঘ, আর কোথায় স্তূপ। বোধনাথের কথা ভাবলে আমাদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা বুদ্ধি বাহাদুরকে দেখতে পাই আজ। আর দেখতে পাই

অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় রাঙিয়ে ওঠা স্তূপটিকে। স্তূপটি রাঙিয়ে উঠল; আর দেখতে দেখতে বীর বাহাদুর নামে এক হতভাগ্যের রক্ত ছড়িয়ে পড়ল তার পাদপীঠে।

রক্ত আরও যে কত ছড়িয়েছে কাঠমাণ্ডুর পথে পথে!

নরদেবীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কয়ালবাবু একদিন বললেন, ঠিক এখানেই একদিন কত যে ছড়িয়েছে রক্ত!

শুধালাম, এখানেই? এই মন্দিরের সামনেই?

কয়ালবাবু জবাব দিলেন, তা সামনেই একরকম বলতে পারেন। কারণ, এই মন্দিরের ভেতরে যখন নরবলি হ'ত, তখন রক্তের স্রোত এসে পৌঁছুত একেবারে এই রাস্তা অবধি।

কয়ালবাবুর কথা শুনে অবাক হই। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকাই নরদেবী-মন্দিরটির দিকে।

—সত্যি নরবলি হ'ত এখানে? ওঁকে শুধাই একবার।

উনি জবাব দেন, হ'ত মানে! নিয়মিত হ'ত। মানুষের রক্ত ছাড়া এ-মন্দিরের দেবীর পুজো হ'ত না একসময়।

কয়ালবাবুর কথা শুনে রহস্যময় মন্দিরটির দিকে তাকাই আবার। চোখে পড়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক দেব-দেউল।

দেউলটি প্যাগোডার ঢঙ্-এ গড়া। তার একতলার বারান্দায় কয়েকজন ভক্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে।

—কী বলছে ওরা? কয়ালবাবুকে শুধাই।

—ওরা বলছে, কয়ালবাবু বুঝিয়ে দেন, মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসে নরদেবীকে দর্শন করো!

শেষ অবধি করলাম দর্শন। কিন্তু সব কেমন যেন রক্তাক্ত হয়ে গেল। বার বার মনে হল, প্রাঙ্গণ ও দেবীর পাদভূমি থেকে তাজা রক্তের গন্ধ ভেসে আসছে। লাল রঙের অতি মূল্যবান একটা পদার্থ চারিদিক থেকে ছুটে আসছে আমার দিকে।

—এখানে আর নয়! অন্য কোথাও চলুন! কয়ালবাবুকে অনুরোধ জানাই সকাতরে।

কিন্তু কয়ালবাবু তখন অন্য এক যুগে চলে গেছেন। যে যুগে কথায় কথায় মানুষের গর্দান যায়, কথায় কথায় সতীদাহ হয়, সেই যুগে চলে গেছেন।

—জানেন? আবার শুরু করেন উনি, একসময়ে সতীদাহও হ'ত এখানে। বেশ জাঁক-জমক করেই হ'ত।

—বলেন কী! এই মন্দিরের ভেতরে হ'ত সতীদাহ? কয়ালবাবুর কথা শুনে স্তম্ভিত হই আমি।

—না না, মন্দিরের ভেতরে হবে কেন? কয়ালবাবু তাঁর বক্তব্যকে খোলসা করেন এবার। চোখ দুটিকে বিস্ফারিত করে বলেন, সতীদাহ হ'ত শ্মশানে। আর এখানে সতীকে নরদেবীর কাছে উৎসর্গ করা হ'ত। বলতে কী, সতীদাহ এই সেদিনও চালু ছিল নেপালে।

—সেদিন বলতে কি আমাদের ভারতবর্ষের সেদিন? সেই রামমোহন রায়ের আমল?

—আরে দূর মশাই! রামমোহন রায়! উনি তো উনবিংশ শতাব্দীর লোক! নেপালে সতীদাহ প্রথা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও চালু ছিল।

—তৃতীয় দশক যদি হয় তো, বছর চল্লিশেক আগেও সতীদাহ হ'ত এখানে?

—তা হ'ত। কারণ, নেপালের 'রামমোহন রায়' চন্দ্র সামশের জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের রামমোহন-এর প্রায় এক শো বছর পরে।

—চন্দ্র সামশেরকে সেলাম! নরদেবী-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় কয়ালবাবু বলেছিলেন, হাজার সেলাম ওঁকে!

মূলতঃ ওঁরই চেষ্টায় নেপালে দাসপ্রথা এবং সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছে।

বললাম, কিন্তু কুমারী-পূজার প্রথা নাকি চালু আছে এখনও?

কয়ালবাবু বললেন, তা আছে। এবং কুমারী দেবীর মন্দিরে আজও ধুমধাম সহকারে সে পূজা হয়।

—কুমারী-মন্দিরটি কোথায়?

—খুব কাছেই। আধ মাইলও হবে না এখান থেকে। যাবেন?

—চলুন!

এবার এগিয়ে চলি কুমারী-মন্দিরের দিকে। নরদেবী-মন্দির থেকে বেরিয়ে-যাওয়া রাস্তাটি ধরে সোজা উত্তর দিকে এগোই।

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। আলো জ্বলছে কাঠমাণ্ডুর পথে পথে। কিন্তু আমরা যেন আলো থেকে অন্ধকারের দিকে অভিসার করি। আদিম নেপালের মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি স্মৃতি এখনও অবশিষ্ট আছে, তাদেরই একটিকে দেখব বলে ব্যাকুল হই।

দেখতে দেখতে কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন দরবার হনুমান-ঢোকা পৌঁছি আমরা এবং দরবার-এলাকার খুব কাছেই আমাদের চোখে পড়ে কুমারী দেবীর মন্দির।

মন্দিরটি প্যাগোডার ধরনে গড়া। কিন্তু অন্যসব প্যাগোডা-মন্দিরের সঙ্গে এর একটু পার্থক্য আছে। একে দেখলে মন্দির যতটা মনে হয়, তার চেয়ে বেশি মনে হয় বাসস্থান।

এ-মন্দির বাসস্থানই বটে। কুমারী দেবীর বাসস্থান। তাই একে খুব সুন্দর করে গড়া হয়েছে। এর দরজা এবং জানালাকে কারুকার্যখচিত করার সময় কার্পণ্য করা হয়নি এতটুকু।

—কার্পণ্য কেন করা হবে? কয়ালবাবু বলেছিলেন, কেন করা হবে কার্পণ্য? সংস্কার যদি মানুষকে দিশাহারা করে তো চোখ বন্ধ করে টাকা ঢালতে কেন সে পিছ-পা হবে?

বললাম, এর মানে ?

কয়ালবাবু বললেন, মানে হল এই যে, অদ্ভুত এক কিংবদন্তী আছে এই মন্দির-গড়ার পেছনে এবং যুগ যুগ ধরে মানুষ এই কিংবদন্তীকেই আঁকড়ে ধরে আছে।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ, কুমারী দেবী হচ্ছেন কালী। অর্থাৎ, আজ থেকে কয়েক শো বছর আগেকার একটা কাহিনী। অর্থাৎ, নেপালের এক রাজা এক কুমারী মেয়েকে নির্বাসন দিলেন। রাজা নির্বোধ। তিনি জানতেন না যে, এই মেয়েটির মধ্যেই আছেন দেবী কুমারী, আছেন সর্বমঙ্গলা আর মহাভৈরবী দেবী কালী। তাই নির্বুদ্ধিতার শাস্তি অচিরেই তাঁকে পেতে হল। হঠাৎ তাঁর রাণী দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাজার ভাবনা ধরল এবার। মনে হল, মেয়েটিকে নির্বাসন দেবার ফলেই ঠিক এমনটি হয়নি তো ?

ওদিকে পাত্র-মিত্ররা বলে উঠলেন, সম্রাট, পেয়েছি! ওই নির্বাসিতা মেয়েটির মধ্যেই সাক্ষাৎ কালীকে খুঁজে পেয়েছি আমরা। ওকে ঘরে ফিরিয়ে আনুন।

সম্রাট বললেন, ফিরিয়ে আনতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু একটা কথা, ফিরিয়ে এনে ওঁকে রাখব কোথায়? যিনি সাক্ষাৎ ভগবতী, তাঁকে কোন্ আক্কেলে আবার তাঁর পুরনো ঘরে ফিরিয়ে দেব ?

পাত্র-মিত্ররা পরামর্শ দিলেন, ফিরিয়ে আর দেবেন না সম্রাট। আলাদা একটা মন্দির গড়ে ওঁকে রাখবেন।

সম্রাট বললেন, বেশ! মন্দির গড়া হোক তবে! এবং সে-মন্দিরের নাম দেওয়া হোক কুমারী দেবীর মন্দির।

এই ঘটনার পর দেখতে দেখতে মন্দির গড়ে উঠল এবং ওই নির্বাসিতা মেয়েটিকে পূজা করতে করতে নিয়ে আসা হল ওই মন্দিরে।

চোখে দেখবে দেবী কুমারীকে। উৎসবের তৃতীয় দিনে রথে করে নগর-পরিক্রমায় বেরোবেন তিনি। তাঁর রথের সঙ্গে আরও দুটি রথ থাকবে। ওদের একটিতে থাকবেন সিদ্ধিদাতা গণেশ আর অপরটিতে থাকবেন বিনাশের দেবতা ভৈরব। দুটি ছেলেকে গণেশ ও ভৈরব সাজানো হবে।

কিন্তু যে যতই সাজুক না কেন, শুনেছি, ইন্দ্রযাত্রার সময় কুমারী দেবীর সাজ অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। দেবী তিন দিন ধরে ভক্ত-পরিবৃতা হয়ে কাঠমাণ্ডুর পথে পথে ঘুরে বেড়ান। ভক্তদের মধ্যে থাকেন এমনকি রাজাও।

—কিন্তু রাজা কি শুধু ভক্ত? মন্তব্য করে কেউ কেউ, ভগবান নন? বিষ্ণুর অবতার নন তিনি?

—হ্যাঁ, তিনিই তো বিষ্ণু। প্রজারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে, তিনিই তো ভগবান। তাঁকে প্রণাম কর।

অতএব, রাজাকে প্রণাম করে সবাই। কবে কোন্ শুভলগ্নে রাজাধিরাজ পৃথ্বীনারায়ণ শা নেপালকে পরিপূর্ণ একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে রাজাকেও সবাই প্রণাম করে।

—কিন্তু তবু, মনে থাকে যেন, সব প্রণাম শেষ অবধি কুমারী দেবীর পায়ে গিয়ে পৌঁছুন চাই, দেবীকে খুশি করা চাই!—পুরোহিতরা সাবধান করে দেন মাঝে মাঝে।

—খুশি তিনি হবেনই! সাবধানীরা কেউ বা নাচতে নাচতে, আবার কেউ বা নাচ দেখতে দেখতে জবাব দেন। তিনি খুশি হবেনই! নারায়ণ-মন্দিরে এত নাচ কিছুতেই ব্যর্থ হবে না।

সত্যি নাচ চলে নারায়ণ-মন্দিরে। কুমারী-মন্দিরের ঠিক সামনেই নাচের আসর তখন জমাট হয়ে ওঠে। মহালক্ষ্মীর নাচ নাচে কেউ, কেউ মহাকালী সেজে নাচতে শুরু করে। কেউ আবার দশ অবতারের একটি সেজে নাচের আসর সরগরম করে তোলে।

কিন্তু সব নাচকে ছাড়িয়ে যায় ভৈরব। যতক্ষণ অবধি না মোষ

বলি হচ্ছে, ততক্ষণ নাচন তার কিছুতেই বন্ধ হয় না। কয়ালবাবু বলেছিলেন, এই ভৈরব-নাচ দেখতে দেখতে একদিন তিনি নাকি সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে গিন্নীর কাছে নাকি অম্ল-মধুর লাঞ্ছনা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

—কিন্তু লাঞ্ছনা আজকেই কি কম হচ্ছে? এই যে কুমারী দেবীর এত কাছে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ ভিড়ের জন্যে দেখতে পাচ্ছি না তাঁকে, এ কি লাঞ্ছনা নয়? বলেছিলাম কয়ালবাবুকে।

সেদিন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভিড় পাত্‌লা হল কিছুটা; এবং তারপর কুমারী দেবীর দর্শন মিলল। কুমারীটিকে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হলাম।

দেখলাম, দশ-এগারো বছরের একটি মেয়েকে দেবী সাজানো হয়েছে। তার পরনে টকটকে লাল রঙের পোশাক। লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা তার। ভুরু-জোড়া রাঙানো সিঁদুর দিয়ে। সেই সিঁদুরের এখানে-সেখানে চুম্‌কি। এছাড়া তার চোখে কাজল, কপালে টিক্‌লি এবং চারিদিকে বিচিত্র সব উপহার।

মেয়েটিকে ঘিরে দু' তিনজন প্রৌঢ়া বসে আছেন। উপহার-গুলোকে সানন্দে সাজিয়ে রাখছেন ওরা।

কিন্তু মেয়েটিকে আনন্দিত মনে হল না মোটেই। বরং মনে হল, ভিড় দেখে সে খুব বিরক্ত। বদ্ধ একটা জায়গায় বসে থেকে থেকে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। অতএব, উপহার নয়, অর্চনা নয়, আর দশটা ছোট ছোট মেয়ের মতো সে যদি একটা খোলা জায়গায় খেলবার সুযোগ পেত, তবে এই মুহূর্তে নিশ্চয় হাসি ফুটে উঠত তার মুখে।

কিন্তু না, কয়ালবাবুর কাছ থেকে শুনেছি, যখন-তখন নাকি হাসলে চলে না তাকে। দেবীর গাম্ভীর্য তাকে নাকি বজায় রাখতেই হয়।

মোটামুটি একটা গাম্ভীর্য এতক্ষণ ধরে বেশ বজায় রাখছিল

কুমারী দেবী। এমন সময় হঠাৎ কী যে হল,—একটি মেয়ে তাকে প্রণাম করতে গিয়ে হোঁচট খেল; আর সঙ্গে সঙ্গেই কুমারী দেবী ফিক্ করে হেসে ফেলল।

দেবী-সমাজ এই ধরনের চপল হাসিকে বরদাস্ত করেন কিনা জানি না; তবে ঠিক সেই মুহূর্তে হাসিটা খুবই ভালো লাগল আমার। মনে হল, অভয় পেয়েছি। অতএব দেবীর সঙ্গে একটু কথা বলা যাক!

— কী নাম তোমার? কুমারী দেবীকে হঠাৎ শুধালাম।

দেবী মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেল। আর আমাকে একরকম তেড়ে এলেন দেবীর পার্শ্ববর্তী দু' তিনটি প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়াদের একজন তো উঠে দাঁড়িয়ে রীতিমতো ধমকে দিলেন। বললেন, থামস! দেবী কা সামনা মেঁ চিল্লাতা কিউঁ?

আমি এই গর্হিত কাজের জন্যে করজোড়ে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম; এবং তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম কুমারী-মন্দির থেকে।

ততক্ষণে ভিড় অনেকটা কমে এসেছে; আর হনুমান-ঢোকার সামনেকার দোকানগুলো বন্ধ হতে শুরু করেছে একে একে।

কাঠমাণ্ডুতে থাকতে প্রায়ই হ'ত এমন। দুপুরবেলা ঘরে ফিরতে ফিরতে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলান দিত। আর রাত্তিরে ফিরতে ফিরতে শহরের বেশির ভাগ দোকান যেত বন্ধ হয়ে।

কাঠমাণ্ডুর দোকানগুলো বড় বিচিত্র। ওখানে পানের দোকানে ফাউন্টেন পেন পাওয়া যায়। আবার পেট্রোল পাম্পে পাওয়া যায় ট্র্যান্‌জিস্টার রেডিও। এছাড়া মুদীর দোকানে মূল্যবান টেরিলিন, জুতোর দোকানে জাপানী ক্যামেরা এবং স্টেশনারী দোকানে সুইডিশ ঘড়ি হামেশাই পাওয়া যায় ওখানে।

একদিন আমাদের বন্ধু প্রদীপ চৌধুরী একটি কাপড়ের দোকান

থেকে রেডিও কিনলেন ; আর আমি জাপানী ছাতা কিনলাম মুদী-দোকান থেকে।

আর একদিন দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখি, ব্লেড নেই।

প্রদীপবাবু বললেন, ব্লেড আমার কাছেও নেই। চলুন, নিয়ে আসি।

বললাম, চলুন!

ব্লেড আনতে বেরিয়ে পড়লাম তখুনি। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না। ছত্রপটিতে আমাদের আস্তানাটির কাছেই ছিল যে পেট্রোল-পাম্প্, সেখানে স্টেইন্‌লেস্-স্টীল্-এর খুব ভালো ব্লেড পেয়ে গেলাম।

পাম্প্-এর কর্মচারীটি শুধুমাত্র ব্লেড বিক্রী করেই খুশি নন। খদ্দেরকে আরও কিছু জিনিস গছিয়ে দিতে চান তিনি। চীনা কলম, রাশিয়ান নাইলন এবং জাপানী টেরিলিন তাঁর ভাণ্ডারে প্রচুর মজুত আছে।

এই সুযোগে সেই মজুত-ভাণ্ডার থেকে একগোছা চীনা কলম বের করেন তিনি। আমাদের সামনে সেগুলো মেলে ধরে বলেন, লিজিয়ে!

প্রদীপবাবু বলেন, এখন দরকার হবে না। দরকার হলে পরে জানাব।

কর্মচারীটি এবার রাশিয়ান নাইলন বের করেন।

আমি বলি, ওটাও এখন থাক।

জাপানী টেরিলিন আসে এরপর।

—ওটাও থাক। বলতে বলতে আমি আর প্রদীপবাবু বেরিয়ে পড়ি দোকান থেকে।

ছয়

কিন্তু কাঠমাণ্ডুর কথা লিখতে বসে দোকানের গল্প কী আর বলব! কী আর বলব পসরার কাহিনী! ওখানকার আসল পসরা তো ইতিহাস। মঠ-মন্দির আর প্রাসাদ-প্যাগোডার মধ্যে ছড়িয়ে-থাকা আশ্চর্য সব ইতিহাস।

স্বয়ম্ভুনাথ আর বোধনাথের ইতিহাস। ইতিহাস পশুপতিনাথ আর গুহ্যেশ্বরীতে;—হনুমান-ঢোকা বা দরবার-এলাকাতে।

দরবার-এলাকাটিকে দেখতে পাই আজও। আজও স্পষ্ট চোখে পড়ে, কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন রাজপ্রাসাদ অপরূপ কয়েকটা প্যাগোডাকে প্রতিবেশী করে মূর্তিমান একটা বিস্ময়ের মতো দাঁড়িয়ে।

প্রাসাদটির দু'পাশে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, বাজার বসে গেছে ওখানে; আর চারিপাশে অদ্ভুত সব প্যাগোডা, আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছে ওরা।

প্রাসাদের গা ছুঁয়ে আছে রাজপথ। আর রাজপথকে ছুঁয়ে আছে আজকের নেপাল, একালের কাঠমাণ্ডু।

হ্যাঁ, একাল আর সেকাল মুখোমুখি দরবার-এলাকাতে। অতীত আর বর্তমান পাশাপাশি।

তবে অতীতেরই জয়জয়কার যেন। যে অতীত চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে, যে হাজারবার মাথা কুটলেও আর ফিরে আসে না, সে যেন না চাইতেই ওখানে ফিরে এসেছে। ওখানকার রাজ-প্রাসাদ, ওখানকার তেলেজু-মন্দির—সব যেন ওই ফিরে-আসাদের প্রতিনিধি। ওদের সবাকার ভেতর থেকেই যেন মুছে-যাওয়া অতীত-কাহিনী ক্ষণে ক্ষণে গুঞ্জরিত হচ্ছে।

তেলেজু-মন্দির রাজপ্রাসাদের ঠিক সামনেই। কেউ যদি

প্রাসাদ-এলাকায় যান, তো সকলের আগে তাঁর চোখে পড়বে এই মন্দিরটি।

কেন চোখে পড়বে? না, আশেপাশের অন্য সব মন্দিরের চেয়ে তেলেজুর ভিত্ অনেকটা উঁচুতে বলে। তেলেজুর তিন-ছাদওয়ালা প্যাগোডাটি অন্য সব মন্দিরকে ছাড়িয়ে গেছে বলে। রাজপ্রাসাদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তেলেজু তার মহিমাকে একক ও স্বতন্ত্র করে তুলেছে বলে।

স্বাতন্ত্র্যময় ওই মন্দিরটিতে নেপাল-রাজবংশের কুলদেবতা তেলেজু-ভবানীর অধিষ্ঠান। ভবানীকে ওখানে অধিষ্ঠিত করান নেপালেরই এক কৃতী রাজা মহেন্দ্র মল্ল। আজ থেকে ৪১৯ বছর আগে, ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওই মন্দির গড়েন তিনি।

আর শুধু মন্দির কেন, গড়েন তিনি অনেক কিছুই: রাজ্যকে নতুন করে গড়েন, নিজের নামাঙ্কিত নতুন মুদ্রা গড়েন এবং এছাড়া কাঠমাণ্ডু শহরকেও গড়েন নতুন করে।

—কিন্তু কোন শহরে উঁচু বাড়ি না থাকলে কি সে শহর রাজধানী হয় কখনও? রাজা পাত্র-মিত্রদের শুধান এক-একবার।

পাত্র-মিত্ররা জবাব দেন, না সম্রাট, হয় না। শহর যদি উঁচু হয়ে আকাশের দিকে হাতই না বাড়াল, তো হাজার বড় হলেও সে শহর রাজধানী হল না।

সম্রাট মহেন্দ্র মল্ল ভাবনায় পড়েন এইবার। জানতে চান, উঁচু বাড়ি আমাদের এই রাজধানীতে নেই কেন?

—নেই, জবাব দেন সবাই, নেই তার কারণ, উঁচু বাড়ি বানাবার হুকুম তো রাজ-দরবার থেকে মেলে না!

—মেলে না?

—না সম্রাট, মেলে না। উঁচু বাড়ির কথা উঠলেই এখানে বলা হয়, ওহে! বাড়িটাকে খাটো করে গড়ো। তা না হলে বাড়ির উঁচু গর্দানের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও গর্দান যাবে।

কথা শুনে আকাশ থেকে পড়েন মহেন্দ্র মল্ল। বলেন, তা-ই বলা হয় বুঝি?

পাত্র-মিত্ররা জানান, হ্যাঁ সম্রাট। তা-ই বলা হয়। অন্তত এতদিন তা-ই বলা হ'ত।

সম্রাট অভয় দেন, এইবার থেকে আর বলা হবে না। যে যত খুশি উঁচু বাড়ি গড়বে এইবার থেকে। গর্দান যাবার ভয় আর থাকবে না।

সেই থেকে উঁচু বড়ি গড়ার ধুম লাগল কাঠমাণ্ডুতে। দোতলা, তিনতলা এবং এমনকি চার-পাঁচতলা বাড়িও অনেকে গড়ে তুলল।

পাত্র-মিত্ররা মাথায় হাত দিলেন আবার। নালিশ করে বললেন, সম্রাট!

মহেন্দ্র মল্ল বিরক্ত, আবার কী হল?

—তেলেজু-ভবানীর মন্দিরটি মানানসই না হলে আর যে মান থাকে না সম্রাট! মানুষ যে দেবতাকে ছাড়িয়ে যায় তবে!

সম্রাট বললেন, বেশ তো! ভবানীর মন্দিরটি মানানসই করেই গড়ো।

গড়া হল মন্দির; এবং সে-মন্দির যে দেখল, সে-ই বলল, না না, মানুষ নয়। দেবতাই সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন।

—ঠিক ঠিক! দেবতাই ছাড়িয়ে গেছেন। তেলেজু-মন্দিরকে দেখে বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের দর্শক আমি ভাবি। আমারও মনে হয়, মহেন্দ্র মল্লর স্বপ্নকে বুকে নিয়ে এই মন্দির অনেককেই যেন ছাড়িয়ে যাবার অনুধ্যান করছে।

সুন্দর এক মন্দির এই তেলেজু। এর ছাদগুলো পিতল দিয়ে মোড়ানো; আর চূড়া মোড়ানো সোনা দিয়ে।

তেলেজুর ছাদ আর চূড়া ঝকমক করে থেকে থেকে; শতাব্দী-সঞ্চিত ঐশ্বর্যকে থেকে থেকে মেলে ধরে।

ছাদের কিনারাগুলো থেকে ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলছে। সামান্য

হাওয়া লাগলেই দোলা শুরু করে ওরা ; টুং-টাং শব্দ তুলে বাজতে থাকে।

ওরা বাজে একদিকে। আর অপরদিকে ব্রোঞ্জ ও কাঠের ওপর খোদাই করা তেলেজুর অপরূপ কারুকার্যগুলো চকমকায়।

সেদিন সেই চকমকানি দেখি। তেলেজুর ঘণ্টাধ্বনি শুনি স্তব্ধ বিস্ময়ে। ভাবি, ঘণ্টা শুনতে শুনতে হারিয়ে-যাওয়া একটা অদ্ভুত যুগে ফিরে গেছি ; যে যুগে তন্ত্র-সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল নেপাল, ফিরে গেছি সেই যুগে।·······

দেখতে দেখতে রক্তাম্বরধারী জটাজুট-বিলম্বিত ভীষণ-কঠিন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা এলেন। তেলেজুর সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলেন ওঁরা।

মন্দির দেখে ওঁরা সবাই খুশি। কারণ, এ মন্দির তো তান্ত্রিক যন্ত্রেরই প্রতিমূর্তি। এখানে সাধনা করলেই তো কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হবে, সহস্রার হবে নব নব শক্তিমন্ত্রে উদ্বোধিত।

—শক্তিমন্ত্রের উদ্বোধন সে-যুগে হামেশাই হ'ত এখানে। তেলেজু-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কয়ালবাবু বলেন।

প্রদীপবাবুর ছোট ভাই দিলীপও যোগ দেয় তাঁর সঙ্গে। বলে, হ্যাঁ, উদ্বোধন হ'ত। সন্ন্যাসীরা আসতেন দূর-দূরান্তর থেকে।

কিন্তু এলে কী হবে! আজ দেখছি, এই তেলেজুকে নিয়ে ছেলেখেলাও বড় কম হয়নি। নেপালের ইতিহাস বড় কম দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি একে নিয়ে।

ইতিহাসে পাই, একবার এক খেয়ালী সম্রাট তেলেজু-ভবানীকে খেলার পুতুলের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো করেছিলেন।

সম্রাটের নাম রাণা বাহাদুর শা। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি।

কিন্তু সিংহাসনে তাঁর মন বসে না ; মন পড়ে থাকে অন্তঃপুরে। সেখানে তাঁর দুই রাণী প্রিয়-সমাগমের প্রতীক্ষা করছেন।

ড্রেইন-পাইপ হিপ্পি-স্বামীটিও পরেছেন। কিন্তু তার পাইপ জায়গায় জায়গায় ফাটা।

ফাটা মনে হল হিপ্পি-বধূটির উলের জামাও। তবে সেখানে তিনি সযত্নে তাপ্পি লাগিয়েছেন।

কিন্তু কেন এই তাপ্পি? আর কেনই বা ফাটা ড্রেইন-পাইপ? যারা টাকা খরচ করে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে আসতে পারে, যারা মুভি-ক্যামেরাকে চালু রাখার জন্যে পয়সা ঢালতে পারে জলের মতো, তাদের কপালে সামান্য একটু জামা-কাপড়ও জোটে না? তেলেজু-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবি।

ওদিকে হিপ্পি-দম্পতিটি ছবি তুলতে তুলতে আমাদের আরও কাছে এগোন। এগোতেই ওদের পায়ের দিকে চোখ পড়ে আমার। অবাক হয়ে আমি দেখি, ওদের জুতোও শতছিন্ন!

—জুতো কেনবারও পয়সা জোটে না ওদের? দিলীপের দিকে তাকিয়ে বলি একবার।

দিলীপ জানায়, জোটে। তবে দারিদ্র্যটা ওদের কাছে বিলাসিতা বলে সে পয়সা ওরা জুতো বা জামার জন্যে খরচ করে না।

ভাবি, তা হবে। ওদের সম্পর্কে আগেও শুনেছি এইরকম। শুনেছি, আমেরিকা ওদের জন্মক্ষেত্র; আর তীর্থক্ষেত্র নাকি নেপাল।

শুনেছি, ঐশ্বর্যের অত্যাচারে ওরা নাকি হাঁপিয়ে উঠেছে। না-চাইতেই হাতের কাছে সব কিছু পেয়ে পেয়ে জীবনে নাকি বিতৃষ্ণা এসে গেছে ওদের। ঐশ্বর্য এবং আরামের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। তাই ওরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে এখন; যাযাবর জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছে।

—কিন্তু যাযাবর হলেই কি দারিদ্র্যকে নিয়ে পুতুল খেলতে হবে? দিলীপকে শুধাই।

দিলীপ কোন জবাব দেয় না। কয়ালবাবুকে দেখিয়ে বলে, ওই যে! দেখুন!

দেখলাম, কয়ালবাবু হিপ্পি-দম্পতির সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়েছেন।

অচিরেই আমাদের সঙ্গেও আলাপ হল ওদের। শুনলাম, ওরা শিকাগো থেকে এসেছেন। হিপ্পি-পতিটি শিকাগোর এক কোটিপতি ওষুধ ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র। আর জায়াটি ওখানকারই এক মোটর-গাড়ির কারখানার উত্তরাধিকারী। শুনলাম আরও যে, ঐশ্বর্যের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ওরা; এবং ওরা এখন দারিদ্র্যের মধ্য থেকে বৈচিত্র্য অন্বেষণ করছেন।

—কিন্তু বৈচিত্র্যের অন্বেষণে বেরিয়ে কাঠমাণ্ডুতে কী করতে এলেন আপনারা? হিপ্পি-পতিটিকে শুধালাম।

পতি জবাব দিলেন, এলাম হিমালয় দেখতে। কষ্ট করতে।

—যা দেখলেন, তা দিয়ে কষ্ট উসুল হবে কি?

—না হোক, দুঃখ নেই।

—ঠিক ঠিক! এবার একরকম ক্ষমা চেয়ে নিলাম আমি। বললাম, কষ্ট করতেই যখন এসেছেন, তখন কষ্টটা উসুল না হলেই আপনাদের সুখ।

—তা যা বলছেন! আমার কথা শুনে হিপ্পি খুব খুশি। কী জানেন! একটু থেমে আবার শুরু করেন তিনি, আজকের রাতটা এই তেলেজু-মন্দিরের সিঁড়িতেই কাটিয়ে দেব ভাবছি।

বললাম, বেশ তো! কষ্টই যখন আপনাদের সুখ, তখন সিঁড়িতে রাত কাটানোটা বেশ উপাদেয়ই হবে। রাত্তিরের ঠাণ্ডাটা বেশ মোলায়েম হয়েই লাগবে গায়ে।

হিপ্পি-জায়া কথা বললেন এইবার। জানালেন, আগামীকাল নিউ রোডে ফুট-পাথে রাত কাটাব আমরা।

—আর পরশু? কয়ালবাবু শুধালেন।

—পরশু আমরা থাকব বালাজু-ওয়াটার-গার্ডেনে।

—বালাজুতে থাকবেন? বলল দিলীপ, পরশু আমাদেরও ওখানে যাবার কথা। যদি যাই তো দেখা হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে। আবার দেখা হবে। বলতে বলতে হিপ্পি-দম্পতি ছবি তোলায় মন দিলেন আবার। আর আমরা মন দিলাম পথ-পরিক্রমায়। তেলেজু-মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদের দিকে এগোলাম।

রাজপ্রাসাদ আমাদের সামনেই। তার ভীমাকৃতি স্তম্ভগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। স্পষ্ট মনে হচ্ছে, গাম্ভীর্যই শুধু নয়, মাধুর্যেরও প্রতিমূর্তি ওরা।

মাধুর্য কেন? না, রাজকীয় ঐশ্বর্য ওদের মধ্যে স্পর্ধা হয়ে ওঠেনি বলে।

গাম্ভীর্য কেন? না, একেবারে অদূরের হয়েও ওরা সুদূর হয়ে আছে বলে। সুদূর অতীতকে ধারণ করে আছে বলে ওরা।

ওদেরই গা ঘেঁষে এগিয়ে চলি। রাজপ্রাসাদের পশ্চিম প্রান্তকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ চলি আমরা।

পথের বাঁ পাশে দেখি অদ্ভুত একটা ঘণ্টা। বিরাট ঘণ্টা।

—কে ওটা গড়েছে? কে ওটা এনেছে ওখানে? পথ চলতে চলতে ভাবি। বার বার নিজেকেই যেন প্রশ্ন করি, এই পরিত্যক্ত রাজপুরীর আনাচে-কানাচে স্তূপীকৃত রহস্যের জট কে ছাড়াবে? কে বলবে বুঝিয়ে যে, আশেপাশের ওই মন্দির আর মূর্তিগুলোকেই বা কা'রা গড়েছে?

এদিকে দেখতে দেখতে রাজপ্রাসাদের একেবারে সিংহদ্বারে এসে পড়ি।

এসে দেখি, সিংহদ্বার খোলা এবং দ্বারের প্রহরীটি রক্তরাঙা এক পাথরের মূর্তির মধ্যে স্তব্ধ।

হ্যাঁ, এই মূর্তিই প্রহরী এখানকার; এবং এই হল হনুমান-ঢোকার হনুমান।

লোকে বলে, একে প্রণাম করে রাজপ্রাসাদে যাও; প্রাসাদের বাড়-বাড়ন্ত হবে, এবং সেই সঙ্গে তোমারও হবে বাড়-বাড়ন্ত।

তাই নাকি! আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হনুমানজীর মূর্তিটিকে মনে মনেই প্রণাম করি একবার এবং পরক্ষণেই প্রাসাদে ঢুকব বলে পা বাড়াই।

—রুকো! হঠাৎ ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসে প্রাসাদের এক রক্ষী। বাধা দিয়ে বলে, রুকো হজুর!

—রুকেই তো আছি বাবা! রক্ষীটির অতি উৎসাহ দেখে কয়ালবাবু রীতিমতো বিরক্ত।

চোখ-মুখ কুঞ্চিত করে তিনি বলেন, প্রাসাদে ঢুকতে গেলে এক টাকা করে দর্শনী দিতে হয়, তা কি আমরা জানি না?

—জী হজুর! এক রূপয়া! এক এক আদমী কে লিয়ে এক এক রূপয়া! রক্ষীটি স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের।

কিন্তু আমরা ওর কথা শেষ হবার আগেই টিকিট কাটব বলে তৈরী হই। সিংহদ্বারের ঠিক পাশেই মোহন্ত-সুলভ প্রসন্নতা নিয়ে বসে ছিলেন যে দু'তিনজন, ওদেরই একজনের দিকে এগোই।

এদিকে এগোতে গিয়ে আর এক বিপদ। মোহন্তদের একজন উঠে আসেন দেখতে দেখতে; এবং টিকিট কাটা শেষ হবার আগেই বলেন, চলো বাবুজী! গাইড্ কে সাথ চলো!

বললাম, গাইড্! এইটুকুর জন্যে আবার গাইড্ কেন? দরবার-মহল্লা দেখা তো প্রায় শেষ!

কয়ালবাবু বাধা দিলেন, না না; আসতে দিন ওকে। হনুমান-ঢোকায় গাইড্ করাটা ওদের 'ডিউটি'র আওতায় পড়ে।

—পড়ে যদি তো খুব ভালো। 'ডিউটিফুল'টিকে সঙ্গে নিন তবে! কয়ালবাবুর কথায় সায় দিই।

কিন্তু গাইড্ প্রথমটায় কথাবার্তা প্রায় কিছুই বলে না। রাজ-প্রাসাদের প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

এগোই আমরাও। এবং আমাদের একেবারে সামনেই শরতের ভরা দুপুর নির্জন-নিঃস্তব্ধ প্রাসাদপুরীটিকে ঘিরে খাঁ-খাঁ করতে থাকে।

প্রাসাদে লোক চোখে পড়ে না একটিও। চোখে পড়ে পায়রা। শত শত পায়রা। ওরা এক সাম্রাজ্যের মধ্যে নতুন আর একটা সাম্রাজ্যের পত্তন করেছে ; এক রাজমহলের ভেতরে নতুন আর এক রাজমহল গড়ে তুলেছে।

পায়রারা হুড়োহুড়ি দাপাদাপি শুরু করে আমাদের দেখে। পালায় কেউ, কেউ আবার দু'চারবার ডানা ঝাপ্‌টিয়ে প্রাসাদের শূন্যতাকে দ্বিগুণ করে তোলে।

প্রাসাদটি চক-মিলান। প্রাঙ্গণটি আয়তাকার।

প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে থামওয়ালা বারান্দা আছে একটি। মাঝারি আকৃতির ঢাকা-বারান্দা। গাইড্-এর কাছে শুনলাম, ওই বারান্দাতেই নাকি রাজা বসতেন একসময়ে। তাঁর পারিষদদের নিয়ে বসতেন।

বসার জায়গাটা 'আহা মরি' কিছু নয়। গদি এবং তাকিয়ার যে সঙ্গম ওখানে দেখেছি, তা থেকে আর যা কিছুই হোক না কেন, রাজকীয় ঐশ্বর্য উপচে পড়ছে বলে তো মনে হয়নি! একবারও মনে হয়নি যে, আমাদের দেশের বড়, মেজো বা সেজো গোছের কোন জমিদার-নন্দনও জমিদারী বহাল থাকার সময় একে দেখলে এতটুকু ঈর্ষা অনুভব করতেন!

তবে হ্যাঁ, ঈর্ষা জাগাবার মতো কিছু উপকরণ গদি এবং তাকিয়ার ঠিক পাশেই আছে। ওখানে যে তৈলচিত্রগুলো আছে ভূতপূর্ব রাজ-রাজড়াদের ; জমিদারবাড়ি তো দূরের কথা, জাহাঁপনার খাস-মহলেও সে ধরনের খানদানী জিনিস খুব কমই চোখে পড়ে।

গাইড্ জানাল, তৈলচিত্রগুলো নাকি যুগ যুগ ধরে আঁকা হয়েছে ; এবং ওদের এঁকেছেন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীরা।

ভাবি, শ্রেষ্ঠ তো বটেই! শিল্পী শ্রেষ্ঠ না হলে চিত্র কখনও এমন জীবন্ত হয়?

সেদিন ওই শিল্পীদের কথা ভাবতে ভাবতেই বারান্দা থেকে নেমে আসি।

বাঁধানো প্রাঙ্গণটি ধরে এগোই আবার।

প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে একটি বেদী; ওই নাকি অভিষেক-বেদী। যুগে যুগে নেপালের নতুন রাজাকে ওইখানেই নাকি বরণ করা হয়।

বেদীটির দিকে তাকাই। চোখে পড়ে, ফুট-কয়েক উঁচু অতি সাধারণ বর্গাকার একটি জায়গা।

গাইড্ অবিশ্যি বলেছিলেন, এ জায়গাটাই নাকি অসাধারণ হয়ে ওঠে অভিষেকের সময়। সোনা-রুপোয়, মণি-মাণিক্যে ঝলমল করে ওঠে নাকি।

তখন দূর-দূরান্তর থেকে রাজা-বাদশারা আসেন এখানে। আসেন রাজ-অমাত্যরা, বিভিন্ন দেশের সব প্রতিনিধিরা।

ওঁরা বেদীটিকে ঘিরে বসেন সবাই। এমনভাবে বসেন যা'তে অভিষেক-পর্বটা অভিনয়-পর্বের মতো চোখে পড়ে।

অভিনয়ই বটে! ভাবি একবার, সবই বটে অভিনয়। তা না হলে মহাকালের এক একটা অঙ্ক পরবর্তী অঙ্কে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই এমন মিথ্যে হয়ে যাবে কেন? আর কেনই বা এক একটা নাটক শেষ হতে না হতেই তার পাত্র-পাত্রীরা রঙ্ মুছে ফেলে, পোশাক খুলে রেখে অভিনয়-মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করবে?

ওদিকে অভিনয় শুরু করে আমাদের গাইড্ও।

—য়াদ রাখ্না হজুর! হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে শুরু করে সে, ইন্কো য়াদ রাখ্না। ইহ্ হ্যাঁয় কাঠমাণ্ডু কা সব সে বড়িয়া মহল।

—সব সে বড়িয়া? একবার শুধাই ওকে।

—জী হজুর, সব সে! গাইড্ দৃঢ়ভাবে জানায়। এবং তার-

পরেই পৌরাণিক নাটকের 'হিরো'র মতো গলাটাকে একটু কাঁপিয়ে বলে, ইত্‌নী বড়ী কুঠি তমাম কাঠমাণ্ডুমেঁ ঔর এক ভী নঁহী হ্যাঁয়।

এদিকে দেখতে দেখতে কুঠির দক্ষিণ প্রান্তে চলে আসি। গাইড্‌কে অনুসরণ করে উঠতে শুরু করি তার ন'-তলার চূড়ায়।

অনুপম এই রাজকুঠির দক্ষিণ প্রান্তটি ন'-তলাই বটে। যত ওপরে উঠল তলাগুলো, ততই ওরা ছোট হয়ে গেল। একতলার চেয়ে দো-তলা ছোট; এবং দো-তলার চেয়ে আরও ছোট তে-তলা।

প্রত্যেক তলাতেই রাজা-রাণীদের জন্যে বিশেষ জায়গা আছে, প্রজাদের দর্শন দেবার জায়গা।

শুনলাম, দর্শন প্রায়ই নাকি দিতেন রাজা-রাণীরা; এবং প্রায়ই এখানকার আকাশ-বাতাস উল্লসিত প্রজাদের কলকোলাহলে মুখরিত হ'ত।

কিন্তু প্রজারা আজ কোথায়? কোথায় রাজা-রাণী?

রাজা আর কি এখানে পায়ের ধুলো দেন? রাণীর হাত ধরে আর কি এসে দাঁড়ান এখানকার গবাক্ষের সামনে?

—না, আর দাঁড়ান না ওঁরা। কয়ালবাবু বলেছিলেন, দিন-বদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজা-রাণীর কায়দা-কানুনও বদলেছে। রাজ-দর্শনের জন্যে আলাদা জায়গা ঠিক করা আছে এখন। এজন্যে রত্না-পার্কে সুদৃশ্য মঞ্চ তৈরী আছে।

বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি সেই মঞ্চ। ত্রিভুবন রাজপথ ধরে যাবার সময় কয়েকবারই দেখেছি।

—দেখবেন বৈকি! আলবাৎ দেখবেন! বলেন কয়ালবাবু, মঞ্চটা আছেই খোলামেলা এমন এক জায়গায় যে, দেখতে না চাইলেও ঠিক চোখে পড়বে ওটা।

—কিন্তু এখানে যে অনেক কিছুই চোখে পড়ছে না। প্রায়ান্ধকার একটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলি। কয়ালবাবু বুঝিয়ে দেন, চোখে ঠিক পড়ত। ঠিক ওপরে উঠছেন যত, আলোও

তত বেশি পেতেন। কিন্তু তা যে পেলেন না, সেজন্যে এই মিনার দায়ী নয়; দায়ী আকাশ।

বললাম, আকাশ! কিন্তু একটু আগেও যে আকাশ পরিষ্কার ছিল?

কয়ালবাবু একটি গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, আসুন! পরিষ্কারের হালত্‌টা একটু দেখে যান!

এগিয়ে গিয়ে দেখি, ঠিক! ঠিক বলেছেন কয়ালবাবু। আকাশ মেঘের ভারে কাঁদো কাঁদো।

এদিকে দিলীপও কেঁদে ফেলে প্রায়। তার ছবি তোলার উদ্যোগটা মাঠে-মারা গেল, এই ভেবে দারুণ মুষড়ে পড়ে।

গাইড্‌ সান্ত্বনা দেয়, হুজুর, ঘাবড়াও মৎ! বাদল খুল যায়েগা তুরন্ত। মৎ ঘাবড়াও!

বললাম, বেশ! ঘাবড়াব না। কিন্তু আর কতটা উঠতে হবে?

গাইড্‌ জানাল, ঔর থোরা। করীব দু'চার কদম হুজুর!

আবার এগোই আমরা। সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠি। এবারের তলাটি অপেক্ষাকৃত নিচু যেন। যেন যত ওপরে উঠছি, তলাগুলো ততই অপ্রশস্ত ও নিচু হয়ে আসছে।

দেখতে দেখতে সব শেষের তলাটিকেও স্পর্শ করি আমরা। সিঁড়ি বেয়ে রাজকুঠির একেবারে শীর্ষে আসি। এই শীর্ষলোক থেকে কাঠমাণ্ডুকে বড় অদ্ভুত দেখায়। ঠিক পটে-আঁকা ছবির মতো দেখায় যেন।

—ওই দেখুন স্বয়ম্ভুনাথ, আর ওই হল বোধনাথ! কয়ালবাবু দেখিয়ে দেন আমাদের।

—পশুপতিনাথ ভী দেখো হুজুর! বাগমতী কে কিনারে দেউতা কী কুঠি দেখো! গাইড্‌ও যোগ দেয় এবার।

দিলীপ বলে, বাগমতী আর বিষ্ণুমতীকেও ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে!

—দেখাচ্ছে তো বটেই! আমি বলি, গোটা শহরটাকেই সুন্দর দেখাচ্ছে।

—ওই যে নিউ রোড! কয়ালবাবু বলে ওঠেন একবার।

—আর ওই হল শুক্রপথ! দিলীপ বলে।

দিলীপ আর কয়ালবাবু আরও অনেক কিছু বলেছিল সেদিন। কাঠমাণ্ডুর আরও অনেক কিছু খুঁটি-নাটি ওরা খুঁজে খুঁজে বেরও করেছিল। কিন্তু সে-সব এখানে বলে লাভ নেই। এখানে বরং রহস্যময় হনুমান-ঢোকার অন্দর-মহলের কথা সেরে নেওয়া যাক। নেপালের যে রাজকুঠি যুগ যুগ ধরে চোখ ধাঁধিয়েছে বিদেশীদের, সেই রাজকুঠির কথা বলে নেওয়া যাক।

কুঠিটিকে দেখতে পাই আজও। আজও যেন স্পষ্ট চোখে পড়ে, মিনার থেকে নেমে আসার পথে দেখা সেই হাওয়া-ঘর।

হাওয়া-ঘরটি দোতলায় না তিনতলায়, তা ভুলে গেছি। তবে হাওয়া যে ওখানে প্রচুর, তা বেশ মনে আছে আজও। মনে আছে, মিনার থেকে নামার পথে পুবদিকের একটি দরজা পেরিয়ে খোলা ছাত ধরে গেলাম খানিকটা; এবং গিয়েই দেখা পেলাম হাওয়া-ঘরের।

হাওয়া-ঘর একটি নয় আসলে, তিনটি। শোনা যায়, এই তিনটিতেই একসময়ে হাওয়া খেতে আসতেন রাজা-রাণীরা। আসতেন, বসতেন, আনন্দে-উল্লাসে মুখর করে তুলতেন রাজপুরী। কিন্তু আজ কেউ আসেন না ওখানে। দু'চারজন দূরাগত পর্যটক ছাড়া হাওয়া-ঘরকে তারিফ করার লোক আজ আর নেই। আজ হাওয়া-ঘর তার জরাজীর্ণ চন্দ্রাতপ, তার অযত্ন-রক্ষিত মেঝে ও তার বিশীর্ণ স্তম্ভগুলোকে নিয়ে আগামী দিনের প্রত্নতাত্ত্বিকের জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক কত আর আসবেন কাঠমাণ্ডুতে? দেখতে দেখতে গোটা শহরটাই প্রত্নতত্ত্বের একটা মিউজিয়াম হয়ে উঠছে যে।

হ্যাঁ, মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব ;—ভাবছিলাম আকাশ-পাতাল। এমন সময় হঠাৎ শব্দ ওঠে হাওয়া-ঘরে,—হুস হুস, হুস হুস, হুস হুস হুস হুস হুস। একঝাঁক পায়রা আমাদের সাড়া পেয়ে উড়ে পালায়। আর আমরা পায়রার রাজকুঞ্জে অনধিকার-প্রবেশ করেছি ভেবে নিশ্চল মর্মর-মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

—হজুর! আমাদের নীরবতা প্রথম ভাঙে গাইড্, হজুর! হাওয়া-মহল দেখা, অন্দর-মহল দেখো!

বললাম, অন্দর-মহলেই তো দাঁড়িয়ে আছি!

—নহী হজুর! অন্দর-মহল ইহ্ তো নহী হ্যায়! রাজা ঔর রাণীকে আপনা মহল ইহ্ নহী হ্যায়!

—সে মহলটি তবে কোথায়?

—নজদীক হ্যায়। করীব দু'চার কদম যানে সে ওহ্ মিল যায়েগা।

বললাম, মিলে যদি যায় তো ভালো। তুমি এত যার গুণ-কীর্তন করছ, তাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে নিতে পারি।

কিন্তু না; শেষ অবধি জুড়নো আর হল না।

সত্যি যখন অন্দর-মহলে গিয়ে দাঁড়ালাম, যখন সত্যি মিনার-শোভিত উত্তুরে রাজমহলটিকে পেরিয়ে পশ্চিমের রাজ-অন্তঃপুরে দাঁড়ালাম এসে, তখন তাকে তারিফ করার মতো খোরাক খুঁজে পেল না চোখ। বরং বার বার মনে হল, যে বাদশাহী অন্দর-মহল রূপ-রসের তেরিজ ছড়াচ্ছে বলে গাইড্ এতক্ষণ সাফাই গাইছিল, আসলে তা অতি সাধারণ একটি 'করিডোর' বা অলিন্দ ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে হ্যাঁ, অলিন্দটি বড়-সড় বটে ; এবং বটে রঙ্চঙেও।

রঙ্ সযত্নে লাগানো হয়নি ওখানে। লাগাতে হবে কিছু একটা, তাই যেন কিছু না ভেবেই রঙের এক-একটা পিপে ওখানকার দেওয়ালে উবুড় করে দেওয়া হয়েছে।

পদ্মকে বেছে নেওয়া হল এখানে? আবার ভাবি, না, তা হয়তো নয়। এই পদ্ম হয়তো প্রাগৈতিহাসিক স্বয়ম্ভুনাথের প্রতীক।

জানি নে, কে কা'র প্রতীক! আজও অবধি ঠাওর করতে পারি নে তা। তবে পদ্মাসীনা রত্না দেবীকে আজও যেন দেখতে পাই। দেখি, একদিকে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছেন তিনি; আর অপরদিকে তাঁর মর্মর-মূর্তির খুব কাছেই একটি নেপালী ছেলে চিৎকার করছে,—ম্য ভোকেইকো ছু; অর্থাৎ, আমার ক্ষিধে পেয়েছে।

ক্ষিধে? এই মর্মর-মূর্তিটিকে ঘিরে রোশনাই করতে যে টাকা খরচ হয়েছে, তা দিয়ে কি ছেলেটির ক্ষিধে দূর করা যেত না? সেদিন নিজেকেই প্রশ্ন করি একবার।

প্রশ্ন করি, কিন্তু জবাব পাই নে। উল্টে জবাব আসে ওই ছেলেটিরই কাছ থেকে, ম্য খানা ছাহানছু। অর্থাৎ, আমি খেতে চাই।

খেতে চাই! খেতে চাই! খেতে চাই! সেদিন রত্না দেবীর মর্মর-মূর্তিটিকে ঘিরে নেপালের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত যেন একসঙ্গে বলে উঠল। যেন সবাই বলল, ম্য খানা ছাহান্ছু।

কিন্তু কোথায় খানা? ত্রিভুবন রাজপথে শত শত গাড়ির কনভয়, আর রাণী রত্নার গায়ে হাজার হাজার ওয়াটের আলো। এর মধ্যে খানা নিয়ে ভাববার অবকাশ কোথায়?

অবকাশ নেই; এবং নেই বলেই মনটা হঠাৎ যেন দারুণ ভারী হয়ে ওঠে সেদিন।

সেদিন রত্না-পার্কের ভেতরে আসি যখন, যখন আলোককুঞ্জ থেকে অনেকটা দূরে সরে আসি, তখন বার বার মনে হয়, পার্কের আঁধার দারিদ্র্যের রূপ ধরে আমাদের গ্রাস করতে চাইছে।

কিন্তু আমরা কত নিরাপদ! আর কত ফাঁপা! তাই সেদিনও দারিদ্র্যকে নিয়ে তামাসা করতে আমাদের বিবেকে বাধে না।

সেদিনও ফিরে গিয়ে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করি, ম্য খানা ছাহান্ছু !

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ি আবার। আবার আসি রত্না-পার্কে। কিন্তু সাজানো-গোছানো ও ছিমছাম এই পার্কটিকে কিছুতেই মনে ধরে না আর। মন বরং খুশি হয়ে ওঠে 'টুণ্ডিখেল'-কে দেখে।

এই টুণ্ডিখেলই হল শহর কাঠমাণ্ডুর সেরা ময়দান। শহরের একরকম মাঝখানে আছে এ; এবং আছে রত্না-পার্কের গা ঘেঁষে।

টুণ্ডিখেলকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ঘন সবুজ ঘাসের এমন সুন্দর গালিচা সারা নেপালে আর কোথাও দেখিনি। লোকে বলে, দেখবে কোত্থেকে? আর কোথাও ঠিক এমনটি থাকলে তো!

টুণ্ডিখেল-এর সামনে দাঁড়িয়ে ভাবি, তা বটে। যা রটে তার কিছুটা সত্যি বটে। তা না হলে ঈষৎ ঢেউ-খেলানো কাঠমাণ্ডু-উপত্যকা বিরাট এই ঘাসে-ঢাকা ময়দানটির কাছাকাছি এসে সব ঢেউকে সংহত করে নিচ্ছে বলে মনে হ'ত না। এত বেশি সমতল মনে হ'ত না ময়দানটিকে।

শোনা যায়, এই ময়দানের খ্যাতির নাকি আজও বাড়-বাড়ন্ত। একে বাদ দিয়ে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হয় না। নেপালের বড় দরের কোন ধর্মীয় উৎসব হয় না।

কী ধর্মীয়, আর কী জাতীয়—সব উৎসবেই টুণ্ডিখেল অপরিহার্য। তাই রাজা-রাণী বসবেন বলে স্থায়ী বেদী গড়া হয়েছে ওখানে। এবং বেদীটির ওপরে গড়া হয়েছে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ।

এই রাজকীয় বেদী ছাড়া আর একটি বেদী আছে টুণ্ডিখেল-এ, এবং ওই হল শহীদ-বেদী। টুণ্ডিখেল-এর দক্ষিণ প্রান্তের মাঝামাঝি জায়গায় আছে ওটি এবং ওর মার্বেল-পাথরে কারুকার্য বেশি না

থাকলেও এমন একটা মহিমা আছে, যা দেখে শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে আসে।

টুণ্ডিখেল-এর খুব কাছেই উত্তর প্রান্তে আছে রাণী-পোখ্‌রি। এ হল শান-বাঁধানো অতি সুন্দর একটা পুকুর। কিন্তু পুকুরটির ঠিক মাঝখানে কী ভাসে ওটা?

সহযাত্রীদের একজন বলেন, শিব-মন্দির। বলেন, ওটা ঠিক ভাসে না; রাণী-পোখ্‌রির মাঝখানে গড়ে-তোলা একফালি দ্বীপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

দ্বীপটির দিকে এগিয়ে যাই। রাণী-পোখ্‌রির পশ্চিম তীর ধরে পথ চলি।

পথটা খানিক দূর গিয়েই তুটি শাখায় বিভক্ত হয়; এবং শাখাদের একটি যায় শিব-মন্দির বরাবর।

মন্দিরটিকে দূর থেকে দেখি। আর সামনে থেকে দেখি রঙ্‌-বেরঙের বাহারি ফুল।

রাণী-পোখ্‌রির চারিদিকে ফুলের মেলা, রঙের মহোৎসব।

শুনলাম, উৎসব বারোমাসই নাকি চলে এখানে। এখানকার এই রাজকীয় উদ্যানে ফোটা-ফুলের মহোৎসব নাকি লেগেই থাকে।

কিন্তু ফুল দেখতে দেখতে, রাণী-পোখ্‌রির টলটলে জল দেখতে দেখতে এ কোথায় এলাম আমরা? যেন পোখ্‌রির দক্ষিণ প্রান্তে জলজ্যান্ত একটি হাতীর সামনে এসে দাঁড়ালাম!

হাতীটি আসলে পাথর দিয়ে গড়া। কিন্তু খানিকটা দূর থেকে দেখলে জ্যান্ত বলেই মনে হয় ওকে। মনে হয়, ও চলছে; এবং ওর সঙ্গে চলছে আরও তু'জন, রাজা প্রতাপ মল্ল ও তাঁর রাণী।

রাজা-রাণীর মূর্তি তুটিও সযত্নে গড়া। কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে কে আর আজ রাণী-পোখ্‌রির ইতিকথা নিয়ে ভাবে! কে আর

আজ স্মরণে রাখে যে, পাথরে-গড়া ঠিক ওই মূর্তির মতোই দেখতে দু'জন রাজা-রাণী কাঠমাণ্ডুর ভাগ্যকে একদিন নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন।

অথচ ইতিহাস সাক্ষী, একদিন এই শহরের পথে পথে অনেক কিছুই করেছিলেন ওঁরা। এই রাণী-পোখ্‌রিও একদিন ওঁদেরই দৌলতে গড়ে উঠেছিল।

পোখ্‌রির জন্মকথা নিয়ে ঐতিহাসিকদের অনেকেই অনেক কথা বলেন। কিন্তু রাজা প্রতাপ মল্ল ও তাঁর রাণীকে বাদ দিয়ে কারও কথাই বেশিদূর এগোয় না।

শোনা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রতাপ মল্ল নাকি মল্ল-রাজাদের 'ট্র্যাডিশান' সম্পর্কে হঠাৎ অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছিলেন।

ট্র্যাডিশান কী ? না, রাজা বেঁচে থাকতেই রাজপুত্রদের শাসনের অধিকার দিতে হবে। রাজ-দরবার থেকে পেল্লাই পেল্লাই সব উপাধি দিতে হবে ওদের।

প্রতাপ মল্ল বললেন, উপাধি আমিও দেব। মল্ল-রাজবংশের প্রথা অনুযায়ী রাজপুত্রদের সম্মানিত করব।

কিন্তু সম্রাট ! পারিষদরা প্রশ্ন তুললেন, আপনার চার পুত্রের মধ্যে প্রথম রূপেন্দ্র মল্ল তো আজ আর বেঁচে নেই। সম্মানিত কা'কে করবেন আপনি ?

রাজা বললেন, প্রথম রূপেন্দ্র নেই ; কিন্তু দ্বিতীয় চক্রবর্তেন্দ্র আছে ! অতএব ওকেই করব।

—বেশ, তাই করুন ! পারিষদরা সায় দিলেন এবার ; আর রাজা মহারাজাধিরাজ উপাধি দিলেন চক্রবর্তেন্দ্রকে।

কিন্তু উপাধি দিয়েই কি শান্তি আছে ! প্রতাপ মল্ল সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন। অতএব উপাধি দিয়েই কি শান্তি আছে তাঁর !

এরপর চক্রবর্তেন্দ্রের নামে মুদ্রা বের করেন তিনি। এবং হঠাৎ একদিন প্রজাদের ডেকে বলেন, আজ থেকে চক্রবর্তেন্দ্রই রাজা!

—সে কী মহারাজ! রাজা বেঁচে থাকতে যুবরাজ বসবেন সিংহাসনে? প্রজারা হাহাকার করে ওঠে।

কিন্তু রাজা কান দেন না কারও কথায়। যুবরাজকেই সিংহাসনে বসিয়ে সারা কাঠমাণ্ডু জুড়ে বিরাট এক উৎসব শুরু করেন।

শোনা যায়, উৎসব নাকি ভালোভাবেই শুরু হয়; কিন্তু হয় না শুধু শেষরক্ষা। কারণ, নতুন রাজা মাত্র চারদিন রাজত্ব করতে না করতেই সারা কাঠমাণ্ডু আর্তনাদ করে ওঠে।

—আর্তনাদ কেন? যুবরাজ চলে গেছেন বলে? কবি ও দার্শনিক রাজা প্রতাপ মল্ল সান্ত্বনা দেন সবাইকে।

বলেন, চলে তো সে যাবেই। এত ছোট রাজ্যে তার কি মন ভরে?

—তাহলে রাজ্যের উৎসব বন্ধ হোক এখন। মাথায় হাত দিয়ে শুধান পারিষদরা।

রাজা বলেন, না না। বন্ধ হবে কেন? উৎসব যারা করছে, তাদের ডাকো। পুকুর খুঁড়তে বলো ওদের।

—পুকুর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পুকুর। চারদিনের ওই রাজার জন্যে যত চোখের জল ফেলবে প্রজারা, এ পুকুর ততই ভরে উঠবে।

—সত্যি ভরে উঠবে সম্রাট! এবার রাণী সান্ত্বনা দেন রাজাকে। বলেন, আমার চোখের জলকেও ধরে রাখবে ওই পুকুর!

প্রজারা বলাবলি করে, হ্যাঁ, রাখবে ধরে। ঠিক রাখবে। এই হল রাণী-পোখ্‌রি।

শোনা যায়, সেই থেকে নামকরণ হল পুকুরের। প্রজারা বলল, এমন পুকুর আর হয় না!

—এমন পুকুর আর হয় না। প্রজারা আজও অবিশ্যি একই কথা বলে। কিন্তু আজ কদাচিৎ অন্য কথা বলেন ঐতিহাসিকরা।

আজ কেউ বলেন, রাণীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গড়া হয় এই পুকুর। আবার কেউ বলেন, রাণীর স্মৃতি-টিতি বাজে কথা। আসলে রাণীই গড়ে তোলেন এই পুকুর। চারদিনের রাজা চক্রবর্তেন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গড়েন।

কিন্তু আজ কোথায় চক্রবর্তেন্দ্র, আর কোথায় রাণী? কোথায় রাজা প্রতাপ মল্ল, আর কোথায় তাঁর পারিষদরা? সেদিন রাণী-পোখ্রির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবি।

ওদিকে দেখতে দেখতে যাবার সময় ঘনিয়ে আসে। সহযাত্রীদের একজন তাড়া দেন, কীর্তিপুর যেতে হবে আজ। মনে আছে তো?

—হ্যাঁ, মনে আছে। খুব মনে আছে! বলতে বলতে কীর্তিপুরের দিকে এগোই।

কীর্তিপুর জায়গাটি শহর কাঠমাণ্ডু থেকে মাইল দু'য়েক দূরে। মালভূমি গোছের একটি অতি সুন্দর পর্বতশিরার গায়ে গায়ে এই শহর।

কিন্তু শহর বলব কীর্তিপুরকে? না কি বলব শহরতলী?

শেষেরটা বলাই সঙ্গত বোধ করি। কীর্তিপুরে পা দিয়ে মনে হল, হ্যাঁ, শেষেরটাই সঙ্গত। কীর্তিপুর শহরতলীই বটে। তবে আর দশটা শহরতলীর মতো নয় এ। গৌরবে ও মহিমায় এ যেন মূল শহরকে টেক্কা দিচ্ছে।

মূল শহর কাঠমাণ্ডু থেকে শ' তিনেক ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে কীর্তিপুর। কীর্তিপুরের চারিদিকে যে সমভূমি, তা যেন ওই মালভূমি-বিধৃত শহরতলীটিকেই বন্দনা করতে ব্যস্ত।

অবিশ্যি কীর্তিপুরের বন্দনা কে আর না করেছেন! ইতিহাস

বলে, বন্দনা করেছেন এমনকি রাজ-রাজেশ্বররাও। করেছেন রাজা সদাশিব দেব।

ইতিহাসে পাই, সুন্দরের বন্দনা করতে গিয়েই একদিন ওই রাজা কীর্তিপুরের পত্তন করেন। আজ থেকে সাত শ' বছর আগে অপরূপ ওই জনপদটি গড়ে তুলতে শুরু করেন তিনি।

তিনি শুরু করেন; এবং সেই থেকেই শুরু হয় কীর্তিপুরের রক্তাক্ত ইতিহাস।

দীর্ঘ সাত শ' বছর ধরে অনেক রক্ত ঝরে কীর্তিপুরে। এবং অনেককেই বলতে শোনা যায় আজও, এই কীর্তিপুর জায়গাটা যদি আশেপাশের চেয়ে উঁচুতে না হ'ত, তবে শুধুমাত্র রক্তের বন্যাতেই কবে ভেসে যেত এ!

ইতিহাস সাক্ষী, রক্ত নিয়ে হোলিখেলা কীর্তিপুর অনেকবার দেখেছে। এই সেদিনও সে দেখেছে, মানুষের তাজা গরম রক্তে কালো মাটি রাঙা হয়ে ওঠে কেমন করে।

সেদিনকার ঘটনা। ১৭৫৭ সালের এক অভিশপ্ত দিন।

কালু পাণ্ডে ঝড়ের বেগে এগোন কীর্তিপুরের দিকে। হাজার হাজার গোর্খা সৈন্যকে নিয়ে এগোন তিনি। গোর্খার অধিপতি তখন পৃথ্বীনারায়ণ শা; আর কালু পাণ্ডে তাঁর প্রধান সেনাপতি।

লোকে অবিশ্যি বলত, সেনাপতি নামেই। আসলে কালু হলেন পৃথ্বীর ডান হাত।

—হ্যাঁ, ডান হাত। সৈন্যরা কানাঘুঁষো করত, তা না হলে এই সেদিনও কাশী যাবার আগে পৃথ্বীনারায়ণ রাজ্যের সব ভার কালুর হাতে সঁপে দেবেন কেন?

এদিকে বিপদ দেখা দেয় হঠাৎ। হঠাৎ বিতর্কের তুফান ওঠে।

ব্যাপার কী? না, কীর্তিপুর আক্রমণ করতে চান পৃথ্বী। কিন্তু কালু তা চান না। কালু বলেন, কীর্তিপুরকে গ্রাস করার এখনও সময় হয়নি।

—বলো কী? সময় হয়নি? সম্রাট পৃথ্বীনারায়ণ একটু যেন চিন্তিত।

ওদিকে কালু পাণ্ডে বার বার তাঁকে বোঝান, না মালিক! সময় হয়নি। এখন কীর্তিপুর আক্রমণ করলে আমরা পরাজিত হব।

—পরাজিত হব? কালুর কথা শুনে পৃথ্বীনারায়ণ আকাশ থেকে পড়েন। কেশর-ফোলা সিংহের মতো গর্জন করে ওঠেন, চোপরও!

নিরুপায় হয়ে কালু পাণ্ডে চুপ করেন এইবার। মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ওদিকে পৃথ্বীনারায়ণ তখনও থামেননি। গর্জন করে উঠছেন থেকে থেকে, কীতিপুর আমার চাই-ই। যেমন করে হোক চাই!

অগত্যা কীর্তিপুরের দিকে এগোন কালু পাণ্ডে। কয়েক হাজার গোর্খা সৈন্যকে নিয়ে এগোন।

কিন্তু এগোলে কী হবে! কীর্তিপুর তৈরী হয়েই ছিল তখন। কালু পাণ্ডের দলবলকে শায়েস্তা করবে বলে অস্ত্র উঁচিয়েই বসে ছিল। অতএব লড়াই জমে উঠতে সময় লাগল না। সময় লাগল না কীর্তিপুরের পথঘাটগুলো রক্তাক্ত হতে।

—কিন্তু একি! আর্তনাদ করে ওঠেন কালু পাণ্ডে, সব রক্তই যে গোর্খাদের!

—হ্যাঁ, গোর্খাদের! জানিয়ে দিল কীর্তিপুরের রক্ষীরা। বলল, গোর্খাদের রক্তেই কীর্তিপুর স্নান করল আজ।

—কিন্তু স্নানের এখনও যে বাকি আছে! বলে উঠল রক্ষীদের একজন; এবং পরক্ষণেই দেখা গেল, কালু পাণ্ডের ছিন্নমুণ্ড কীর্তিপুরের পথের ধূলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কালু পাণ্ডে হারলেন শেষ অবধি। কিন্তু মরণ-বিজয়ী গোর্খারা এত সহজে হার স্বীকার করল না। ওরা আবার তৈরী হতে লাগল কীর্তিপুর আক্রমণ করবে বলে।

এবার গোর্খাদের নেতৃত্ব করলেন পৃথ্বীনারায়ণের অপর এক সেনাপতি রামকৃষ্ণ; এবং রক্ত এবারেও অনেক ঝরল। কিন্তু রামকৃষ্ণ যুদ্ধে পরাজিত হননি। বিজয়ীর নিশান হাতে নিয়ে রক্ত-স্নাত কীর্তিপুরের পথ ধরে এগিয়ে গেছেন।

এগিয়ে গেছেন অবিশ্যি পৃথ্বীনারায়ণ শা নিজেও। সেনাপতি কালু পাণ্ডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি। আর প্রতিশোধ নিয়েছেন তাঁর অনুজ সুরা প্রতাপকে বিকলাঙ্গ করার।

কীর্তিপুরের লোকেরা আজও বলে, হ্যাঁ, ঠিক। সত্যি বিকলাঙ্গ হয়েছিলেন সুরা প্রতাপ। কালু পাণ্ডে যে-যুদ্ধে নিহত হন, ঠিক সেই যুদ্ধেই একটি চোখ তিনি হারিয়েছিলেন।

—এই হারানোর প্রতিশোধ আমি নেব। বলেই তৃতীয়বার কীর্তিপুর আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলেন পৃথ্বীনারায়ণ; এবং শেষ অবধি আক্রমণ তিনি করলেনও।

কীর্তিপুরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললেন তিনি; ওখানকার অধিবাসীদের বাধ্য করলেন আত্মসমর্পণ করতে।

কিন্তু শুধুমাত্র আত্মসমর্পণ করেই কি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল কীর্তিপুরের অধিবাসীরা? আজও গল্প শোনা যায় নেপালে।

শোনা যায়, পারেনি। কারণ, কীর্তিপুর-বিজয়ের ঠিক পরেই পৃথ্বীনারায়ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন, নাক কেটে দাও এখানকার অধিবাসীদের। এখানকার যারা মাতব্বর, তাদের নাকগুলো এই মুহূর্তে উড়িয়ে দাও।

রাজার আদেশ। অতএব নাক কাটা শুরু হল তখুনি। এবং রাজাকে বলতে শোনা গেল, আমার ভাইয়ের চোখ নিয়েছে যারা, তাদের নাক কেটে আমি প্রতিশোধ নিলাম। দরকার হলে প্রতিশোধের মাত্রাটা বাড়তে পারে আরও। এবং এমনকি কীর্তিপুরের নাম হয়ে যেতে পারে নাসকাটিপুর বা কাটানাকের শহর।

নাসকাটিপুর নাম শেষ অবধি অবিশ্যি হয়নি। কিন্তু কাটা-নাকের গল্প আজও কীর্তিপুরের পথে পথে শোনা যায়।

শোনা যায় কত কথা। কত কিছু আবার দেখা যায়। বাঘ-ভৈরবের মন্দিরটিকে দেখা যায় আজও। আজও চোখে পড়ে, কীর্তিপুরের কীর্তি বাড়াচ্ছে অপরূপ এক দেবদেউল।

দেউলটি প্যাগোডার ছাঁচে গড়া। তার ভেতরে আছে বাঘ-দেবতার মূর্তি, - ভয়ঙ্কর মূর্তি। শিব সংহারক হলেন এখানে, ভৈরব হলেন,—মূর্তিটির মধ্য দিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে এই কথাই যেন পরিব্যক্ত।

অবিশ্যি ইঙ্গিতের তোয়াক্কা বাঘ-ভৈরবের প্রতিষ্ঠাতা সদাশিব দেব করেননি। তিনি কীর্তিপুরকে যেমন, এই মূর্তিকেও তেমনি খেয়াল-বশেই গড়ে তোলেন।

কিন্তু অবাক লাগে ভাবতে, সেই খেয়ালই কালক্রমে কোথায় গিয়ে ঠেকল। কালক্রমে কোন্ মন্ত্রবলে রক্তস্নান করে জেগে উঠল কীর্তিপুর।

অবিশ্যি রক্তের কোন চিহ্ন সদাশিব দেব-এর শহরে আজ আর নেই। স্নানের পরে গা ভালো করেই মুছে নিয়েছে সে। মহা-কালের গামছা দিয়ে সব রক্ত ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিয়েছে।

আজ কীর্তিপুরে ঘুরে বেড়াই যখন, তখন তার রক্ত-সাক্ষী পথঘাটগুলোকে দেখি ; আর দেখি তার জরাজীর্ণ ঘরবাড়িগুলোকে।

বাড়িগুলো খাঁ-খাঁ করে এক একসময়। হারিয়ে-যাওয়া অতীতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দীর্ঘশ্বাস নেই শুধু ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানকার বাতাসটা বর্তমানেরই নির্যাস যেন। যেন হাল-আমলের আশা-আকাঙ্ক্ষার অগ্রদূত।

অগ্রদূত কেন? না, আজকের নেপাল অনেক স্বপ্ন দেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে। আজ নেপাল ভাবে, উচ্চশিক্ষার আলোক এইখান থেকেই সে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে।

কিন্তু হায় আলোক! আর হায় উচ্চশিক্ষা! প্রায় এক কোটি লোক অধ্যুষিত আর ৫৫০ মাইল লম্বা ও ১৫০ মাইল চওড়া এক বিরাট দেশে বিশ্ববিদ্যালয় থাকে যদি মাত্র একটি, তো আলোকটা কী করে সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়বে? উচ্চশিক্ষাই বা কী করে লাভ করবে দেশের লোক?

—উচ্চশিক্ষা না হোক, মাঝারি শিক্ষার আয়োজন কিন্তু আজকের নেপালে পুরোদমেই চলছে। ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে যেতে যেতে বলেন আমাদের হোস্ট্ শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী।

প্রদীপবাবুর কথা শুনে চমকে উঠি। শুধাই, সত্যি চলছে?

—হ্যাঁ, চলছে। প্রদীপবাবু শুরু করেন আবার। দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দেন, কী জানেন, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় নেপাল আজ এগিয়ে গেছে অনেক দূর। আজ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার প্রাথমিক স্কুল আছে নেপালে; এবং মাধ্যমিক স্কুল আছে সাড়ে পাঁচ শো।

বললাম, এই সংখ্যাগুলো নেপালের প্রয়োজনের তুলনায় কিছু নয়।

প্রদীপবাবু বললেন, এরা নিরাশ হবার মতও নয় কিছু।

এদিকে দেখতে দেখতে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দর-মহলে এসে পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন-গড়া বাড়িগুলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় আমাদের। কিন্তু আমাদের উৎসাহের আগুনে জল ছিটিয়ে দেন ওখানকারই এক অধ্যাপক ডঃ মতিরাম খাণ্ডেলওয়াল।

কেমিস্ট্রি-ল্যাবরেটরী দেখতে গিয়ে আলাপ হয় তাঁর সঙ্গে। কিন্তু উনি যখন বিলাপের সুরে বললেন, ছেলে পাই নে মশাই! আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে বেশির ভাগ সীটই খালি পড়ে থাকে। —তখন আমাদের বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না যে, এখানকার এই শিক্ষাক্ষেত্রটির ম্যান্‌সান্‌গুলো যত উঁচু, শিক্ষার জন্যে আগ্রহটা তত উঁচু নয়।

প্রদীপবাবু দুঃখ করে বললেন, উচ্চশিক্ষার জন্যে আগ্রহ কী করে হবে! নেপালীরা পাশ করে ভালো কাজ পেলে তো!

শুধালাম, কেন? কাজ পায় না ওরা?

প্রদীপবাবু বললেন, পায়। তবে বিদেশী ডিগ্রীরই কদর এখানে বেশি। কী জানেন, বত্রিশটা কলেজ ও এই একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে নেপালে। কিন্তু নেপালের অধ্যাপকরা অধিকাংশই বিদেশী। এবং অধিকাংশই বিশেষ করে ভারতীয়।

বললাম, উচ্চশিক্ষা এই নতুন শুরু করেছে নেপাল। অতএব, অধ্যাপকদের জন্যে এখন তো তাকে বিদেশের ওপর নির্ভর করতেই হবে।

—তা হবে! বললেন প্রদীপবাবু, কিন্তু এমন করে আর কতদিন?

—ঠিক কথা। কতদিন আর! ভাবতে ভাবতে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে আসি। এগোই কাঠমাণ্ডুর দিকে। আর প্রদীপবাবুর কথাটা মনে মনে আউড়ে বার বার নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করি,—উচ্চশিক্ষা না হোক, মাঝারি শিক্ষার আয়োজন কিন্তু আজকের নেপালে পুরোদমেই চলছে।

এদিকে কাঠমাণ্ডু পৌঁছুতে দম ফুরিয়ে আসে যেন। আর সূর্যও যেন বে-দম হয়ে পশ্চিমাকাশে হেলান দেয়।

কিন্তু দিলে কী হবে! উৎসাহ আমাদের অনন্য। সেদিনই অন্য আর একটি অভিযানে আমাদের যাবার কথা। কীর্তিপুর থেকে ফিরবার পর ছত্রপটির আস্তানায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সেদিনই যাবার কথা সুন্দরীজল-এ।

সুন্দরীজল নেপালের ঝরনা-তলা। ওখানে যেতে গোকর্ণবন নামে একটি অরণ্যের ভেতর দিয়ে এগোতে হয়। অতএব, প্রথমে ওই অরণ্যের দিকেই অভিসার করি আমরা। বোধনাথ স্তূপটিকে পেছনে ফেলে উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর এগোই।

তবে বেশিদূর এগোতে হয় না। শহর কাঠমাণ্ডুকে পেছনে ফেলে মাইল পাঁচেক এগোতে না এগোতেই পড়ে গোকর্ণবন।

হ্যাঁ, গোকর্ণ বনই বটে। গহন-গভীর বন। আর সত্যি বলতে কি, শহর কাঠমাণ্ডুর এত কাছেই যে ঠিক এইরকম একটা বন থাকতে পারে, গোকর্ণকে না দেখলে তা বিশ্বাসই করা যায় না।

কী নেই গোকর্ণে? শাল, শিশু ও তুন থেকে শুরু করে মহুয়া, দেবদারু ও পাইন জাতীয় অজস্র রকমের গাছ আছে ওখানে। আর আছে অজস্র জন্তু-জানোয়ার ;—ভালুক, চিতল, সম্বর-হরিণ ও চিতাবাঘ।

বাঘ-ভালুক আমরা অবিশ্যি দেখিনি ; তবে সম্বর-হরিণের একটা দলকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখেছিলাম।

—হুস! হুস হুস হুস! হঠাৎ শব্দ উঠেছিল আমাদের খুব কাছেই। এবং তারপর শব্দ তাক করে তাকাতেই চোখে পড়েছিল, কয়েকটি সম্বর-হরিণ রকেটের বেগে ছুটছে।

হরিণগুলোর সব ক'টিকে দেখতে পাইনি ঠিক। কিন্তু অদূরবর্তী কিছু লতাগুল্মের কাঁপন দেখে ঠিক অনুমান করেছিলাম যে, রকেটের বেগেই ছুটছে ওরা।

মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সম্বর-হরিণের দল। এবং লতাগুল্মগুলো কাঁপতে কাঁপতে একরাশ ধুলোর মধ্যে হারিয়ে গেল।

প্রদীপবাবু বললেন, ভাগ্যি ভালো ওই সম্বর-বাছাদের। শিকারী আসেনি আজ।

শুধালাম, কেন? এলে কী হ'ত?

—এলে ধুলো উড়ত না এত। শহীদ-সম্বরদের রক্তে মাটি ভিজে যাবার ফলে সামনের ওই বনটা পরিষ্কার থাকত।

—শিকারী অনেক আসে বুঝি এখানে?

—আগে আসত। কিন্তু এখন রাজার হুকুম ছাড়া কেউ বড় একটা আসে না।

—কেউ আসে না বড় একটা। একটু থেমে প্রদীপবাবু আবার শুরু করেন, তবে হ্যাঁ, রাজা এবং রাজ-অতিথিরা আসেন বৈকি। এখানে এসে শিকার করেন কদাচিৎ।

—সত্যি শিকার করেন ওঁরা? রাজা মহেন্দ্রও করেন? সম্বরদের ওড়ানো ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে শুধাই আমি।

প্রদীপবাবু জবাব দেন, ঠিক জানি না। তবে শুনেছি, কালে-ভদ্রে উনিও নাকি আসেন।

বললাম, তা তো আসবেনই। কারণ, এ বন রাজকীয় বন—রয়্যাল গেম্ স্যাংচুয়ারী। রাজা না এলে এর মান থাকবে কেন?

—মান-অপমান নিয়ে পরে ভাববেন। প্রদীপবাবু তাড়া দিলেন সেই মুহূর্তে। বললেন, গোকর্ণেশ্বরে যেতে হবে। চটপট এগোন এবার।

এগোলাম। গোকর্ণের অরণ্য-পথ ধরে এবার দ্রুত এগোলাম আমরা। আমাদের সাড়া পেয়ে রাশি রাশি নাম-না-জানা পাখি উড়ে পালাল।

ওদিকে হনুমানরা পালাল না মোটেই। মোটেই উদ্বেগ প্রকাশ করল না। ওরা লতায় ঝুলে পড়ে দোল খেল একটু; এবং একটুক্ষণ পরেই সুবিধেমতো একটা জায়গায় উঠে পড়ে কিচির-মিচির শুরু করল।

এই কিচির-মিচির শুনতে শুনতে কখনও, আবার কখনও উড়ে পালানো পাখিদের কলকাকলী শুনতে শুনতে গোকর্ণবনের উত্তর দিকে এগোই আমরা; এবং খানিকদূর এগিয়েই দেখা পাই আশ্চর্য সুন্দর এক গিরিখাতের।

এই হল বাগমতীর গিরিখাত। গোকর্ণেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি এরই গায়ে দেখতে পাই আমরা।

এবার বাগমতীর কলতান শুনতে শুনতে মন্দিরের দিকে এগোই, এবং খানিকক্ষণের মধ্যেই দাঁড়াই গিয়ে মন্দির-চত্বরে।

গোকর্ণেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি অতিকায়।

অতিকায় একটি প্যাগোডার ছাঁচে ওটিকে গড়ে তোলা হয়েছে। তবে সূক্ষ্ম কারুকার্যও বড় কম নেই ওতে। ওর স্তম্ভে, দেওয়ালে, ছাতে কারুকার্য বড় কম নেই।

কিন্তু সত্যি বলতে কী, গোকর্ণেশ্বর মহাদেব-মন্দিরে দাঁড়িয়ে মানুষের গড়া কারুকার্য কতটুকু আর দেখেছিলাম! বেশি দেখেছিলাম বোধ করি প্রকৃতির কারুকার্যকেই। দেখেছিলাম, একদিকে খরস্রোতা বাগমতী কলকল খলখল করতে করতে গিরিখাত ধরে ছুটছে; আর অপরদিকে ঘন সবুজ গোকর্ণবন নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মৌনী হবার সাধনা করছে।

শোনা যায়, এই গোকর্ণেশ্বর-মন্দিরেও যুগে যুগে অনেক সাধনা হয়েছে। রাজার সাধনা, এবং সেই সঙ্গে প্রজারও।

রাজা জয়স্থিতি মল্ল মেরামত করেছেন এই মন্দিরকে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দের এক অপরাহ্নে নতুন করে গড়া এই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে গোকর্ণেশ্বরকে প্রণাম করেছেন।

কিন্তু সেদিনের সেই অপরাহ্নের সঙ্গে আজকের এই অপরাহ্নটির কত তফাৎ! সেদিন সময় যেন ধীরে ধীরে চলছিল। যেন থেমে থেমে, জিরিয়ে জিরিয়ে চলছিল। কিন্তু আজ সে চলছে না-থেমে, না-জিরিয়ে আগের চেয়ে অনেক দ্রুততালে। আজ ইচ্ছে করলেও যেন সময়কে একটু থামিয়ে নিয়ে জিরোনোর আনন্দটুকু পাওয়া যায় না। আজ চলাটা যেন শুধুমাত্র চলার খাতিরেই, থেমে দাঁড়িয়ে জিরোবার খাতিরে নয়।

জিরোবার অবকাশ আমাদেরও ছিল না সেদিন। তাই সেদিন গোকর্ণেশ্বরের মন্দির ভালোভাবে দেখা হতে না হতেই সুন্দরী-জল-এর দিকে এগোলাম আমরা।

এগোলাম। কিন্তু সুন্দরীজলকে দেখলাম কতটুকু! কতটুকু

তার চিনলাম! দেখতে-না-দেখতেই চিনতে-না-চিনতেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। সুন্দরীজল-এর দিকে যে গতিতে এগোলাম আমরা, সন্ধ্যে এগিয়ে এল তার চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে। এবং সুন্দরী-জল-এর সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়টুকু শেষ হতে-না-হতেই মনে হল, কে যেন সকলের অলক্ষ্যে বসে এখানকার এই পাত্‌লা আঁধারকে জাল দিয়ে দিয়ে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করে তুলছে।

আঁধার গাঢ় হতে সময় লাগল। কিন্তু প্রথম-দর্শনেই নেপালের ঝরনা-তলা সুন্দরীজলকে ভালোবাসতে সময় লাগল না।

প্রথম-দর্শনের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, গোকর্ণবন থেকে বেরিয়ে খানিক দূর এগোতেই সুরম্য এক জঙ্গল-মহল অভ্যর্থনা করেছিল আমাদের। হঠাৎ আমাদের মনে হয়েছিল, আলো 'যাই যাই' বলবে বলে এই যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়েছে।

তখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম সুন্দরীজলকে। দেখছিলাম, অতি সুন্দর সব জলপ্রপাত যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। যেন স্ফটিকস্বচ্ছ সব ঝালরগুচ্ছ ওখানে রঙ্গরসের ইন্দ্রজাল বুনছে।

ইন্দ্রজাল কত যে আছে সুন্দরীজলে! আছে কত যে ঝালর-গুচ্ছ! আর ঝালর থেকে বেরিয়ে-আসা কত নির্ঝরিণী!

সুন্দরীজল এলাকায় নির্ঝরিণীদের ছোটাছুটি খেলা-পাগল শিশুদেরই ছোটাছুটি যেন। যেন পড়ন্ত আলোয় এক দঙ্গল শিশুর কলকাকলী।

শিশুদের গা ঘেঁষে পাহাড়ী ময়দানগুলো ঘন সবুজ গালিচা দিয়ে মোড়া।

কৃষির রাজসূয় আয়োজন ওখানে। তাই শস্যক্ষেত্র দিয়ে মোড়া ওরা।

শুনেছি, ওদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলে সুন্দরীজল পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছন যায়। এবং চূড়ায় পৌঁছনোর পথে নাকি জলপ্রপাতের স্পর্শ ও ঘন বনের সান্নিধ্য পাওয়া যায়।

শুধুমাত্র মন্দিরশীর্ষটি ধীরে ধীরে সরু ও অপ্রশস্ত হয়ে গিয়ে আকাশ-বরাবর উঠে গেল।

কিন্তু আকাশ কোথায়? খানিকদূর এগোতেই দেখি, আকাশকে মন্দির ঢেকে ফেলেছে। আর একতলার চক-মিলানো করিডোর আমাদের ঢাকবে বলে তৈরী।

করিডোরটিকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে বড়ো। বড়ো বিচিত্র মনে হচ্ছে। বর্গাকার বলে বিচিত্র নয় সে। স্তম্ভশোভিত বলেও নয়। বৈচিত্র্য ও অদ্ভুতত্ব তার সমগ্রতার মধ্যে, সমগ্র মন্দিরটিকে তার ধারণ করে থাকার মধ্যে।

হ্যাঁ, সত্যি; কৃষ্ণ-মন্দিরকে ধারণ করে আছে করিডোর। এমন করে আছে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে, আস্ত একটা রথ দেখছি। ভক্তরা এই বুঝি ওই রথকে টানতে শুরু করবে। রথযাত্রা উৎসব শুরু হবে বুঝি এইবার।

কিন্তু না, তেমন কোন উৎসব শুরু হয় না। রথ ঠিক তেমনি স্তব্ধ, গম্ভীর ও অচঞ্চল মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর আমরা ধীরে ধীরে এগোই তার দিকে।

ওদিকে শেঠজী অনেকদূর এগিয়েছেন। কৃষ্ণ-মন্দিরের পাথর ঘষে ঘষে কী যেন দেখছেন তিনি।

মনে পড়ে, দিব্যি নিশ্চিন্তেই উনি দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বাধা আসে। কৃষ্ণ-মন্দির এলাকার এক প্রহরী থামাতে চায় ওঁকে।

—হুজৌর। রীতিমতো মোলায়েম হয়ে প্রহরী শুধায়।

—ক্যা হুয়া? চিল্লাতে কিঁউ? শেঠজী নিজেই চিৎকার করে ওঠেন এইবার।

কিন্তু প্রহরী সেই একইরকম মোলায়েম। আগন্তুককে আবার সে বোঝাবার চেষ্টা করে, হুজৌর! হাত দেনা মৎ!

—কিঁউ? কিঁউ নেহি দেগা হাত? শেঠজীর সুর এবার

সপ্তমে। এবং এই সপ্তমে সুর চড়িয়েই তিনি যা বললেন, তার মানে দাঁড়ায় এইরকম,—এত দূর থেকে এসেছি। পয়সা খরচ করেছি এত; আর মন্দির-টন্দিরকে সামান্য একটু হাতিয়ে দেখব না?

ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, দেখুন যত খুশি। যত খুশি হাতান। কিন্তু মন্দিরের দেয়ালে খোদাই-করা ওই দৃশ্যগুলোতে হাত দেবেন না।

শেঠজী নিরুপায় হয়ে হাতটাকে সরিয়ে নিলেন এইবার এবং আমার দিকে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে শুধালেন, আপ কৌন্ হ্যাঁয়?

বললাম, তেমন খানদানী কেউ নই। সামান্যই একজন, ঠিক আপনার মতোই নেপাল দেখতে এসেছি।

—লেকিন দেখনে কা ফুরসৎ কুছ্ হ্যাঁয় ইধার? ইস চিড়িয়া কী মহল্লা মেঁ টুরিস্ট্ লোগো কে লিয়ে আরাম হ্যাঁয় কুছ্? বলেই গজ গজ করতে করতে তিনি চলে গেলেন। আর আমি নিশ্চিন্ত মনে দেখতে লাগলাম কৃষ্ণ-মন্দিরের গায়ে খোদাই-করা অপরূপ সেই দৃশ্যগুলো।

দৃশ্যগুলো অপরূপ সত্যি। সত্যি রামায়ণ-মহাভারতের অনেকগুলো অধ্যায় এখানে জীবন্ত।

শোনা যায়, সম্রাট সিদ্ধি নরসিংহ এই জীবন দেন কৃষ্ণ-মন্দিরকে। এবং এছাড়া, খোদ মন্দিরকেও তিনিই গড়ে তোলেন।

মন্দির গড়ে ওঠে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে। সম্রাটের নির্দেশেই গড়ে ওঠে।

ওদিকে সারা ললিতপুর জুড়ে গুন্ গুন্ করে অনেকেই, নির্দেশ না দিয়ে যে উপায় ছিল না তাঁর। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন!

—স্বপ্ন? কানাঘুঁষো পড়ে যায় চারিদিকে, কী স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা?

ওয়াকিবহালরা বুঝিয়ে দেন, রাজা দেখেছিলেন শ্রীরাধা আর

শ্রীকৃষ্ণকে। দেখেছিলেন, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এলেন ওঁরা। ললিতপুরের দরবার-এলাকার একেবারে সামনেই এলেন।

—সামনেই এলেন? বলো কী? তারপর, এসে কী করলেন ওঁরা?

—ওঁরা নাচলেন, গাইলেন; আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিলেন চারিদিক।

—কিন্তু কেন দিলেন? রাজার প্রতি এত দরদ কেন ঠাকুরের?

—হবে না দরদ! হবে না! রাজাও যে ঠাকুরের মতোই করুণাময় গো!

—হ্যাঁ, ঠিক কথা; সিদ্ধি নরসিংহ করুণাময়,—এমনকি শত্রুরাও স্বীকার করত। হামেশাই বলতে শোনা যেত ওদের, করুণাময় না হলে কেউ কি সারা দেশ জুড়ে মন্দির গড়ে? জলাধার, স্তূপ আর বিহার গড়ে যত্র-তত্র? কেউ কখনও বলে, রাজ্যে আমার একটিও তৃষ্ণার্ত থাকবে না?

--কী আশ্চর্য! রাজা বলেছিলেন বুঝি এইরকম? বলাবলি করত অনেকেই। অনেকেই আবার জবাব দিত, বলেছিলেন বৈকি! আলবাৎ বলেছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি বিপদ বেঁধেছিল রাজার নিজের তৃষ্ণা নিয়ে।

—নিজের তৃষ্ণা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিজের। সেই যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি দেখেছিলেন, সেই থেকে তৃষ্ণা তাঁর বেড়ে গেল। তিনি বললেন, মন্দির গড়তে হবে; কৃষ্ণ-মন্দির। কৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখেছি যেখানে, ঠিক সেখানেই গড়তে হবে।

শোনা যায়, মন্দির-গড়ার কাজ শুরু হল অচিরেই। অচিরেই হাজার শ্রমিকের কলকোলাহলে দরবার-এলাকা মুখরিত হল।

কিন্তু মন্দির-উদ্বোধনের দিনে এক বিপদ। কান্তিপুরের রাজা প্রতাপ মল্ল আক্রমণ করলেন ললিতপুর; এবং সিদ্ধি নরসিংহ

দেখলেন, সারি-বাঁধা পিঁপড়েরা যেমন, শত্রু-সৈন্যরাও ঠিক তেমনি কৃষ্ণ-মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে।

—সর্বনাশ! মাথায় হাত দিলেন সম্রাট। বললেন, দেবভূমি ললিতপুরকে কে বাঁচায় এখন?

উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোর্খাধিপতি দামর শাহ। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, যদি হুকুম পাই তো আমি বাঁচাই।

নিরুপায় সিদ্ধি নরসিংহ বললেন, হুকুম দেওয়া হল তবে।

দামর শাহ বললেন, আমাদেরও তবে যুদ্ধ শুরু হল।

যেই কথা সেই কাজ। দামর শাহ মুহূর্তের মধ্যে ঝড় হয়ে উঠলেন। ললিতপুরের সেনাপতি এবং সৈন্যদের তলব করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গিয়ে প্রতাপ মল্লের সৈন্যদলের ওপর।

শত্রু-সৈন্যরা কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল, জানা যায় না; কিন্তু কৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান ঠিক সেদিনই যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল, ললিতপুরের ইতিহাসে সে-কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

ইতিহাসে লেখা আছে আরও, রাজা সিদ্ধি নরসিংহ ঈশ্বর-প্রেমিক ছিলেন; এবং মন্দির-উদ্বোধন-দিনের এই ব্যাপারটাকে তিনি ঈশ্বরেরই করুণা বলে ধরে নিলেন।

—কিন্তু করুণাময়ের এই যে এত আশীর্বাদ পেলাম আমরা, এর বার্ষিকী হবে না? এই বিশেষ দিনটিতে উৎসব হবে না প্রতি বছর? রাজাকে একদিন বলতে শোনা গেল।

পারিষদ এবং প্রজারা সায় দিল সেদিনই, হবে সম্রাট। আপনি হুকুম দিলেই হবে।

—হুকুম? কথা শুনে অবাক হলেন সম্রাট। বললেন, হুকুম দেবার আমি কে? আসল হুকুম যিনি দেনেওয়ালা, তিনি তো তা দিয়েই রেখেছেন।

—দিয়ে রেখেছেন? রাজার কথা শুনে অবাক হয় পারিষদরা। প্রজারাও এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। রাজা বুঝিয়ে দেন,

হ্যাঁ, দিয়ে তো রেখেছেনই। সেই যে, কৃষ্ণ-মন্দির উদ্বোধন হল যেদিন, সেদিনই কি তাঁর হুকুম আমরা শুনতে পাইনি? সেদিন শত্রু-সৈন্যের পরাজয়ে ঈশ্বরের কি হাত ছিল না?

—ছিল সম্রাট। পাত্রমিত্ররা বলাবলি করে, ঈশ্বর সহায় না হলে সেদিন আমরা জয়ী হতাম না।

সম্রাট বললেন, ঠিক ঠিক। তাঁর সাহায্যেই সেদিন জয়ী হয়েছি। অতএব, সেই বিশেষ দিনটিকে প্রতি বছর আমরা স্মরণ করব।

সেই থেকে শুরু হল স্মরণ। কৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার বার্ষিকী-উৎসব সেই থেকে শুরু হল। রাজা কোটি হোম-যজ্ঞ করলেন। ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্র'দের সাহায্য করলেন অকাতরে।

ওদিকে কৃষ্ণ-মন্দিরের সামনে নাটক হল কত। কত কর্মীয় এবং সামাজিক নাটক দেখল ললিতপুরের লোকেরা! এবং ওই নাটক দেখতে দেখতেই একদিন—

একদিন সিদ্ধি নরসিংহ বললেন, ভুবন জুড়ে নাটকই চলছে যে! সবাই যে আমরা নাটকে অভিনয় করছি!

রাজার কথা শুনে পাত্রমিত্ররা স্তম্ভিত। সবাই বলল, নাটক! এ আবার কী কথা সম্রাট?

সম্রাট জবাব দিলেন না কিছু। কিন্তু একদিন ললিতপুরের শূন্য সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে সবাই এর জবাব পেল।

ব্যাপার কী? না, রাজা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন। তীর্থে গেছেন তিনি।

—তীর্থে গেছেন? কিন্তু কোন্ তীর্থে? প্রজারা জানতে চায়।

জবাব দিতে পারে না কেউ। সবাই বলে, জানি নে।

আজও ললিতপুরের ইতিহাস ঠিক এই একই কথা বলে, জানি নে। আর বলে, যে তীর্থেই তিনি যান না কেন, সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি।

কিন্তু রাজা ফিরে না এলে কী হবে। রাজার স্বপ্ন সেই কৃষ্ণ-মন্দির ঠিক তেমনি থাকে। ঠিক তেমনি মহিমা নিয়ে রাজা সিদ্ধি নরসিংহেরই গড়া প্রাসাদটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তরা আসে ঠিক তেমনিভাবে। আসে পর্যটকরা, আমাদের মতো ভবঘুরেরা।

এদিকে আমরা ঘুরতে ঘুরতে, দেখতে দেখতে, কৃষ্ণ-মন্দিরের দোতলায় উঠে আসি।

উঠে দেখি, ব্যাপার গুরুতর। দেখি, সেই শেঠজী এক জায়গায় বসে আছেন; এবং তাঁকে নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর অনুচরেরা।

ব্যাপার কী? শেঠজীর দিকে এগিয়ে যাই একবার। শুধাই, কী ব্যাপার? ক্যা হুয়া?

অনুচরদের একজন বুঝিয়ে দেন, জায়দা কুছ্ নঁহী বাবুজী; থোড়া। থোড়া সে উনকা তবিয়ৎ বিগড় গিয়া।

—কেন? কী হয়েছিল ওর?

—বিলাড্ প্রিসার বাবুজী!

—ব্লাড প্রেসার? কিন্তু প্রেসার নিয়ে এত দূরে আসাই বা কেন? আর কেনই বা এত করে খতিয়ে দেখা?

আমার এই শেষের কথাগুলো অনেকটা স্বগতোক্তির মতো শোনাল। কিন্তু যিনি বুঝবার তিনি দেখছি ঠিক বুঝে ফেলেছেন। শেঠজী এতক্ষণে তাঁর রক্তচক্ষু দুটিতে এক জোড়া অগ্নিগোলক সংহত করে তাকিয়েছেন আমার দিকে।

আমি ব্যাপার সুবিধের নয় ভেবে এবং যে কোনও মুহূর্তে অগ্নিবৃষ্টি হতে পারে আশঙ্কা করে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়লাম।

কিন্তু সরে যাবই বা কোথায়? ওদিকে সেই ক্যামেরাম্যান দোতলায় উঠে এসেছেন। আর ছবি তুলছেন একের পর এক।

কেমন একটা কৌতূহল হল আমার। এগিয়ে গিয়ে ওকে শুধালাম, ছবি অনেক তুলছেন দেখছি।

—হ্যাঁ, তুলছি।

—এত ছবি দিয়ে করেন কী আপনারা? দেশে গিয়ে দেখান?

—হ্যাঁ, দেখাই। তবে সব নয়, কিছু কিছু।

—দেশ কোথায় আপনার?

—ক্যানাডা।

—পেশা?

—কিছুই না বলতে গেলে। এইরকম করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই, আর ছবি তুলি।

—ছবি অনেক তুলেছেন নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, অনেক। তবে ভালো ছবি আরও চাই। দেশে খুব ডিম্যাণ্ড্ এগুলোর।

—দেশে, মানে তো ক্যানাডায়?

—হ্যাঁ, ক্যানাডায়। ওখানকার স্কুল-কলেজগুলোতে দেশ-বিদেশের এসব ছবি দেখিয়ে বেড়ানই আমার কাজ।

—কাজটা নতুন রকমের বলতে হবে!

—নতুন পুরাতন যা খুশি বলা যায়। কিন্তু আসল ব্যাপার কী জানেন! এসব ছবি দেখতে ছেলেমেয়েরা খুব ভালোবাসে।

ভালো তো বাসবেই। ঘরে বসে দূরের স্বাদ পেলে শুধু ছেলে-মেয়েরা কেন, ওদের মা-বাবারাও এগুলো ভালোবাসবেন।

ক্যামেরাম্যান কোন কথা বললেন না আর। নীরবে আমার স্তুতিটাকে হজম করে ছবি তোলায় মন দিলেন।

কিন্তু আমার মন চলে গেল সেই সুদূর ক্যানাডায়। সেখানে কৃষ্ণ-মন্দিরের ছবি দেখতে দেখতে বিস্মিত হয়ে-পড়া কিছু ছেলে-মেয়েকে দেখল। আর দেখল, রহস্যময় ললিতপুরের রাজ-দরবার-সাক্ষী এক দেব-দেউলের দিকে বিদেশী কিছু তরুণ বন্ধু পরম কৌতুকে

তাকিয়ে। দেউলের অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না ওরা; এবং বার বার ওরা ভাবছে, এমন রহস্যও থাকে কোথাও!

কিন্তু হায় রে দূরদেশী তরুণ-তরুণীরা! রহস্য যে আরও অনেক থাকে! তা যদি স্বচক্ষে দেখতে চাও তো ললিতপুরে এসো একবার। এসে একবার অন্ততঃ এই দরবার-মহল্লায় দাঁড়াও।

দাঁড়ালে দেখবে, প্যাগোডা-মন্দিরের মেলা এখানে। এখানকার রাজপ্রাসাদের গা ঘেঁষে চলে গেল যে প্রধান সড়কটি, তার দু'পাশে শুধু মন্দির আর মন্দির! বিষ্ণু-মন্দির কোনটি, কোনটি আবার শিব-মন্দির; হিন্দু-মন্দির কোনটি, কোনটি আবার বৌদ্ধ-মন্দির। কোন কোনটিতে আবার হিন্দু-বৌদ্ধ একাকার, বিষ্ণু-কৃষ্ণ মিলোমিশে একাত্ম।

এছাড়া স্তম্ভ কত এখানে! কত স্ট্যাচু! ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু কোনটি। কোনটি আবার সোনার।

রাজা যোগ নরেন্দ্র মল্ল সোনা হয়ে আছেন। রাজপ্রাসাদের ঠিক সামনেই পাথরে-গড়া এক স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তাঁকে দেখতে পাই আজও। দেখি সেই প্রাসাদটিকে।

আশ্চর্য এক প্রাসাদ। ডালপালা সমেত বিরাট এক অশ্বত্থের মতো যেন। কত যে তার শাখা-প্রশাখা, কত ডালপালা, কত দিক দিয়ে যে গজিয়ে-ওঠা তার সারি সারি অজস্র কুঠুরি, অনেকক্ষণ ঘুরেও হদিস পাইনি তার।

কিন্তু মূর্তিমান সেই মহাকায়কে সেদিন দেখেছিলাম ঠিকই। পাঁচতলা উঁচু সেই রহস্যময়কে ঠিকই সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

কত অলিন্দ সেই রহস্যপুরীতে! বারান্দা কত! কত স্তম্ভ!

স্তম্ভগুলোর অধিকাংশই আছে বাঁধানো সব উঠোনের গা ঘেঁষে। উঠোনও আবার আছে অনেক।

হ্যাঁ, অনেক উঠোন, অনেক স্তম্ভ আছে ওখানে। আছে দেবমূর্তি এবং দেব-দর্শনের উপযোগী অনেক গ্যালারী।

এছাড়া দেওয়ালের গায়ে গায়ে ভাস্কর্য আছে কত। কারুকার্যের কত ওখানে ছড়াছড়ি। কাঠের গায়ে কারুকার্য। কারুকার্য সোনার গায়ে।

সোনা না চাইতেই ওখানে আলো ছড়ায়। হারানো ললিতপুর নিত্য জেগে থাকে ওখানে।

কিন্তু ওখানে জেগে থাকে, আর মহাবুদ্ধ-মন্দিরে থাকে না? সেই যে অপরূপ ও অবিস্মরণীয় এক মন্দির, যার প্রতিটি পাথরে একটি করে বুদ্ধ মূর্তি খোদিত, সেখানে থাকে না?

লোকে বলে, থাকে। সেখানেও জেগে থাকে হারানো ললিতপুর। কিন্তু সেখানে সে যেন হারানো দিনের কিছু দুঃস্বপ্ন নিয়ে জাগে।

·· কিন্তু দুঃস্বপ্ন কিসের আবার? যে মন্দিরে হাজার হাজার বুদ্ধ-মূর্তি আশীর্বাদ বিলোচ্ছেন, সেখানেও দুঃস্বপ্ন? পর্যটক ও তীর্থযাত্রীরা প্রশ্ন তোলেন মাঝে মাঝে।

স্থানীয়েরা বুঝিয়ে দেয়, হ্যাঁ, দুঃস্বপ্নই বটে। মহাবুদ্ধ-মন্দিরের স্থাপয়িতা সদাশিব দেবের কথা ভেবে আজও বটে আঁতকে ওঠে সারা ললিতপুর।

—কিন্তু কেন আঁতকে ওঠে? দূরাগতদের কৌতূহল আকাশছোঁয়া।

ওদিকে স্থানীয়েরা গুন্ গুন্ করে ওঠে; তার কারণ, যে পাপ সদাশিব দেব করেছেন, হাজার বুদ্ধের আশীর্বাদেও বুঝি তা খণ্ডিত হয় না।

—কিন্তু এমন কী করেছেন তিনি?

—তিনি পিশাচের কাজ করেছেন। কারও ক্ষেতে ভাল ফসল হয়েছে শুনলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন। কারও ঘরে সুন্দরী মেয়ে থাকলে চর লেলিয়ে দিয়েছেন। ঘোড়া তছ্‌নছ্‌ করেছে শস্যক্ষেত্র; আর চর লুণ্ঠন করেছে সুন্দরীকে।·····কিন্তু সব কিছুরই একটা

সীমা থাকা উচিত। অশান্ত ললিতপুর বিদ্রোহী হয়ে উঠল একদিন। বলল, হ্যাঁ, সীমা থাকা উচিত।

রাজা সদাশিব দেব অবাক হয়ে বললেন, কিসের সীমা? এ রাজ্যের সব কিছুই তো আমার। অতএব, সীমার প্রশ্ন কেন আবার?

প্রজারা বলল, আবার কেন? আপনাকে সিংহাসন থেকে তাড়ান হবে বলে।

—কী! এত বড় স্পর্ধা! রাজা খেপে উঠলেন এইবার।

কিন্তু প্রজারা অনেক আগে থেকেই খেপে ছিল। অতএব রাজা-প্রজায় যুদ্ধটা জমল ভাল; এবং রাজাকে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে হল।

পরাজিত সদাশিব দেব এবার আশ্রয় নিলেন ভক্তপুরে। কিন্তু ওখানেও বিদ্রোহীরা অনুসরণ করল তাঁকে। মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত তাঁকে বন্দী করে রাখল।

শোনা যায়, বন্দী রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন এক একসময়। বলতেন, কান্না শুনতে পাচ্ছি।

—কিসের কান্না সম্রাট? প্রহরীরা শুধোত।

সম্রাট বলতেন, সুন্দরীদের।

—কিন্তু সুন্দরী তো এখানে নেই কেউ?

—এখানে নেই, কিন্তু ললিতপুরে আছে। ললিতপুরেই থাকত সব। এবং তারপর আমার চররা গিয়ে ওদের ছিনিয়ে নিয়ে আসত। ওরা তখন কাঁদত খুব। খুব কাঁদত।

—ও কি! আবার কে কাঁদে? মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে কাঁদে কে? বলতে গিয়ে রাজা নিজেই এক একদিন শিশুর মতো কেঁদে উঠতেন।

প্রহরীরা বলত, হঠাৎ হল কী রাজা-বাহাদুরের? কাঁদছেন কেন?

রাজা-বাহাদুর বলতেন, আমার ঘোড়াগুলো ছুটছে যে! সব ফসল যে তছ্‌নছ্‌ করে দিচ্ছে!

লোকে বলে, রাজা-বাহাদুরের শেষ দিনটি অবধি ঘোড়া ঠিক এমনি করেই ছুটল। সুন্দরীদের কান্নাও ঠিক এমনি করেই শোনা গেল অহরহ। এবং তারপর একদিন রাজা বললেন, কিছুই যে শুনতে পাচ্ছি না আর! কিছুই যে আর দেখতে পাচ্ছি না!

প্রহরীরা বলল, বুদ্ধের নাম করুন সম্রাট। মহাবুদ্ধ-মন্দিরকে স্মরণ করুন।

সম্রাট স্মরণ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু মহাবুদ্ধ-মন্দির যে তাঁর আমলেই গড়ে উঠেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী।

স্থানীয়দের কেউ কেউ অবিশ্যি ভিন্ন কথাও বলে। ওরা বলে, দূর দূর! পাগলা সদাশিব দেব গড়বেন মন্দির!...এই মন্দির আসলে গড়েছেন অভয়রাজ নামে এক পুরোহিত। এখানে, এই ললিতপুরেই থাকতেন তিনি; এবং তিনি ছিলেন সদাশিব দেবের ঠিক উল্টো।

জানি নে এসব কিছুর সত্যি-মিথ্যে।...উল্টো-সোজার সবই আজ নিরুদ্দেশের যাত্রী। তবে হ্যাঁ, মহাবুদ্ধ মন্দিরটিকে আজও জানি বৈকি! জানি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে এর; এবং এর অপরূপ স্থাপত্য হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান-মুসলমান নির্বিশেষে যে কোন ধর্মাবলম্বীকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করবার ক্ষমতা রাখে।

বলতে কী, স্তম্ভিত আমরাও হয়েছিলাম। সেই মহা-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার ভেবেছিলাম, এ-ও সম্ভব? হিন্দু-স্থাপত্যকে আশ্রয় করে বৌদ্ধ-অনুশাসনের জয়গান সম্ভব এমনভাবে?

হ্যাঁ, পুরোপুরিই বৌদ্ধতীর্থ সেটা; ষোল আনাই সেটা বৌদ্ধ-মন্দির। কিন্তু সে-মন্দির গড়ে উঠেছে পুরোপুরি হিন্দুমতে; হিন্দুদের যুগযুগান্ত-প্রাচীন টেরাকট্যার ছাঁদে।

আর এছাড়া, মহাবুদ্ধ-মন্দিরকে দেখলেই হিন্দুদের মঠের কথা

মনে আসে যেন। মনে হয়, অতি সুন্দর একটা মঠ দোতলা-প্রমাণ উঁচু সুদৃশ্য এক বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে।

বেদীটি নেপাল-স্থাপত্যের এক অনুপম নিদর্শন। তার গায়ে শোভিত অসংখ্য বুদ্ধ-মূর্তি, তার দোতলার চার কোণে গড়ে-তোলা চারটি ছোট ছোট মঠ, এবং এসব কিছুর চেয়েও বড় কথা, তার নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন গঠন-পারিপাট্য শ্রদ্ধায় আর বিস্ময়ে অভিভূত করে দিল আমাকে। আমার মনে হল, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে কলা-নৈপুণ্যের, শিল্পের সঙ্গে স্থাপত্যের এমন অদ্ভুত মিল খুব কম দেখেছি।

মিল যেন সে-মন্দিরের সর্বত্র। সর্বত্রই যেন সেখানে সুপরিকল্পনার ছাপ।

বেদীটির একতলায় প্রধান প্রবেশ-পথটিকে ঘিরে দেওয়ালের গায়ে শোভা পাচ্ছে যে চারটি বুদ্ধ-মূর্তি, সুপরিকল্পনার বিজয়-বৈজয়ন্তী সেখান থেকেও উচ্চারিত যেন।

সেখানে উচ্চারিত, উচ্চারিত সে-মন্দিরের সবখানে।

প্রধান প্রবেশ-পথের দু'ধারে দু'সারি করে বুদ্ধ-মূর্তি আছে। এবং প্রতিটি সারিতে বুদ্ধ আছেন বারোটি করে।

বুদ্ধ এই বেদীতে আছেন। আবার আছেন উঁচু-হয়ে যাওয়া মঠটির গায়ে গায়ে।

ভূমি থেকে শুরু করে মোট ছ'তলা প্রমাণ উঁচু ওই মঠটি। তার প্রতিটি তলাতেই দরজা আছে একটি করে। আর বুদ্ধ-মূর্তি আছে অনেক, অজস্র।

হ্যাঁ, মহাবুদ্ধ নামটি সার্থক। সেদিন ললিতপুরের বুদ্ধ-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবি একবার।

সেদিন ভাবি, এককে অনেক করে দেখার প্রয়াস এখানে। সত্যকে এখানে ছড়িয়ে দেখাবার আয়োজন।

—কিন্তু এমন আয়োজনে লাভ? মন্দির-প্রাঙ্গণে এক শ্রমণকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম।

তবে এখনও তিনি বেঁচে আছেন তো? না কি ধরে ধরে সব কিছু পরখ করতে গিয়ে এতক্ষণে তিনি নিজেই অধরা হয়ে গেছেন?

অধরা সবাই-ই তো হয়! ললিতপুরের এতবড় সম্রাট ভাস্কর বর্মাও তো কবে অধরা হয়ে গেছেন!

অথচ কত স্বপ্ন ছিল সম্রাটের! বিহার গড়ার স্বপ্ন। আপন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও অমর করার স্বপ্ন। হিরণ্য-বর্ণ এই মহাবিহারটিকেও তো তিনিই গড়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ঠিক এমনি এক দুপুরে নিশ্চয় তিনি অমরত্বের দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এই বুদ্ধ-মূর্তির সামনে; এবং নিশ্চয় তিনিও বুঝেছিলেন।—মা গৃধ্নু! লোভ করো না!

কিন্তু এই অমরত্বের দাবিটাই যে লোভ, বেচারী ভাস্কর বর্মা তা কি একটিবারের জন্যেও বুঝেছিলেন?

বোঝেননি বোধ করি। আমরা কেউ-ই বোধ করি বুঝি না; এবং সবাই আমরা হিরণ্য-বর্ণের চত্বরে ভাস্কর বর্মার মতো বিরাট এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান করি।

হ্যাঁ, প্রবেশ আর প্রস্থান। প্রস্থান আর প্রবেশ। ললিতপুর দর্শনে এসেও এই একই ফর্মুলার রকমফের করি আমরা। এবার হিরণ্য-বর্ণ-মহাবিহার থেকে প্রস্থান করে মচ্ছেন্দ্রনাথ-মন্দিরে প্রবেশ করি।

মচ্ছেন্দ্র-মন্দিরটি বিরাট। তিনতলা এক প্যাগোডা এটি। প্যাগেডোর ঠিক সামনেই স্তম্ভের ওপর বসে আছে ব্রোঞ্জে-গড়া সারি সারি জীবজন্তু। মচ্ছেন্দ্র-মন্দিরের প্রধান প্রবেশ-পথটির দিকে মুখ করে বসে আছে ওরা।

হ্যাঁ, ওরা আছে মচ্ছেন্দ্র-মন্দিরে; আর আছেন স্বয়ং মচ্ছেন্দ্রনাথ।

মচ্ছেন্দ্র-দেবতার মূর্তিটি লাল্‌চে। শোনা যায়, লাল কাঠ দিয়েই

নাকি গড়া হয়েছিল ওটি। ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে গড়া হয়েছিল। মূল মন্দিরও নাকি ঠিক ওই একই সময়ে গড়ে ওঠে।

জানি নে, গড়ে উঠবে হয়তো। মচ্ছেন্দ্র-মন্দিরের সীলিঙ-এ মার্বেল-পাথরের গায়ে যে নক্‌শাগুলো দেখছি, সেগুলোও হয়তো ও-যুগেই গড়ে উঠবে।

কিন্তু যুগ নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় এখানে! এখানে যারা আসে, তারা যুগজয়ী রাজ-রাজেশ্বর মচ্ছেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতেই আসে।

শোনা যায়, হিন্দুরা যেমন, বৌদ্ধরাও তেমনি যুগে যুগে আসে এখানে। এ হল হিন্দু-বৌদ্ধের মিলন-তীর্থ। হিন্দুরা মনে করেন, নাথপন্থদের প্রধান এই মচ্ছেন্দ্রনাথ; আবার বৌদ্ধদের ধারণা, এই একই মচ্ছেন্দ্রনাথ হলেন অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বুদ্ধের প্রতিমূর্তি।

মচ্ছেন্দ্রনাথ কিভাবে অবলোকিতেশ্বর বা লোকেশ্বর হলেন নেপালে, তা নিয়ে অতি সুন্দর একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

সেখানে পাই, অবলোকিতেশ্বর বা লোকেশ্বরই আসলে বোধিসত্ত্ব। এই বোধিসত্ত্ব ছিলেন এক যোগী; এবং যোগ অভ্যাস করতেই তিনি কাঠমাণ্ডু-উপত্যকায় আসেন। উপত্যকার প্রান্তবর্তী এক পর্বত কামনাতে আশ্রয় নেন তিনি।

কিন্তু কামনাতে অন্য এক যোগীরও অধিষ্ঠান তখন; এবং সেই যোগী আর কেউ নন, স্বয়ং শিব।

শিবকে যোগ শিক্ষা দিলেন লোকেশ্বর। বুঝিয়ে দিলেন, কেমন করে পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হতে হয়।

শিব ঘরে ফেরার উদ্যোগ করেন এবার; এবং ফিরবার পথে পার্বতীর কাছে বলতে থাকেন তাঁর নবলব্ধ এই শিক্ষার কথা।

লোকেশ্বর ভাবলেন, শিষ্য কী বলছে, শোনা যাক। কতটুকু

শিখেছে সে যাচাই করা যাক। এবং এইভাবে যাচাই করবেন বলেই তিনি মৎস্যের রূপ ধরলেন। আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনতে লাগলেন।

এদিকে শিবের কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছেন পার্বতী। কিন্তু শিবের হুঁস নেই। নতুন অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলে চলেছেন অনর্গল।

বলতে বলতে অনেকক্ষণ বাদে তাঁর হুঁস হল। হঠাৎ মনে হল তাঁর, তাই তো! কাকে বলছি আমি! পার্বতী তো ঘুমে একেবারে অচেতন!

কিন্তু চেতন কেউ ধারে-কাছেই রয়েছে। একবার ভাবলেন শিব, যেন কেউ শুনছে তাঁর কথা!

—কিন্তু কে শুনছে? গর্জন করে উঠলেন শিব। বজ্রকণ্ঠে বললেন, কে ওখানে? আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শুনছে? সাহস থাকে তো বেরিয়ে এসো!

কেউ কিন্তু বেরিয়ে এল না। অগত্যা শিব ভয় দেখালেন, মনে রেখো! লুকোচুরি খেললে অভিশাপ দেব আমি। দারুণ অভিশাপ।

এইবার লোকেশ্বর বেরিয়ে এলেন। বজ্রপাণি বোধিসত্ত্ব নিজ মূর্তিতে অভির্ভূত হলেন।

শিব তো গুরুকে দেখে স্তম্ভিত; প্রভু আপনি! কাঁপতে কাঁপতে বললেন তিনি।

প্রভু বললেন, হ্যাঁ, আমি। আমিই মচ্ছেন্দ্র, আমিই লোকেশ্বর, আবার আমিই বোধিসত্ত্ব।

শিব বললেন, আমায় ক্ষমা করুন প্রভু। না জেনে আপনাকে কটূ কথা বলেছি।

কিন্তু প্রভু দেখতে দেখতে সব কথার বাইরে চলে গেলেন। মচ্ছেন্দ্রনাথের রূপ ধরে কামনী পর্বতে আবার আশ্রয় নিলেন তিনি।

লোকে বলে, সেই প্রভু, সেই লোকেশ্বর, সেই মচ্ছেন্দ্রনাথই ললিতপুরের অধিদেবতা আজও।

আজও প্রতি বোশেখে মচ্ছেন্দ্র-রথযাত্রা উৎসব হয় এখানে। পুরো একমাস ধরে হয়। ভক্তরা আসে দূর-দূরান্তর থেকে। আর এদিকে রথও গড়ে ওঠে বিরাট আকারের।

শুনেছি, প্রায় ৭০ ফুট উঁচু হয় নাকি সেই রথ। এবং তার চাকাগুলো নাকি হয় একতলা প্রমাণ উঁচু।

অধিদেবতা মচ্ছেন্দ্রনাথকে ধুমধাম সহকারে এনে সেই রথে বসানো হয়। আর ভক্তদের কলকোলাহলে দেখতে দেখতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস।

শত শত, হাজার হাজার ভক্ত আসে এখানে। ওরা কেউ রথ টানে, কেউ গায় গান ; কেউ ড্রাম বাজায়, কেউ বাজায় শঙ্খ। কেউ নাচতে নাচতে চলে, কেউ আবার চলে মিছিল করে। চলার আর বিরাম থাকে না যেন। নাচগান যেন আর থামতে চায় না।

নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে ললিতপুরের সুন্দরী মেয়েরা হঠাৎ যেন খরস্রোতা ঝরনা হয়ে ওঠে ; আর পুরোহিতরা হয়ে ওঠেন যন্ত্র। এক একটি মন্ত্র বার বার করে উচ্চারণ করেন ওঁরা, একই তালে বার বার ওঁরা ঘণ্টা বাজান।

মনে পড়ে, ঘণ্টাধ্বনি সেদিনও শুনেছিলাম বটে। মচ্ছেন্দ্র-মন্দির থেকে ফিরে আসার সময় সেদিনও স্পষ্ট কানে এসেছিল, ঢং ঢং ঢং ঢং।

ভাবলাম, কে বাজায় এমন করে? কোন পুরোহিত? না, কি কোন ভক্ত? কে এমন একটানা বাজিয়ে রথযাত্রার দিনটিতে ফিরে যেতে চায়?

এদিকে ঘণ্টাধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে ক্রমেই। ক্রমেই আমরা সরু ও অপ্রশস্ত একটা শান-বাঁধানো পথ ধরে মীননাথ-মন্দিরের দিকে এগোই।

বেশিদূর এগোতে হয় না আমাদের। বলতে গেলে, মচ্ছেন্দ্র-মন্দিরের প্রায় উল্টোদিকেই চোখে পড়ে মীননাথ।

কিন্তু মীননাথকে তাকিয়ে দেখার সুযোগ সেদিন ছিল না। বেলা পড়ে আসছিল বলে দুই ছাদওলা অপরূপ সেই প্যাগোডা-মন্দিরটিকে দূর থেকে দেখেই বিদায় নিতে হয়েছিল।

কিন্তু অমন করে বিদায় নেওয়াটা ঠিক হয়নি,—আজ ভাবি। আজ বার বার মনে হয়, সপ্তম শতাব্দীতে উদিত হওয়া নেপালের মধ্যাহ্ন-সূর্য সম্রাট অংশুবর্মার ওই অনন্যসাধারণ কীর্তিটিকে সেদিন ভালো করে দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

সেদিন উচিত ছিল আরও কত কী! ওই শেঠজীর কাছেও একবার যাওয়া উচিত ছিল বোধ হয়!

শেঠজী কেমন আছেন, কে জানে! ললিতপুরের বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে কাঠমাণ্ডু-গামী গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভাবছিলাম। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন ওই ক্যামেরাম্যান।

—শেঠজী ইজ নো মোর! বলতে বলতে আমাকে মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা খাদে ঠেলে দিলেন তিনি।

—নো মোর! আমার গলা দিয়ে বিকৃত এক টুকরো আওয়াজ বেরুল। ক্যামেরাম্যান বললেন, দরবার স্কোয়ার হয়ে ফিরে আসার সময় হঠাৎ দেখলাম ওকে। দেখলাম, ওর অসাড় দেহটা কৃষ্ণ-মন্দিরের সামনেই শোয়ানো আছে এখনও। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও কৃষ্ণ-মন্দিরকে ব্যাক-গ্রাউণ্ড করে ওর ছবি নিয়েছি আমি।

এই অবধি বলে একটু থামলেন ক্যামেরাম্যান। হাঁপাতে লাগলেন যেন। এবং তারপর আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে মিনতির সুরে বললেন, আপনাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে!

শুধালাম, বলুন, কী অনুরোধ?

—এই মুভি ক্যামেরাটা দিয়ে আমার ছবি তুলতে হবে আপনাকে। ললিতপুরকে ব্যাক-গ্রাউণ্ড করে দাঁড়িয়ে আছি আমি। শেঠজীর জন্যে আমি প্রার্থনা করছি, এই ছবি।

—কিন্তু ছবি তুলতে যে আমি জানি না!

—ও কিছু নয়। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

দেখিয়ে দিলেন তিনি। আমিও ছবি তুললাম।

—কিন্তু এই ছবি দিয়ে কী করবেন আপনি? ওকে শুধালাম একবার।

উনি বললেন, দেশে গিয়ে সবাইকে দেখাব। এবং এই মৃত্যু ও এই প্রার্থনার ছবিটাই হবে আমার নেপাল-ট্যুর-এর সবচেয়ে জীবন্ত ছবি। কেননা, আমি মনে করি ট্যুর মানে শুধু মন্দির আর বিহার দেখা নয়, মানুষ দেখাও বটে। মানুষের······

আরও কী সব যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই কথাগুলো আর কানে এল না। কাঠমাণ্ডুর বাস এসে গেল তার আগেই।

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। এবং বাস যখন তীরের বেগে ছুটল, যখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল, তখন বার বার মনে হল আমার, ভরা-শীতে মধ্য-হিমালয়ের পপলার পাতা হয়ে একটু আগেই একটা জীবন ঝরে পড়ল।

আট

ললিতপুরে জীবন ঝরে পড়তে দেখি। আর রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে দেখি নতুন আর এক জীবনকে। দেখি, ওখানকার ছত্রপটি যেন নিশ্চিন্ত-নিরুপদ্রব জীবনের প্রতীক।

দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে গোটা মহল্লাটা। যেন একটা শিবির গড়ে তুলে নিশ্চিন্তে জীবন-যুদ্ধ চালাচ্ছে।

এদিকে যুদ্ধ চালাই বটে আমরাও। ছত্রপটি আমাদেরও শিবির। সারাদিনের ধকলের পর একটু এসে জিরিয়ে নিই ওখানে। চাঙ্গা হয়ে উঠি। এবং তারপরই নতুন করে বেরিয়ে পড়ি আবার।

বেরোলাম পরদিনও। সকালেই বেরোলাম। শহর কাঠমাণ্ডুকে পেছনে ফেলে আবার ছুটলাম নতুনের সন্ধানে।

এবারের নতুনটি পাত্তান বা ললিতপুরের মতো পুরনো রাজধানী নয়, গিরি-কন্দরের আড়ালে রহস্যঘেরা অরণ্যপুরীও নয়, নেহাৎই একটি ফুল-বাগিচা, বালাজু-পার্ক—যার কেতাবী নাম 'বালাজু ওয়াটার গার্ডেন'।

কাঠমাণ্ডুতে থাকার সময় ওই গার্ডেনটির কথা অনেক শুনেছি।

কয়ালবাবু বলতেন, ওখানে যেতে নেই মশাই। যেতে নেই। ল্যাংটো হয়ে হিপ্পিরা সব ওখানে সাঁতার কাটে।

প্রদীপবাবু সায় দিতেন, তা কাটে। 'সুইমিং-পুল'-এর জন্যে যখনই মন কেমন করে হিপ্পিদের, তখনই ওরা ছোটে বালাজুতে।

—তাহলে আমাদের আর ওদিকে ছুটে কাজ নেই। বলতেন প্রদীপবাবুর স্ত্রী শুভ্রা। স্পষ্ট লক্ষ্য করতাম, বলবার সময় তাঁর মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠত। কিন্তু তবু বলতেন তিনি। বালাজুর কথা উঠলেই বেঁকে দাঁড়াতেন।

কিন্তু প্রদীপবাবু নাছোড়বান্দা। তাঁর ধারণা, বালাজু না দেখলে আজকের কাঠমাণ্ডুকে নাকি দেখা হয় না। অতএব, যেমন করে হোক, অন্তত: একটি বারের জন্যেও তাকে দেখা চাই।

—বেশ, দেখব! প্রদীপবাবুর কথায় সায় দিলাম শেষ অবধি। ললিতপুর দেখে আসার পরদিনই পা বাড়ালাম বালাজুর পথে।

পথটা পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম। ছত্রপটিকে ছাড়িয়ে সদলবলে ওখানে পৌঁছুতে সময় লাগল না। দীর্ঘ দেড় মাইল পথ দেখতে দেখতে যেন পেরিয়ে গেল।

সকাল আটটা নাগাদ বালাজুর সিংহদ্বারে দাঁড়ালাম এসে। আর ওদিকে শরৎ-সকালও রুপোলী রোদ গায়ে মেখে আমাদের একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে ঝলমল করে উঠল চারিদিক।

পুবদিকে খুব কাছেই ছিল এক পর্বতশ্রেণী। অরণ্য সেখানে ঘন সবুজ কোথাও, কোথাও আবার কাল্‌চে। কিন্তু সামনেই ছিল যে বালাজু-পার্ক, ঘন সবুজের সমারোহ কালোর ছিটেফোঁটাও বুলোয়নি তাতে; কোথাও তাকে কাল্‌চে মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে, ফুল-কাটা সবুজ শাড়ি পরে সুন্দরী এক নেপাল-বধূ বুঝি; বধূটি বুঝি প্রিয়-সমাগমের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু প্রিয়রা কই? বালাজুর এই ফোটা-ফুলের মহোৎসবে লোক কই তেমন? ভাবি সেদিন আকাশ-পাতাল। বার বার সেদিন মনে হয়, লোক বলতে শুধু বুঝি আমরাই। প্রিয়-সমাগম বলতে শুধু বুঝি আমাদেরই সমাগম। আমরা তাই ধীরে-সুস্থে পথ চলি। বালাজুর প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রহরী ফুল-বাগিচার সেলাম কুড়োতে কুড়োতে এগোই। খানিকদূর এগোতেই চোখে পড়ে অপরূপ এক বিষ্ণু-মূর্তি।

মূর্তিটি পাথরের। পাথর কেটে গড়া কয়েকটি সাপের ওপর তা শায়িত।

সাপগুলো আছে ছোট্ট এক জলাশয়ের মাঝখানে—কুণ্ডলী পাকিয়ে। আর জলাশয়টি আছে ধীরে-বহা এক পাহাড়ী ঝরনার দাক্ষিণ্যে সঞ্জীবিত হয়ে।

জলাশয়কে প্রদক্ষিণ করি আমরা। বার বার বিষ্ণু-মূর্তির দিকে তাকাই।

মূর্তিটি বড় নয় খুব একটা, বড় জোর ফুট দশেক হবে। কিন্তু তার আসল গুরুত্বকে মাপতে গেলে বুঝি এই গজ-ফুটে আর কুলোয় না; ইতিহাস ও পুরাণ-কিংবদন্তীর রথে চেপে পিছিয়ে যেতে হয় কয়েক শো বছর।

কিংবদন্তী প্রতাপ মল্লের কথা বলে। বলে, সপ্তদশ শতাব্দীর এক পরাক্রান্ত কাঠমাণ্ডু-সম্রাটের কথা।

এই প্রতাপ মল্লের আমল থেকেই নিয়ম হল, কাঠমাণ্ডুর সম্রাটরা বুদ্ধনীলকণ্ঠ-দর্শনে যাবেন না, যাবেন বালাজুর এই বিষ্ণু-দর্শনে। বুদ্ধনীলকণ্ঠ আছেন শিউপুরী পর্বতে, রাজধানী থেকে মাইল সাতেক দূরবর্তী এক বনস্থলীতে। ওখানে শায়িত আছেন তিনি। বিষ্ণু-নারায়ণের মূর্তিতে অনন্ত শেষনাগের ওপরে তিনি অনন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন।

ওখানেও জলাশয় চোখে পড়বে একটি; কিন্তু কোনদিন চোখে পড়বে না কাঠমাণ্ডুর কোন সম্রাটকে।

কেন চোখে পড়বে না?

লোকে বলে, পড়বে না, তার কারণ, রাজা নিজেই যে বিষ্ণু। তিনি আবার বিষ্ণুর কাছে যাবেন কী করে? দুই বিষ্ণু-দেবতায় মুখোমুখি হবেন কি করে?

—তাই তো! কী করে হবেন মুখোমুখি! বলতে বলতে সপ্তদশ শতাব্দীর নেপালও একদিন মাথায় হাত দিয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত এ-সমস্যার সমাধান হয়েছিল বালাজুতে বুদ্ধনীলকণ্ঠের অনুরূপ এই বিষ্ণু-মূর্তিটি নির্মাণ করে।

সেই থেকে এই মূর্তিটিকে দর্শন করেন রাজা। শিউপুরীর বদলে বালাজুতে এসে বিষ্ণু-প্রণাম করেন।

প্রণাম করি আমরাও। কিংবদন্তীর রথে চেপে প্রতাপ মল্লের আমল থেকে দীর্ঘ তিনশোটা বছর দেখতে দেখতে পেরিয়ে আসি। এবার বালাজু উদ্যানের ভিতর দিকে এগোই আমরা। মকর-মুখো বাইশটি ধারার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দাঁড়াতেই জলের অদ্ভুত একটা কলতান কানে আসে। চোখে পড়ে, জলের সবগুলো ধারা মিলিত হয়ে নিচের কয়েকটা জলাশয়ে পড়ছে।

জলাশয়গুলোর মধ্যে একটি হল 'সুইমিং-পুল'। হাল আমলের কায়দায় সেটা তৈরী। কিন্তু সেই কায়দা পরে দেখব ভেবে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোই। নাগার্জুন পর্বতের গা বেয়ে সন্তর্পণে ওপরে উঠি।

অপ্রশস্ত আঁকাবাঁকা একটা পথ ধীরে ধীরে পর্বতশীর্ষের দিকে পৌঁছে দেয় আমাদের।

কিন্তু কোথায় শীর্ষ? বালাজু-পার্কের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখি, শীর্ষ তখনও অনেক দূরে। তখনও নাগার্জুন পর্বতের গায়ে গায়ে মিছিল হয়ে-ওঠা পাইন আর ফার-এর নাগাল পেতে হলে অনেকটা পথ যেতে হবে।

এদিকে পথ যে ফুরিয়ে এল। বালাজু-পার্ক গড়ে উঠেছে নাগার্জুনের যে গিরি-শিরাটির গায়ে গায়ে, তা যে শেষ হয়ে এল হঠাৎ।

ভাবলাম, হঠাৎ এখন তবে কোন পথে যাই?

—যাই না কোথাও, মন বলল, এখানেই বসে থাকি।

বসে থাকার কথাটা সহযাত্রীদের বলতেই ওঁরা রাজী হয়ে গেলেন। সুন্দর একটি জায়গা বেছে নিয়ে সবাই বসলাম আমরা।

জায়গাটি আসলে ছিল পিকনিক পার্টির জন্যে গড়া। সেই

জায়গার আসন, আচ্ছাদন, জলাধার সব কিছুই পিকনিক-এর দিকে তাকিয়ে গড়া হয়েছিল।

—কিন্তু আমরা তো পিকনিক করছি না। হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন সহযাত্রী প্রদীপ চৌধুরী। বললেন, আমরা খাচ্ছিও না ভালমন্দ! অতএব আমরা এখানে কেন?

প্রদীপবাবুর স্ত্রী শুভ্রা চৌধুরী বললেন, ঠিক কথা। কেন আমরা এখানে? তার চেয়ে সামনের ওই খোলা জায়গাটাতে গিয়ে বসি চলুন! আলো-হাওয়া বেশি পাওয়া যাবে, আর পিকনিকের শোকও ভোলা যাবে।

—তথাস্তু! বলে সবাই মিলে গিয়ে খোলা জায়গাতে বসলাম।

বেঞ্চ ওখানে পাতাই ছিল; তাই বসতে কষ্ট হল না কিছু।

কষ্ট হল উঠতে। যতবার উঠতে যাই, দেখি, হয় প্রতিবেশী গিরিশিরাটা হাতছানি দিচ্ছে, আর না হয় আশেপাশের মিষ্টি মাতাল আরণ্যক পরিবেশ ভুলিয়ে রাখার গান গাইছে।

সেদিন ভুলিয়ে অনেকক্ষণই রেখেছিল নাগার্জুন পর্বত। অনেকক্ষণ ধরেই অদ্ভুত আশ্চর্য এক প্রাকৃত মায়াজালে আমাদের বন্দী করে রেখেছিল।

কিন্তু বন্দী হয়েও আত্মসমর্পণ আমরা করলে তো! একদিকে পাইন আর ফারের নাচন দেখে, আর অপরদিকে ঘাসের গালিচা ও ফুলের রসকুঞ্জ দেখে আত্মনিবেদন করলে তো আমরা!

আমরা তাই কিছুক্ষণ বাদেই ব্যস্ত হয়ে উঠি; ফিকির খুঁজি ঘরে ফেরার।

কিন্তু কোথায় ঘর? ফেরার পথে ঘর-ছাড়া সেই বিদেশী বাউলদের সঙ্গে আবার দেখা। আবার মোলাকাত সেই হিপ্পি-দম্পতির সঙ্গে। সেই যে সেই দম্পতি, হনুমান-ঢোকায় যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং যাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলেছিলাম, বালাজুতে আবার দেখা হবে।

হল দেখা। 'সুইমিং-পুল'-এ আবার দেখলাম ওদের। ওরা তখন স্নানের উদ্যোগ করছিল। 'সুইমিং-কস্‌ট্যুম্' পরে কপোত-কপোতীর মতো বসে ছিল 'পুল'টির গা ঘেঁষে।

আমাদের দেখেই চিৎকার করে উঠল ওরা, হ্যাল্লো!

—হ্যাল্লো! সাড়া দিলাম আমরাও। দ্রুত এগিয়ে গেলাম 'সুইমিং-পুল'-এর দিকে।

গা-টা কড়্ কড়্ করছিল তখনও। কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না যে, সামান্য এই 'পুল'টিকে দেখার জন্যে জনপ্রতি এক টাকা করে দর্শনী দিয়েছি।

হ্যাঁ, 'পুল'টি আমাদের কাছে সামান্যই মনে হয়। কিন্তু নেপালীরা অসামান্য বলে একে। বলে, এটা নাকি 'ইন্টার ন্যাশন্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর 'সুইমিং-পুল'।

জানি নে। 'ইন্টার ন্যাশন্যাল স্টাণ্ডার্ড'টা আসলে কী, তা আমাদের কারও জানা নেই। তবে উঁচু মানের ওই সব 'সুইমিং-পুল'-এ ডাইভিং এবং সুইমিং-এর আয়োজনটা নিশ্চয় আরও বড়-সড় রকমের হয়। নিশ্চয় দর্শক-আসনও বড় গোছেরই থাকে ওখানে।

কিন্তু বালাজুর ওই 'পুল'টিতে দর্শক-আসন দেখলাম না। দর্শকই বলি, অথবা বলি প্রতিযোগী—মোট দু'টি মাত্র প্রাণীকে দেখলাম ওখানে ; এবং ওরা সেই হিপ্পি-দম্পতি।

—হ্যাল্লো! দেখতে দেখতে ওদের খুব কাছে এগিয়ে গেলাম আমরা। এবং ওরাও আমাদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

এবার আলাপটা আরও নিবিড় হয়ে উঠল ওদের সঙ্গে।

শুনলাম, মিঃ পল স্যাণ্ডার্স ও মিসেস জিমি স্যাণ্ডার্স নাম ওদের ; আর শুনলাম, হ্যাঁ ; পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরা গত রাতটা এই বালাজুতেই কাটিয়েছে।

—কিন্তু আজকের রাতটা কোথায় কাটাবেন? একবার শুধালাম ওদের।

ওরা আমার কথার কোন জবাব দিল না। বাংলা পাঁচের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাই আবার শুধালাম, কই! বললেন না, কোথায়?

এবার মুখ খুলল মিঃ পল স্যাণ্ডার্স। বলল, ইচ্ছে ছিল নাগার্জুন পাহাড়ের চূড়া জ্যাম্যাচোকে বেছে নেব আজ। থাকব ওখানকারই একটি বৌদ্ধ-চৈত্যের আশেপাশে। কিন্তু—

—কিন্তু কী আবার! আমি কৌতূহলী হবার ভান করি।

—কিন্তু মিসেস স্যাণ্ডার্স রাজী নয় ওতে।

বললাম, রাজী কী করে হবেন! সাধ করে বাঘ-ভাল্লুকের পেটে যেতে কার আর মন চায়?

মিসেস স্যাণ্ডার্স চিৎকার করে উঠলেন এবার, ঠিক ঠিক! আমি শুনেছি, বাঘ-ভাল্লুক ওখানে প্রচুর আছে।

প্রদীপবাবু বললেন, আছে মানে! এই সেদিনও তো এক চিতাবাঘের পাল্লায় পড়ে এক বৌদ্ধভিক্ষু—

—ওহ্ মাই লর্ড! প্রদীপবাবুর কথা শেষ হবার আগেই চিৎকার করে উঠল মিসেস জিমি স্যাণ্ডার্স। পল-এর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, কী? বলিনি আমি? বলিনি যে, ওদিককার লেপার্ডগুলো সব হাঙ্গ্রি?

ব্যাপার গুরুতর বুঝে আমরা এবার পালাবার উদ্যোগ করি। পল-এর দিকে হাত তুলে বলি, আচ্ছা! এবার তাহলে—

—শাট্ আপ্! ততক্ষণে মিসেস স্যাণ্ডার্স খেঁকিয়ে উঠেছে আবার। পল স্যাণ্ডার্সকে বলছে, না না! ওখানে আমি যাব না; কিছুতেই যাব না।

পল একদিকে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ এবং অপরদিকে মিসেস-এর এই সাদর-সম্ভাষণের মাঝখানে পড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু তার কোন কথাই কানে এল না আমাদের। মিসেস-এর তর্জন-গর্জনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

অগত্যা এগোতে লাগলাম আমরা ; এবং খানিক দূর এগোবার পরেও স্পষ্ট শুনতে পেলাম, মিসেস জিমি স্যাণ্ডার্স বলছে, না না! ওখানে যাব না; কিছুতেই যাব না। ওদিককার লেপার্ডগুলো সব হাঙ্গ্রি!

—কিন্তু এদিকে আমরাও যে হাঙ্গ্রি! কিছু না খেলেই যে নয় এখন। প্রদীপবাবু কথা বললেন এইবার।

বললাম, খাবার একটিই আছে এখানে; এবং তা হল ওই 'সুইমিং-পুল'-এর জল। কিন্তু সেখানেও তো—

প্রদীপবাবু শুরু করলেন আবার, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখানেও তো আর এক ফ্যাসাদ। নীলের তীরে লালমুখো বন্ধুদের দাম্পত্য-কলহ।

শুভ্রা বললেন, কলহ সব বন্ধুই করে। আর তাছাড়া, সুইমিং-পুল-এর জল আবার নীল হল কখন?

প্রদীপবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, কেন? সেই যখন থেকে পুল হয়েছে?

শুভ্রা বললেন, না স্যার! মোটেও তা নয়। পুল-এর জল নীল নয় মোটেই। তার কিনাড়াগুলো নীল্চে সিমেণ্ট্ দিয়ে বাঁধানো বলেই ঠিক ওইরকম দেখাচ্ছে ওদের।

বললাম, বেশ বেশ! ঠিক আছে। দু'জনেই ঠিক আপনারা।

শুভ্রা শাসিয়ে ওঠার ভান করেন, রেখে দিন ঠিক! ওর মতো রঙ্কানাকে ঠিক-বেঠিক বোঝাতে যাওয়াই আপনাদের ভুল!

প্রদীপবাবু ফোঁড়ন কাটেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল। আলবাৎ ভুল। ওর মতো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগ্রেস থাকতে নাগার্জুন পর্বতের হাঙ্গ্রি লেপার্ড নিয়ে মাথা ঘামানোও ভুল।

এবার সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম আমরা; এবং বিস্ময়ের কথা, হাঙ্গ্রি লেপার্ড-এর ক্ষিধে পেটে নিয়েও হাসিমুখেই ছত্র-পটিতে ফিরলাম।

কাঠমাণ্ডুর এই ছত্রপটিকে যখনই দেখি, তখনই যেন নতুন হয়ে

ধরা দেয় সে। তখনই যেন রঙ-রসের নতুন নতুন ইন্দ্রধনু ছড়ায়।

ইন্দ্রধনুর একটিকে ফেরার পথে দেখলাম।

দেখলাম, ছত্রপটির ছত্রটির তলায় রামায়ণ-গান শুনতে এসেছে শত শত লোক; এবং গান সেখানে পুরোদমেই চলেছে।

কেন চলবে না? পথ যদি হয়ে ওঠে নিঃস্তব্ধ অডিটরিয়াম, এবং ছত্রপটির ছত্রতল যদি হয়ে দাঁড়ায় সুসজ্জিত স্টেজ, তো চলবে না কেন?

হ্যাঁ, মোটামুটি বড়-সড় একটি ছত্র আছে ওখানে। পথের একেবারে মাঝখানে আছে।

ওই মাঝখানেই চোখে পড়ে শান-বাঁধানো একটা বেদী, এবং বেদীর ওপরে টিন-বাঁধানো একটা চন্দ্রাতপ।

লোকে বলে, ওই চন্দ্রাতপই হল ছত্র; এবং ওরই নামে এই মহল্লার নাম ছত্রপটি বা ছত্রপাটি।

আজ ভাবি, কে জানে! তাই হবে হয়তো! হয়তো ছত্রপটিতে রামায়ণ-গান আজও চলে থাকবে। এবং আজও ওখানে রঙ-বেরঙের জামাকাপড় পরে এসে থাকবে অগুন্তি সব পাহাড়ীয়া।

কিন্তু শুধুমাত্র পাহাড়ীয়ারাই বুঝি আসে ওখানে? বাবুরা আসে না? আসে না ভিন্‌দেশী সব সাহেবরা?

কে বলল, আসে না? প্রদীপবাবুও বলেছিলেন সেদিন, আসে না, কে বলল? ওই যে, দেখুন না!

দেখলাম, পথের ওপর খবরের কাগজ পেতে দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে আছে কয়েকজন হিপ্পি। বসে ঠিক পাহাড়ীয়াদের মতোই রামায়ণ-গান শুনছে।

এদিকে গান চলেছে তো চলেইছে। সেদিন বিকেল চারটে নাগাদ আবার যখন বেরোলাম আমরা, গান তখনও থামেনি; উল্টে হিপ্পি-শ্রোতার সংখ্যা আরও বেড়েছে।

—বাড়বেই। নেপাল সেক্রেটারিয়েট অর্থাৎ সিংহ-দরবারের দিকে যেতে যেতে বলেছিলেন প্রদীপবাবু, ঐশ্বর্যের দহনে যত ওরা দগ্ধ হবে, ততই আরও বেশি সংখ্যায় ওরা এসে বসবে এই পথের ধুলোয়।

— কিন্তু ধুলোয় বসাটা যাদের কাছে বিলাসিতা নয়, যারা সত্যি দুর্ভাগ্যের চাপে ওখানে গিয়ে ছিটকে পড়েছে, সিংহ-দরবার পারবে কি তাদের টেনে তুলতে? দরবারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রদীপবাবুকে শুধাই একবার।

প্রদীপবাবু বরাবরই আশাবাদী। জবাব দেন, হ্যাঁ, পারবে।

—পারবে? বলতে বলতে সিংহ-দরবারের বাগিচার দিকে এগোই আমরা। বাগিচাটি ভারী সুন্দর। ফোটা-ফুলের মহোৎসব ওখানে। ফোয়ারার ওখানে উচ্ছ্বসিত কলতান। কৃত্রিম জলপথ ধরে এগোচ্ছে ফোয়ারার জল। অতি যত্নে গড়ে-তোলা ঘাসের সবুজ গালিচার গা ঘেঁষে এগোচ্ছে।

এগোচ্ছি ওদিকে আমরাও। একসময়ে রাণা প্রধান-মন্ত্রীদের প্রাসাদ বলে চিহ্নিত দরবার হল ধরে পথ চলছি। হলটি অপরূপ। সুদৃশ্য সব মূর্তি আছে ওখানে। আছে বিরাট বিরাট সব আয়না। এছাড়া সারি সারি চেয়ার আছে, সিংহাসন আছে, আছে তৈলচিত্র।

হঠাৎ ভেলভেটে তৈরী কয়েকটা কম্বল চোখে পড়ল ওখানে। চোখে পড়ল, ওদের গায়ে গায়ে সোনায়-গড়া অদ্ভুত সব কারুকার্য।

কারুকার্য দরবার-হল-এর মেঝেতেও কম নেই বড়। অতি সুন্দর মার্বেল-পাথর দিয়ে মোড়া সেই মেঝে। আর গোটা হলটাই যেন মোড়া বিরাট-বিপুল ঐশ্বর্য দিয়ে।

ঐশ্বর্য ঝাড়-লণ্ঠন হয়ে ঝুলছে কোথাও। কোথাও আবার অন্যভাবে শোভা পাচ্ছে।

ওই শোভা দেখতে দেখতে, ওই ঐশ্বর্যের খবর নিতে নিতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল সেদিন। এবং সেদিনের সেই ঘনায়মান সন্ধ্যায় সিংহ-দরবারকে ছেড়ে আসার সময় বার বার মনে হল, আজকের

নেপালের পঞ্চায়েৎ-ডেমোক্র্যাসীর এই যে হেড্-কোয়ার্টার, এ কি কোনদিন পারবে ধূলায় অবলুণ্ঠিত শত শত দরিদ্র, হতভাগ্য নেপালীদের টেনে তুলতে ?

কে জানে, পারবে কী পারবে না! সেদিন ত্রিভুবন রাজপথ ধরে চলতে চলতে ভাবি।

একবার বিদ্যুৎচমকের মতোই মনে আসে যেন, পারা না-পারার হিসেবটা অনাগত কালের জন্যে তোলা থাক। আর প্রদীপবাবুর সেই কথা 'হাঁা, পারবে'র মধ্যেই সান্ত্বনা খোঁজা যাক আপাতত।

খুঁজি সান্ত্বনা। ঠিক এমনি করেই সন্ধ্যে-সকাল নেপালের পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

টুণ্ডিখেল-এর কাছে কাঠমাণ্ডুর মনুমেণ্ট 'ক্লক্ টাওয়ার' দেখি কখনও, কখনও আবার নেপাল-মিউজিয়ামে নেপোলিয়ন-এর তরবারিকে দেখি; মচ্ছেন্দ্র বহাল-এ মচ্ছেন্দ্রনাথ-মন্দিরের গায়ে গায়ে অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বুদ্ধের জীবনচিত্রকে প্রতিবিম্বিত দেখি কখনও, কখনও আবার আজকের নেপাল-রাজপ্রাসাদ নারায়ণ-হিটি দরবারকে দেখি; চৌবাহার-এ ইস্পাত-সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে বিরাট-বিপুল গিরিখাত দেখি কখনও, কখনও আবার ওই গিরিখাতেরই একপাশে পাহাড়-চূড়ার ওপর গড়ে-ওঠা বিস্ময়কর 'আদিনাথ' মন্দিরকে দেখি; কখনও চৌবাহার ছাড়িয়ে চন্দ্রগিরি পর্বতের কোলে অপরূপ 'টৌডাহা'-হ্রদকে দেখি, কখনও আবার 'হাণ্ডিবন' গিরিসংকটে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে দেখি কাঠমাণ্ডু-উপত্যকা এবং তুষারাবৃত হিমালয়কে। এছাড়া চম্পাদেবী এবং মহাভারত পর্বতের পশ্চিম ঢালে পুরনো শহর 'ফার্পিং' দেখি কখনও, কখনও আবার খাড়া পর্বতের ওপর বিস্ময় হয়ে-ওঠা 'শিখা নারায়ণ' মন্দির দেখি; কখনও ফার্পিং ছাড়িয়ে 'দক্ষিণ-কালী'র মন্দির দেখি, আবার কখনও দেখি লিচ্ছবি রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ অবশেষ প্যাগোডা-মন্দির 'চংগু নারায়ণ'।

নয়

প্যাগোডারই দেশ এই নেপাল। নেপাল মন্দিরের দেশ।

মন্দির দেখতেই ভক্তপুরে ছুটি একদিন। এক মেঘে-ঢাকা দুপুরে কাঠমাণ্ডুর রত্না-পার্ক থেকে আশ্চর্য এক মন্দিরের দিকে পাড়ি জমাই।

—আশ্চর্য, আশ্চর্য এক শহর ভক্তপুর! গাড়িতে উঠেই সহযাত্রী প্রদীপ চৌধুরী গুন্ গুন্ করেন, খোলা আকাশের নিচে কেউ যদি রাক্ষুসে মিউজিয়াম দেখতে চান, তো তিনি ভক্তপুরে চলুন। কারণ, ওখানে শহর যতটা, মিউজিয়ামও ঠিক ততটা।

কিন্তু শহর দেখা আদৌ কি কপালে আছে! ভাবি একবার, যা তীরের বেগে ছুটছে গাড়ি! একটু পরেই সে হয়তো ভক্তপুরকে পেছনে ফেলে দূর পাহাড়ের গায়ে উধাও হবে!

ওদিকে দেখি, উধাও হবার গান গায় সাদা মেঘেরা। পাহাড় ছেড়ে ওরা আকাশে আসর জমায়। সূর্যকে ঢেকে ফেলে দেখতে দেখতে।

এই ঢাকাঢাকির সবটুকু সরাসরি চোখে পড়ে না অবিশ্যি। গাড়িতে বসে আভাসে-ইঙ্গিতে এ ঠাওর করি।

গাড়ি ওদিকে ছুটছে তো ছুটছেই। সমতল একটা পথ ধরে ছুটছে। পথের দু'ধারে মাঠ-ময়দান চোখে পড়ছে কখনও। কখনও চোখে পড়ছে ঘরবাড়ি।

কিন্তু ঘরবাড়ি ক'টা আর! পথ আর কতটুকু! কাঠমাণ্ডু থেকে ছ' মাইল পথ পাড়ি দিতে কতটা আর সময় লাগে!

দেখতে দেখতে ভক্তপুর পৌঁছুই আমরা। আমাদের গাড়ি ওখানকার এক ময়দানের ছায়া-ঢাকা এক প্রান্তরে এসে দাঁড়ায়।

গাড়ি আরও অনেক ছিল ওখানে। জীপ, স্টেশন ওয়াগন, বাস ---অনেক ছিল। কিন্তু ওদিকে তাকাবার তখন সময় কই? সময় তখন 'মিউজিয়াম টাউন' ভক্তপুরকে নিয়ে ব্যস্ত।

এবার এগোই মিউজিয়ামের দিকে। অমসৃণ একটা পথ ধরে বড় গোছের এক দীঘির সামনে এসে দাঁড়াই।

দীঘিটি চৌকোণা, তার চারটি পাড়ই মজবুত করে বাঁধানো।

শুনেছি, বাঁধিয়েছিলেন নাকি সম্রাট প্রতাপ মল্ল। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই দীঘির কাজ তিনি শেষ করেছিলেন এবং তিনিই এর নাম দিয়েছিলেন 'সিদ্ধ পোখ্‌রি'।

কিন্তু মানতেই হবে, ভাগ্য খারাপ ছিল এর পোখ্‌রির। তাই প্রতাপ মল্লের মৃত্যুর পর এও যেন মৃত্যুর পথ ধরল। দেখতে দেখতে শ্যাওলায় ঘিরে ফেলল একে এবং এর ঘাটগুলো হয়ে উঠল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইমারৎ-অবশেষের মতো।

এই অবশেষের দিকে তাকিয়ে একদিন হাহাকার করে উঠলেন রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা। বললেন, কী এটা? এই শ্যাওলায় ঢাকা বিদঘুটেটা?

সহকারীরা বললেন, সিদ্ধ পোখ্‌রি প্রভু! এককালের এক বাহারে দীঘি!

—দীঘি! আর্তনাদ করে উঠলেন ভীপসেন থাপা। বললেন, বাহারে দীঘির হালত্‌ কিনা এই!

সহকারীরা বললেন, মেরামত হয়নি বলেই সিদ্ধ পোখ্‌রির এই হালত্‌ আজ।

—কিন্তু কেন হয়নি মেরামত? চিৎকার করে ওঠেন রাজমন্ত্রী, কেন হয়নি? আর দেরী নয়; আজ থেকেই শুরু হোক কাজ।

শোনা যায়, এর পরই কাজ শুরু হল। পোখ্‌রির ঘাটগুলো বাঁধানো হল। ভীমসেন থাপার আদেশে সোনালী মাছ এল সুদূর চীন থেকে।

—আসতেই হবে! লোকে বলল, জেল্লা বাড়াতেই হবে দীঘির। রাণার আদেশ।

রাণা ভীমসেন কাজের মানুষ, রাজার দক্ষিণহস্ত। সাধারণ সৈনিক থেকে রাজমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। ১৭৯৮ থেকে ১৮৩২—দীর্ঘ এই ৩৪ বছর রাজ্যের শাসন-তরীর তিনি কর্ণধার ছিলেন। অতএব, পশ্চিম দিকে উঠলেও উঠতে পারে সূর্য, কিন্তু তাঁর কথার হেরফের হতে পারে না।

শোনা যায়, হেরফের হয়ও নি নাকি কিছু। সিদ্ধ পোখ্‌রি নাকি অকাল-বার্ধক্যের ঘোর কাটিয়ে আবার তার যৌবনকে ফিরে পেয়েছিল।

সেই যৌবন এখন অবিশ্যি নেই আর। এখন হাজার চেষ্টাতেও বিগত-যৌবন সিদ্ধ পোখ্‌রির দৈন্যকে ঢেকে রাখার আর উপায় নেই। এখন সত্যি সে জরাজীর্ণ ও মুমূর্ষু। তার ভাঙা ঘাট ও ধসে-যাওয়া পাড়গুলো শুধুমাত্র সেই আড়াই শো বছর আগেকার মেরামতির গুণে আর যেন নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারছে না।

টিকিয়ে রাখার আয়োজনটা ভক্তপুরের প্রধান প্রবেশ-পথে দেখা যায় বরং। ওখানে দেখি, রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে পথকে মহিমান্বিত করেছে যে শান-বাঁধানো তোরণটি, তা আজও একরকম অক্ষত।

এছাড়া সিংহদ্বারও অক্ষত আজ। হনুমান, ভৈরব ও নরসিংহ নারায়ণের মূর্তি-শোভিত ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রহরীটি আজও অম্লান।

কিন্তু তবু এদের কথা থাক আজ। আজ বরং পরিত্যক্ত রাজধানী ভক্তপুরের অন্দর-মহলের খবর নেওয়া যাক।

অন্দরের প্রবেশ-পথটি অপ্রশস্ত বড়। বড় অপরিচ্ছন্ন।

পথের দু'পাশে গায়ে-গায়ে লাগা ঘরবাড়ি। তাকালে মনে হয়, এই বুঝি ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে, অথবা ওই বুঝি গোটা পথটাকেই গ্রাস করবে ওরা।

কিন্তু না, গ্রাস ওরা করে না। পড়ি-পড়ি করেও ওদের একে অপরের উল্টোদিককার জীর্ণ-শীর্ণ বন্ধুদের ছোঁয়া বাঁচায়।

এদিকে আমরাও ছোঁয়া বাঁচিয়ে এগোই যেন। আশেপাশের বাড়িগুলোকে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে পথ চলি। বাড়িগুলোর কোনটাতে মোষের মাংস শুকোনো হচ্ছে। শলায় গেঁথে রোদে দেওয়া হচ্ছে দলা দলা মাংস; আবার কোথাও লাল মরিচ নিয়ে ব্যস্ত সবাই; ব্যস্ত শুকনো মরিচ ঘরে তুলতে।

ওই মরিচগুলোর দিকে একবার লোভীর দৃষ্টিতে তাকান প্রদীপবাবু। বলেন, এখানকার এই জীবন আজও ঠিক তেমনি আছে। মিউজিয়াম বলেই হয়তো আজও আধুনিক হতে পারল না ভক্তপুর। ইতিহাস আর কিংবদন্তীকে নিয়ে রহস্যময়ই থেকে গেল।

হ্যাঁ, সত্যি! আজও রহস্যময় সে। আজও ভক্তপুরের কথা লিখতে গিয়ে দেখি, সত্যি, ইতিহাসের কয়েকটি খোলা পৃষ্ঠা ওখানে স্তম্ভিত। দেখি, আনন্দ মল্ল নামে এক সম্রাট স্থাপন করেছিলেন এই শহর, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু ভাগ্য খারাপ আনন্দ মল্লের। নিজের গড়া শহরে নিজে তিনি আনন্দে থাকতে পারলেন না। শত্রুর আঘাতে সেই শহর থেকে তিনি নির্বাসিত হলেন।

শত্রু তাঁর নান্যদেব, দক্ষিণ ভারত থেকে বাজপাখির মতো ছুটে-আসা এক রাজপুত-যোদ্ধা। নান্যদেব মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে দেখা দিলেন ভক্তপুরে; এবং ভক্তপুরাধিপতি আনন্দ মল্লকে তাড়িয়ে একদিন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, এখানকার রাজা কেউ নয় আর, স্বয়ং আমি!

—আমি! হাহাকার করে উঠল ভক্তপুর। কিন্তু আশ্চর্য! কেউ বিশেষ কিছু প্রতিবাদ করল না।

কে করবে প্রতিবাদ? নান্যদেবের মতো একটা হিংস্র বাজপাখির শিকার কে হবে?

ইতিহাসে পাই, শিকার হবার ঠিক এমনিতরো সম্ভাবনা আরও একবার দেখা দিয়েছে ভক্তপুরে। এই সেদিনও ওখানে পিতা জগৎ প্রতাপের জীবিতকালেই পুত্র জিত মিত্র রাজা হয়েছেন। কিন্তু প্রতিবাদ কেউ করেনি। বরং অনেকেই কানাঘুঁষো করেছে, সাম্রাজ্যের যেমন সাহিত্যেরও তেমনি মঙ্গল হবে এইবার; সম্রাট সাহিত্য-রসিক।

রসিক বুঝি আমরাও। সেদিন ভক্তপুরের সেই বদ্ধ গলিটা ধরে এগোবার সময় ভাবি।

সেদিন ভাবি, আমরাও রসিক। তা না হলে এই ভরা-দুপুরে নেপালের এ রহস্যপুরীতে আসব কেন? আর কেনই বা জিত মিত্রের স্বপ্ন 'দরবার স্কোয়ার'-এ এসে হত্যে দেব? জিত মিত্রের পুত্র ছিলেন ভূপতীন্দ্র মল্ল। সেদিন দরবার স্কোয়ার-এ পৌঁছে তাঁকে দেখলাম। দেখলাম, মূর্তিমান এক রহস্য হয়েই আমাদের সামনে তিনি বসে। স্তম্ভের আকারে গড়ে-তোলা সুদৃশ্য একটি বেদীর ওপর বসে তিনি। এবার বেদীটির দিকে ধীরে ধীরে এগোই আমরা। স্তব্ধ বিস্ময়ে ভূপতীন্দ্র মল্লের মূর্তির দিকে তাকাই। দেখি, করজোড়ে আছেন তিনি। অপলক নেত্রে তিনি দেখছেন তাঁর নিজেরই গড়া দরবার মহল্লাকে।

হ্যাঁ, এই দরবার মহল্লা ভূপতীন্দ্র মল্লই একদিন গড়েছিলেন। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তপুরের সিংহাসনে বসে বজ্রগম্ভীর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি, দরবার গড়ো। রাজ-মহল্লা রাজোচিত না হলে মান থাকে না।

সেই থেকে গড়া শুরু হল মহল্লা। কিন্তু মানী রাজা তার শেষ দেখে যেতে পারলেন না। তার আগেই হঠাৎ একদিন চোখ বুঁজলেন।

ভূপতীন্দ্রের পুত্র রণজিৎ মল্ল রাজা হলেন এইবার। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তপুরের সিংহাসনে বসে তিনিও ঠিক তাঁর পিতার কথারই

প্রতিধ্বনি করলেন, দরবার গড়ো। কাজ শেষ করো। রাজ-মহল্লা রাজোচিত না হলে মান থাকে না।

অতএব আবার শুরু হল কাজ। রণজিৎ মল্লের আমলে তো বটেই, পরবর্তী রাজা যক্ষ মল্লের আমলেও পুরোদমে কাজ চলল। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল রাজ-মহলের বারান্দা-সংলগ্ন অতি সুন্দর সব জানালা।

কিন্তু বরাত খারাপ যক্ষ মল্লেরও। সেই জানালায় দাঁড়িয়ে দরবার-মহল্লাকে তারিফ করা তাঁরও হল না। গোর্খাধিপতি পৃথ্বী নারায়ণ শা ছিনিয়ে নিলেন সেই মহল্লাকে। কল্যাণের খাতিরেই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত নেপালকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করলেন।

বুঝি ঠিক তেমনি সঙ্ঘবদ্ধ আজও আছে নেপাল,—দরবার-মহল্লার উঠোনটির ওপর দিয়ে যেতে যেতে একবার ভাবি। পরক্ষণেই একবার তাকাই প্যাগোডা-শোভিত মহল্লাটির দিকে।

প্যাগোডা অনেক আছে ওখানে। ছোট-বড়-মাঝারি অনেক আছে। কিন্তু ওদের দেখার সময় তখন কই। তখন সামনেই এক সোনার দরজা ঝলমল করছে।

হ্যাঁ, দরজাটা সোনার। সোনার সিংহদ্বার পেরিয়েই ভক্তপুরের রাজপ্রাসাদে ঢুকতে হয়।

প্রাসাদ ওদিকে খাঁ খাঁ করছিল তখন। এক তাল সোনাকে সামনে মেলে ধরে কেবলই বিষন্নতা বিদীর্ণ করছিল।

সেই বিষন্নতায় দগ্ধ হই আমরা। দেখতে দেখতে সেই সোনার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দরজাটা ঝলমল করছিল তখন। প্রদীপবাবুর ভাষায়, 'রাজা রণজিৎ মল্ল জেল্লা ছড়াচ্ছিল'।

জেল্লাই বটে! আজ ভাবি, সত্যি বটে জেল্লা। কারণ, রণজিৎ মল্ল অনেক ঐশ্বর্যের বিনিময়ে একদিন সোনার এই দরজা গড়েছিলেন। একদিন অনেক শিল্পীর সাধনার সম্মিলনে এই অপরূপকে রূপ দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু সে-সব অনেক দিনকার কথা। অনেক আগেই পৃথিবী এদের ভুলে গেছে।

পৃথিবী ভুলে গেছে এমনকি যক্ষ মল্লকেও। রাজপ্রাসাদের গায়ে সারি-বাঁধা পঞ্চান্নটি জানালা যে ওই রাজাই একদিন গড়েছিলেন, সে-কথাও আজ আর কারও মনে নেই।

মনে থাকবেই বা কী করে! প্রাচীন এই রাজধানীতে এসে কেউ কি আজ আর প্রাসাদ-গবাক্ষের শিল্প-সুষমা দেখে? না কি দেখে প্রাসাদ-সামনেকার সেই বিরাট ঘণ্টাটা? সেই যে সেই ঘণ্টা, যা বাজিয়ে নাকি মল্লরাজারা একদিন 'কারফিউ' জারী করতেন। প্রজাদের নিষেধ করে দিতেন ঘরের বাইরে আসতে।···

আজ কেউ এদের দেখে না বোধ করি। কেউ-ই বোধ করি আজ আর মূল-চকে গড়ে-ওঠা তেলেজু-ভবানীর মন্দির নিয়ে বা মূল প্রাসাদ-সংলগ্ন চিত্রশালা বা 'পিক্‌চার গ্যালারী' নিয়ে মাথা ঘামায় না। আজ এখানে যারা আসে, তারা ভক্তপুর নামক গোটা মিউজিয়ামটাকেই দেখতে আসে। মিউজিয়ামের কোন্ কোণে দেখার কতটুকু বাকি রইল, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে আসে না।

মাথা ঘামাইনি অবিশ্যি আমরাও। প্রাসাদ দেখতে আমরাও সময় বেশি নিইনি।

সময় নিলাম প্রাসাদ-সংলগ্ন কয়েকটি মন্দিরকে দেখতে; এবং বিশেষ করে দেখতে নয়াতপোল ও বৎসলা-মন্দিরকে।

বৎসলা-মন্দির দেখতে অনেকটা রথের মতো, অনেকটা পাত্তানের কৃষ্ণ-মন্দিরের মতো। আগাগোড়া পাথর কেটে তৈরী হয়েছে এ; এবং এরই মধ্যে আছে আশ্চর্য এক ঘণ্টা।

লোকে বলে, এই ঘণ্টা বাজালে মরণ-ধ্বনি জেগে ওঠে নাকি; এবং ধ্বনি শুনে আশেপাশের কুকুরেরা নাকি আর্তনাদ শুরু করে।

জানি নে। এই আর্তনাদের ব্যাপারটা কতটুকু সত্যি, তা যাচাই করার অবকাশ পাইনে সেদিন।

সেদিন বৎসলা-মন্দির থেকে বেরিয়ে ছোট-পশুপতিনাথ দেখতে দেখতেই অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, পশুপতি-মন্দির ভক্তপুরেও আছে একটি ; এবং কাঠমাণ্ডুর পশুপতির অনুকরণেই এরও আকৃতি প্যাগোডার মতো ; এরও গায়ে আছে অপরূপ সব কারুকার্য।

শোনা যায়, জিত মিত্র গড়েছিলেন এই পশুপতিনাথ, ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে গড়েছিলেন।

কিন্তু জিত মিত্রের কীর্তিকে ভাল করে তারিফ করার আগেই নতুন এক পথ ধরি আমরা। নয়াতপোল-এর দিকে এগোই।

নয়াতপোল-এর পথটা দেখতে দেখতে ঝাপ্‌সা হয়ে এল যেন। সেই যে এক সরু ও অপরিচ্ছন্ন গলি, যা ধরে একদিন ওই মন্দিরে গিয়েছিলাম, তা যেন অস্পষ্ট হয়ে এল ক্রমেই।

অস্পষ্ট হয়নি শুধু নয়াতপোল। বরং দিন দিন যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে সে। ভক্তপুরের আকাশে সগর্বে উঁচিয়ে-থাকা তার মাথাটা যেন অপরূপ দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, নয়াতপোলকে আজও দেখি যেন। দেখি যে, আমার সামনেই এক মহিমময়। পাঁচতলা উঁচু অদ্ভুত এক প্যাগোডা-মন্দির একেবারে সামনেই।

সামনা-সামনি যেন নতুন পরিচয় হচ্ছে আবার। যেন আবার এগোচ্ছি মন্দিরটির দিকে। এগোচ্ছি, থামছি একবার, স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকাচ্ছি পরক্ষণে।

ওদিকে মন্দিরের টান দুর্বার হয়ে উঠেছে। চুম্বকের মতো সে আকর্ষণ করছে আমায়। আর আমি যেন চলছি। অভিভূতের মতো যেন গিয়ে দাঁড়াচ্ছি তার সিঁড়ির গা ঘেঁষে।

সিঁড়ি উঠে গেল ধাপে ধাপে। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু এক বেদী অবধি উঠল ; এবং তারপর মন্দির উঠল সেই বেদীটি থেকে।

অপরূপ এক বেদী। আশ্চর্য এক মন্দির। ইট আর কাঠে মিলে অতুলনীয়।

মন্দিরে ছাদ আছে পাঁচ-পাঁচটি। ছাদগুলো আশ্রয় করে আছে ৪৫ ডিগ্রীতে হেলানো কয়েকটি করে খুঁটিকে।

কিন্তু খুঁটিগুলো ভালো নজরে পড়ে না যেন। বরং নজরে পড়ে দুটি নরমূর্তিকে, প্রথম দফা সিঁড়ির দু'পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা দুটি বিস্ময়কে।

—কী এরা? কাদের মূর্তি? শুধাই প্রদীপবাবুকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই।

প্রদীপবাবু বলেন, এঁরা জয় আর ফত্ত মল্ল।

—রাজা বুঝি এঁরা?

—জানি নে।

—রাজমন্ত্রী?

—জানি নে। তবে শুনেছি, খুব নাকি শক্তিমান। ওঁদের শক্তির দাপটে তামাম ভক্তপুর নাকি কাঁপত। সাধারণ মানুষ ওঁদের দেখলেই ভাবত, কাছে গিয়ে কাজ নেই! কী থেকে কী করে বসবেন ওস্তাদরা!

—তা, ওস্তাদরা করলেন অনেক কিছু। একটু থেমে প্রদীপবাবু আবার শুরু করেন, তাই মৃত্যুর পরে অনেক কিছু ইনাম ওঁরা পেলেন। এইখানে স্থান হল ওঁদের। পাথরের মধ্যে ওঁদের ধরে রেখে বোঝান হল, সাধারণের চেয়ে ওঁরা ছিলেন দশগুণ শক্তিশালী।

—কিন্তু শক্তির কি আর শেষ আছে? প্রদীপবাবু থামেননি তখনও। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলছেন, শেষ আছে কি?

ততক্ষণে আমিও উঠে এসেছি খানিকটা। পাথরে-গড়া অপরূপ

দুটি হাতীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। স্পষ্ট দেখছি, দ্বিতীয় দফা সিঁড়ি শুরু হল যেখানে, ঠিক সেখানেই ওরা দাঁড়িয়ে।

ওদিকে প্রদীপবাবু বলে চলেছেন, না, শেষ নেই শক্তির। থাকলে কি আর এ দুটি হাতীকে দেখতেন ?

বললাম, হ্যাঁ, দেখছি বটে দুটি হাতী। কিন্তু এরা এখানে কেন ?

—মল্লবীরদের চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী বলে।

—কিন্তু শক্তির কি আর শেষ আছে ? এবার প্রদীপবাবুর কথার প্রতিধ্বনি করি আমি। আরও খানিকটা উঁচুতে উঠে এসে তৃতীয় দফা সিঁড়ির দু'পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা দুটি সিংহমূর্তিকে দেখিয়ে বলি, শেষ আছে কি ? থাকলে কি আর এ দুটি সিংহকে এখানে দেখতেন ?

প্রদীপবাবু বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। ঠিকই ধরেছেন। সিংহরা এখানে আছে, হাতীর চেয়ে এরা দশগুণ শক্তিশালী বলে।

বললাম, সিঁড়ি বেয়ে আরও তো খানিকদূর উঠতে হবে। আরও সব শক্তিশালীরা ওপরে আছেন নাকি ?

প্রদীপবাবু বললেন, আছেন। দফায় দফায় যত ওপরে উঠেছে সিঁড়ি, ওদের শক্তিও ততই দশগুণ করে বেড়েছে।

—বেড়েছে ? শক্তি শেষ অবধি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তবে ? বলতে বলতে আরও কয়েক ধাপ উঠে আসি। চতুর্থ দফা সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

দেখি যে, কল্পিত জীব গ্রিফিন্‌-এর দুটি প্রতিমূর্তি এখানে। জীবটির মাথা আর ডানা ঈগলের কাছ থেকে ধার করা। আর দেহটা ধার করা সিংহের কাছ থেকে।

—এই হল গ্রিফিন্‌। বললেন প্রদীপবাবু, সিংহের দশগুণ শক্তি রাখে এরা।

—আর এরা রাখে—, পঞ্চম দফা সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দুটি

দেবীমূর্তিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, গ্রিফিন্‌-এরও দশগুণ শক্তি

—কিন্তু কে এরা ?

—সিংহিনী আর বাহিনী।

—কে এদের গড়েছে ?

—জানি নে।

—জানি নে। ইতিহাসও দেখছি ঠিক একই জবাব দেয়। বলে, কে এদের গড়েছে, জানি নে। তবে নেপাল-সভ্যতার এক আশ্চর্য যুগে যে এদের জন্ম, তা জানি।

হ্যাঁ, যুগটা আশ্চর্য। সে-যুগে সূর্য অস্ত যেত না নেপালে। মল্ল-রাজারা একের পর এক আকাশে সূর্য হয়ে দেখা দিতেন। শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিধান করে সারা দেশে আলোক ছড়াতেন।

শোনা যায়, আলোক অনেক ছড়ালেন রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লও। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের এক শুভলগ্নে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। বললেন, আসল আলোক তো এইখানে! এইখানেই তো গড়ে উঠল নতুন স্বর্গলোক!

—স্বর্গলোক কী সম্রাট! এ তো মর্ত্যলোক! মর্ত্যকে ছুঁয়ে আছে এই মন্দির। পারিষদরা বলাবলি করেন।

কিন্তু রাজার সেই এক কথা, না না ; এ হল স্বর্গলোক। স্বর্গের দিকে উঠে গেছে এর চূড়া। এ-মন্দির আকাশকে স্পর্শ করেছে।

করেছে বুঝি! আজও অনেকে বলাবলি করে, সত্যি বুঝি করেছে। উচ্চতায় নেপালের অন্যসব মন্দিরকে ছাড়িয়ে গেছে এই নয়াতপোল।

ছাড়াবার কথাটা খাঁটি বোধ করি। নয়াতপোল থেকে ফিরে আসার পথে ভাবি,—বোধ করি ভক্তপুরে সমাগত সব ভক্তই এই খাঁটি কথাটা উপলব্ধি করে।

এদিকে দেখতে দেখতে উপলব্ধির অন্য এক জগতে পৌঁছুই। নয়াতপোল থেকে বেরিয়ে খানিক দূর যেতে না যেতেই দেখি, ভৈরব-নাথের মন্দির।

মন্দিরটি কাঠমাণ্ডুর কাষ্ঠমণ্ডপের ছাঁচে গড়া যেন। যেন ঠিক তেমনি পথের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা তিন ছাদ-ওয়ালা অপরূপ এক দেব-দেউল। দেউলটি গড়তে শুরু করেন রাজা জগৎ-জ্যোতি মল্ল; এবং গড়া শেষ করেন রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল।

হ্যাঁ, ইতিহাস বলে, ভূপতীন্দ্রের আমলেই ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয় এই মন্দির এবং রাজা এই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েই একদিন ঘোষণা করেন, আজ থেকে এ হল সংহারের দেবতা ভৈরব-নাথের অধিষ্ঠান-ভূমি।

সেই ভৈরব-নাথকে দেখি সেদিন। তবে জগৎ-জ্যোতি ও ভূপতীন্দ্রের গড়া সেই মহাতীর্থকে কিছুটা যেন জরাজীর্ণ দেখি।

জীর্ণতা নেই দত্তাত্রেয় মন্দিরে। ভৈরব-নাথের চেয়ে বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও বার্ধক্য আজও একে স্পর্শ করেনি।

—স্পর্শ কী করে করবে? লোকে বলে, প্রতি বছর শিবরাত্রি উপলক্ষে যেখানে লক্ষ ভক্তের আসা-যাওয়া, সেখানে বার্ধক্য কী করে আসবে? প্রতি বছরই যে সারানো হয় একে, ভক্তরা আসবে বলে সারানো হয়। তাই বার্ধক্য আসি-আসি করেও আর আসতে পারে না এখানে। পাঁচ-পাঁচটা শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম আর জল-ঝড়ের সাক্ষী এই মন্দিরকে কিছুতেই আর কাবু করতে পারে না।

সেই কবে কোন্ যুগে রাজা যক্ষ মল্ল গড়েন এই মন্দির। ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে গড়েন। এবং তারপর একে মেরামত করেন রাজা বিশ্ব মল্ল। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দত্তাত্রেয়কে নতুন করে গড়েন তিনি। নতুন গড়া মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে নাকি তিনি বলেন, ভয় নেই। কোনদিন আর পুরনো হবে না এ।

যক্ষ মল্লের আশ্বাস কালক্রমে সত্যি প্রমাণিত হল। সত্যি

শতাব্দীর মরণ-আঘাতকে সযত্নে পরিহার করে উন্নত-শির হয়ে রইল দত্তাত্রেয়। তার তিনতলা প্যাগোডাটি যুগের পর যুগ ধরে বিস্ময় উদ্রেক করল মানুষের।

বিস্মিত বুঝি আমরাও। সেদিন দত্তাত্রেয় মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবি, আমরাও বিস্মিত। কারণ, ঠিক এ-হেন শান্ত স্তব্ধ পরিবেশে এমনিতরো মহিমময় মন্দির জীবনে ক'টি আর দেখেছি! জীবনে ক'বার আর মুখোমুখি হয়েছি অপরূপের!

হ্যাঁ, দত্তাত্রেয় সত্যি অপরূপ। তার স্তম্ভ, তার গরুড়-মূর্তি, তার দোতলার ঝুল-বারান্দা—সব কিছুর মধ্য থেকেই অপরূপের বিদ্যুৎ-ঝলক উচ্ছ্বসিত। আর বিদ্যুৎঝলক উচ্ছ্বসিত তার শঙ্কু-আকারের চূড়া থেকে, তার প্যাগোডা-আকারের ছাদ থেকে, কারুকার্যে ভরা অপরূপ তার দেওয়ালগুলো থেকে।

সেই দেওয়ালগুলোকে আজ আর মনে করতে পারি নে যেন। আজ শুধু মনে পড়ে বিদায় নেবার কথা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত রহস্যময় সেই মন্দিরটি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার কথা।

মনে পড়ে, বেরোবার মুখে সহযাত্রী প্রদীপবাবু বলছেন, কাঠমাণ্ডুর কাষ্ঠমণ্ডপের মতো একেও গড়া হয়েছিল একটিমাত্র গাছের কাঠ দিয়ে।

—কিন্তু কাষ্ঠমণ্ডপের সঙ্গে তো মিল নেই এর! আমি বলি, কাষ্ঠমণ্ডপের মিল আছে বরং ভৈরব-নাথের সঙ্গে।

এদিকে খেয়ালই করিনি মোটে, মিল-অমিলের কথা ভাবতে ভাবতে বিচিত্র এক গলিপথ ধরেছি এতক্ষণে। এগোচ্ছি রহস্যের আর এক খাসমহল ধরে।

খাসমহলে বাড়ি অনেক। গলির দু'পাশে নেপালী-মধ্যবিত্তদের সারি-বাঁধা অনেক আস্তানা।

ওই আস্তানাগুলোকে অবাক বিস্ময়ে দেখি বার বার। ওদের

জানালার গায়ে গায়ে অদ্ভুত সব কারুকার্য বার বার আমার চোখ ধাঁধায়।

একবার ময়ুর-গবাক্ষ চোখে পড়ে। দেখি যে, ময়ুর ওখানে পেখম মেলে দাঁড়িয়ে।

প্রদীপবাবু বলেছিলেন, পেখম মেলাবার ভাবনাটা প্রথম নাকি আসে এখানকারই কোন এক রাজার মাথায়।

—কিন্তু কোন্ রাজার? সেই থেকে ভাবনাটা পেয়ে বসে। খুঁজে বেড়াই, কে সেই রাজা? কবে তিনি এই ময়ুর-গবাক্ষ বা 'পিকক্ উইন্‌ডো' গড়েছিলেন?

অবশেষে অনেক খুঁজে খুঁজে আজ পেয়েছি এর জবাব। আজ জেনেছি, রাজা বিশ্ব মল্ল গড়েছিলেন এই ময়ুর-গবাক্ষ; ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গড়েছিলেন।

কিন্তু তবু বিশ্ব মল্লের কথা থাক এখন। এখন বরং ভক্তপুরের বাকি পথটুকু ঘুরে নেওয়া যাক। এগোন যাক ভকুপতি নারায়ণের দিকে।

ভকুপতি নারায়ণ মন্দির ময়ুর-গবাক্ষের খুবই কাছে। কিন্তু বয়সে ময়ুর-গবাক্ষের চেয়ে পৌনে দু'শো বছরের ছোট সে। শুনেছি, ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে একেও নাকি কোন এক রাজা গড়েছিলেন।

—কিন্তু কে সেই রাজা? সেদিন নারায়ণ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি।

প্রদীপবাবু এখানেও হতবাক, ইতিহাস নিরুত্তর। ওদিকে দুই ছাদ-ওয়ালা সেই প্যাগোডা-মন্দির ঝলমল করে। বিচিত্র সব ধাতুর গায়ে গড়ে-তোলা তার কারুকার্যগুলো চকমকায়। তার চিত্রগুলো রহস্যময় হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। কিন্তু চিত্র-রহস্য ভেদ করার মতো সময় ছিল না সেদিন। মিউজিয়াম-শহর ভক্তপুর থেকে সেদিন যাবার কথা ছিল চংগু-নারায়ণে।

চংগু-নারায়ণের মন্দিরটি ভক্তপুর থেকে খানিকটা দূরে, অনেকটা উঁচুতে। ওখানে যাব বলে ভক্তপুরে থেকে জীপ ধরি একটা। মিউজিয়াম-শহর থেকে বেরিয়ে-যাওয়া উত্তর-মুখী একটা পথ ধরি।

পথটা নির্জন বড়। বড় স্তব্ধ।

এই স্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভাঙেন প্রদীপবাবু। একবার একটু যেন অভিযোগের সুরেই বলেন, সূর্য-বিনায়ক দেখলেন না ; আক্ষেপ থেকে গেল।

—আক্ষেপ কেন আবার ? আমি শুধাই।

—আবার কেন ? দেখলেন না বলে।

—দেখার এমন কি আছে ওখানে ?

—আছে অনেক কিছু। গণেশ-মন্দির আছে। মন্দির-প্রহরী অরণ্য আছে।

—কী জানেন! একটু থেমে প্রদীপবাবু আবার শুরু করেন, অরণ্যের মাঝখানে ঠিক এমনভাবে আছে ওই গণেশ-মন্দির, যে, ভোরের আলো প্রথমেই এসে ওর চূড়াকে স্পর্শ করে।

—চূড়াটা অনেক উঁচু তবে ?

—না, খুব একটা নয়। তবে উঁচুতে আছে গণেশ-মন্দির সূর্য-বিনায়ক। ওখানে গেলে স্পষ্টই মনে হবে আপনার, ভক্তপুর জায়গাটা দেখতে আসলে শঙ্খের মতো।

—আর শঙ্খ! ভাবি একবার। ওই বিরাটের পাশে পিঁপড়ের মতো দর্শক হয়ে কতটুকু দেখব ওর! ওই বিশাল-বিপুল মিউজিয়াম-শহরের কতটুকু বুঝব!

ওদিকে দেখতে দেখতে ভক্তপুরকে পেছনে ফেলে আসি। এগোই চংগু-নারায়ণের দিকে। সন্ধ্যেও এগোচ্ছিল তখন। পুব-পাহাড়ের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগোচ্ছিল।

প্রদীপবাবু তাই তাড়া :দিলেন ড্রাইভারকে, জোরে! আরও জোরে চালাও গাড়ি। সন্ধ্যের আগেই চংগু-নারায়ণ পৌঁছুতে হবে।

পৌঁছুলাম ঠিক। চংগুর দোতলা প্যাগোডা-মন্দিরটির সামনে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, পশ্চিমাকাশ তখন গাঢ় লাল।

কিন্তু লালের বাহার চংগু-নারায়ণেই কি কম? আকাশের লাল অনেকখানিই তো সে নীলাম করেছে! পশ্চিমাকাশ থেকে লাল নিয়েছে সে। পুব থেকে নিয়েছে নীল। আর রামধনু থেকে সাত রঙের সবগুলোই সে নিয়েছে।

সত্যি, চংগু-নারায়ণ বড় অদ্ভুত। বড় রহস্যময়। নেপালের ইতিহাস শরৎ-আকাশে মেঘের মতো এর ওপর দিয়ে ছায়া ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেছে।

এগোবার শুরু সেই কবে থেকে। সেই কবে রাজা হরিদত্ত বর্মার আমল থেকে।

ইতিহাস বলে, হরিদত্তই গড়েন এই চংগু-নারায়ণ। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে গড়েন।

এরপর দীর্ঘ দেড়শোটা বছর এর ওপর দিয়ে দেখতে দেখতে পেরিয়ে যায় এবং অবশেষে একদিন রাজা মানদেব আসেন এখানে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে এখানে এসে তিনি চংগু-নারায়ণের পুজো করেন।

শোনা যায়, নেপাল-অধিপতিদের আরও অনেকেই এখানে এসে অনেকবার পুজো করেছেন। এখানে এসেছেন এমনকি পরাক্রান্ত অংশুবর্মনও। ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চংগু-নারায়ণের উদ্দেশ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন তিনি।...এই নিবেদনের পর দেখতে দেখতে পেরিয়ে যায় আরও প্রায় চৌদ্দ শো বছর। রাজার আসা-যাওয়া আবার শরৎ-আকাশে মেঘের মতো ছায়া ফেলে এখানে।

কিন্তু তবু সবই কি ছায়া? চংগু-নারায়ণের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে যে শিলাস্তম্ভগুলো এবং ওদের গায়ে গায়ে উৎকীর্ণ আছে যে লিপিগুলো, সেগুলোও কি ছায়া? চংগুর তাম্রলিপিগুলো এবং কাষ্ঠফলকে খোদিত শব্দগুলোও কি ছায়া শুধু?

ছায়া ফেলতে ফেলতে ইতিহাস জায়গায় জায়গায় কি কায়াও ধরে না? সে কি জীবন্ত হয়ে ওঠে না বিশেষ এক একটা মুহূর্তে? ···কে জানে, ওঠে হয়তো; ধরে হয়তো কায়া!

সেই মুহূর্তগুলোরই কয়েকটা এখানকার এই মন্দির-প্রাঙ্গণের লিপিগুলোর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে হয়তো। হয়তো এদের রহস্যকে উদ্ধার করলে এই মুহূর্তগুলোরই যোগফল হারিয়ে-যাওয়া এক আশ্চর্য অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে।····কিন্তু তবু উদ্ধার করার অবকাশ তখন কই!

লিপিগুলোকে পড়বার সুযোগ কই তখন! সন্ধ্যে তখন ক্ষুধার্ত অতীতের রূপ ধরে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

এগোচ্ছি আমরাও। ষোলটা শতাব্দীর রঙে রাঙানো রঙ্-চঙা চংগু-নারায়ণের আরও কাছে আসছি।

কাছে যেতেই চংগুর স্বর্ণময় প্রবেশ-পথটি চোখে পড়ে। দেখি, সেই প্রবেশ-পথের দু'ধারে শঙ্খ ও চক্রধারী বিষ্ণুমূর্তি-শোভিত দুটি স্তম্ভ। আর দেখি, স্বয়ং লোকেশ্বর মহাদেবের ব্রোঞ্জ-মূর্তি আছে ওই মন্দিরে এবং মূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুর ওপর।

বিষ্ণু গরুড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আবার এবং গরুড় দাঁড়িয়ে আছেন গুটিয়ে-থাকা একটি সাপের ওপর। সাপ একটি গ্রিফিন্‌কে আশ্রয় করেছে। আর নরসিংহ নারায়ণ, সত্য নারায়ণ ও বিশ্বরূপের আশ্চর্য মূর্তিগুলো ঘনায়মান আঁধারকে আশ্রয় করে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমেই। রঙীন চংগু-নারায়ণ তার ঐশ্বর্যকে নিয়ে দেখতে দেখতে ঘন আঁধারের মধ্যে ডুব দিচ্ছে।

ভাবলাম, দিক ডুব। বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাক চংগু-নারায়ণ। আর আমরা ফিরে যাই ভবিষ্যতে।

হ্যাঁ, ফিরি এবার। নেপালের সবচেয়ে প্রাচীন প্যাগোডা-মন্দিরকে বিদায় জানাই। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে-থাকা রহস্যপুরী থেকে ঘরে ফেরার পালা জমিয়ে তুলি।

পালা এক-একদিন এক-একরকম করে জমে ওঠে নেপালে। মন্দিরকে নায়ক করে কোনদিন, কোনদিন আবার পাহাড়কে নায়ক করে তার জয়যাত্রা শুরু হয়। এই জয়যাত্রার সাক্ষী থাকে নাগের-কোট কখনও, কখনও ঢুলিখেল, আবার কখনও কাকনী।

নাগেরকোট-এর পালাটি তিন অঙ্কের। এ-পালার প্রথম অঙ্ক ভক্তপুর থেকে ধার করা। কারণ, কাঠমাণ্ডু-নাগেরকোট-এর ১৮ মাইল পথের প্রায় অর্ধেকটাই কাঠমাণ্ডু-ভক্তপুর পথ ধরে। ভক্তপুরের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে বাঁ দিকে বেরিয়ে-যাওয়া উত্তর-পুবমুখী পথ ধরতে হয় একটা। এই হল নাগেরকোট-এর পথ এবং পালার দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুও এখানেই।

এই অঙ্কে পাহাড় বেয়ে স্বর্গে ওঠে গাড়ি। নাগেরকোট নামক রমণীয়ের দিকে অভিসার করে।

কিন্তু তবু বলব, আসল 'অ্যাকশন' এ-অঙ্কেও নেই। আসল শুরু সেই তৃতীয় অঙ্কে। সেই ৭,১৩৩ ফুট উঁচু নাগেরকোট পাহাড়ে।

নাগেরকোট সম্পর্কে অনেক কথা অনেকদিন আগে থেকেই শুনেছি। শুনেছি, হিমালয়পুরীর বাহারী এক খেলাঘর এ। এর পশ্চিমে কাঠমাণ্ডু-উপত্যকায় জীবনের স্পন্দন, আর পুবে ইন্দ্রবতীতে নির্ঝরিণীর জলতরঙ্গ। এর সামনে তুষারাদ্রিতে যোগাসীন মহা-মৌনী, আর পেছনে সমাজ-সংসারে কল্লোলিত দুঃখ-সুখ। এর একদিকে স্থাবর, অন্যদিকে জঙ্গম। একদিকে সন্ন্যাস, অন্যদিকে গৃহ। একদিকে ত্যাগ, অন্যদিকে ভোগ।

নাগেরকোটে পা দিয়েই মনে হল, এই এতগুলো বিচিত্রের একেবারে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। এখান থেকে হাত বাড়ালে ধরতে পাব ওদের; চোখ মেললে ওদের দেখতে পাব।

দেখলাম। নাগেরকোটে দাঁড়িয়ে সকলের আগে দেখলাম যোগাসীন মহামৌনীদের, ভীষণ-গম্ভীর গিরি-তাপসদের। দেখলাম, ঠিক সামনেই বিরাট এক মিছিল ওদের ; এক শোভাযাত্রা।

তবে মিছিলটি চলছে না। শোভাযাত্রীরা এগোচ্ছে না কেউ। কী এক মন্ত্রবলে সব যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। আর সেই দাঁড়িয়ে-থাকা নিথর-নিশ্চলদের মাঝে মাঝে কারা যেন উড়িয়েছে নিশান।

মেঘের নিশান অনেক উড়ছে ওখানে। তুষার-ধবলদের চূড়ায় চূড়ায় উড়ছে, গায়ে গায়ে উড়ছে। উড়তে উড়তে ওরা সামনের উপত্যকা আর মালভূমিতে লুটিয়ে পড়ছে কখনও ; কখনও আবার সব কিছুকে ছাপিয়ে স্বর্গের দিকে ছুটছে।

এই ছোটাছুটি আর এই লুটিয়ে-পড়া স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখছিলাম সেদিন। বার বার ভাবছিলাম, নিশান অনেক বলেই বুঝি মিছিলের সবটুকু একসঙ্গে ঠাওর হচ্ছে না।

কিন্তু ভাগ্য ভালো বলতে হবে ; ঠাওর হল শেষ অবধি।

দেখা গেল, নিশানগুলোর সব ক'টি একসঙ্গে জড়ো হতে হতে আকাশের একপ্রান্তে উধাও হয়ে গেছে।

জানি, নগাধিরাজের খাসমহলে হামেশাই হয় এমন।

ঠিক এমন করেই নিশান ওড়ে ; এবং উড়তে উড়তে ওরা আবার মিলিয়ে যায়।

কিন্তু নিশানের ঠিক এত বিরাট সমারোহ এর আগে আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

মনে পড়ে না, তুষার-ধবল গিরিরাজদের ঠিক এতবড় একটা মিছিল আর কখনও দেখেছি।

কাঠমাণ্ডু আসার পথে দামন থেকে মিছিল একটা দেখেছিলাম বটে ; দামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলাম, মিছিল সম্পর্কে এই বুঝি শেষ কথা। কিন্তু এখন দেখছি, না ; ঠিক তা নয়। শেষেরও শেষ আছে। দামনের পরেও নাগেরকোট আছে।

নাগেরকোটে হিমালয়ের চূড়াগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পাহাড়ীয়া।

পাহাড়ের খাদ ঘেঁষে যেখানটায় আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিক সেখানেই এসে হাজির হল সে। হঠাৎ হাজির হল। এবং হয়েই—

—ম্যয় আ গিয়া শেঠ! আ গিয়া! নিজের আবির্ভাব-সংবাদ সে নিজেই জানাল।

বলতে যাচ্ছিলাম, কে তুমি? কোত্থেকে এলে? তোমার তো আসার কথা ছিল না?

কিন্তু এ-সব প্রশ্নের কোন সুযোগই দিল না আগন্তুক। উল্টে এমন একটা ভাব দেখাল, যেন সে কতকালের চেনা।

—বাদল খুল গিয়া শেঠ! ম্যয় ভি আ গিয়া! আবার বলল সে।

—এসেছ, বেশ করেছ। আমি বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই—

—পর্বত দেখো মালিক! মজাসে দেখো! ম্যয় আ গিয়া! জানিয়ে দিল আগন্তুক।

আমাদের আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদেরও সামনে গিয়ে সে ঠিক এই একই কথা জানাল।

আশেপাশে আরও অনেকেই ছিলেন আমাদের। ভারতীয় ছিলেন কয়েকজন। আর কয়েকজন ছিলেন দূরদেশী পর্যটক। সবাই তন্ময় হয়ে তখন উদ্ধত-উন্নত গিরিশৃঙ্গদের দেখছিলেন।

তখন দর্শকদের কারও হাতে বাইনকিউল্যার্, কারও হাতে ক্যামেরা; কারও হাতে ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্‌লেট্, কারও হাতে ছড়ি। শৃঙ্গদের চিনে নেবার জন্যে সবাই যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তখন।

প্যাম্প্‌লেট্-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন কেউ। কেউ আবার বাইনকিউল্যার্‌কে কাজে লাগাচ্ছিলেন। ক্যামেরার লেন্স্ ফোকাস করছিলেন কেউ। কেউ আবার ছড়ি উঁচিয়ে পাহাড়-পারিষদদের চেনাচ্ছিলেন।

কিন্তু তবু চিনে-নেয়া কী আর সোজা কথা! অচেনার সেই ভিড়ের ভেতর থেকে খ্যাতনামা মহাজনদের হদিস সোজাসুজি কী আর পাওয়া যায়!

—যায় না বোধ করি! বার বার মনে হল সেদিন।

এবং ঠিক সেই মনে হবার মুহূর্তেই—

—বাদল খুল গিয়া শেঠ! ম্যয় ভি আ গিয়া! বলতে বলতে এগিয়ে এল ওই লোকটি।

—কে ও? চেনেন নাকি? সহযাত্রী প্রদীপবাবুকে শুধালাম একবার।

প্রদীপবাবু বললেন, চিনি বৈকি! খুব চিনি। 'ইণ্ডিয়া এইড্ মিশন্'-এর কাজে এই নাগেরকোটে অনেকবার এসেছি। অনেক-বারই আলাপ হয়েছে ওর সঙ্গে।

—কিন্তু ও তো আপনাকে চেনে বলে মনে হয় না!

—কী করে চিনবে! পর্বতের ওই চূড়াগুলো ছাড়া সবই ওর অচেনা।

—পর্বত চিনিয়েই বুঝি চলে ওর?

—চলে বলেই তো শুনেছি। শুনেছি আরও যে, এই অদ্ভুত পর্বত-প্রীতির জন্যেই এখানকার লোকে ওর নাম দিয়েছে পর্বত বাহাদুর। আসলে এখানকার লোক নয় ও। শেরপা-মহল হেলাম্বুতে ওর বাড়ি। পর্বত বাহাদুর আসলে একজন শেরপা।

তা পর্বত মানুষটি বেশ সপ্রতিভই বলতে হবে।

দূরের তুষারাদ্রিদের দিকে হাত উঁচিয়ে দেখতে দেখতে ও শুরু করে,

—ওই যে দেখছ, পশ্চিমে—একেবারে পশ্চিমে দাঁড়িয়ে যে চূড়াটি, ওই হল ধওলাগিরি (ধবলগিরি)। ধওলাগিরির পাশেই ছাখ অন্নপূর্ণা-১কে। ১-এর খুব কাছে অন্নপূর্ণা-২ আর ৩কে ছাখ। কী? ৩কে ১ আর ২-এর চেয়ে বেশি উঁচু মনে হচ্ছে? ভুল, ভুল

মনে হচ্ছে তবে। আসলে অন্নপূর্ণা-৩ পঁচিশ হাজার ফুটও উঁচু নয় ; কিন্তু ১ আর ২ ছাব্বিশ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। হিমলচুলীকে দেখছ, কেমন ধীরে ধীরে স্বর্গের দিকে উঠল ও ? ছাখ ভাল করে। অন্নপূর্ণা থেকে পুর্বদিকে এগিয়ে এসো। তবে বেশি এগিয়ো না যেন ! হিমলচুলীর পাশেই আছে মানালস্থ ; বেশি এগোলে ওকে আর দেখতে পাবে না। কী ? দেখছ মানালস্থকে ? দূরের ওই পাহাড়টার ঠিক পেছনেই উঠে গেছে ? ছাব্বিশ হাজার ফুট উঠেও ব্যাটা উঁকি মারছে, দেখেছ ? দেখে নাও, দেখে নাও তাড়াতাড়ি ! এক টুকরো বাদল পেলেই আবার সে মুখ লুকোবে। তখন হাজার কান্নাকাটি করেও আর খুঁজে পাবে না তাকে।

আমরা মানালস্থর দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকাই এবার। কিন্তু ওই আকাশ-অভিযাত্রীদের সামনে দাঁড়িয়ে কারও মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। ওদিকে পর্বত বাহাদুর অনর্গল কথা বলছে তখনও। একের পর এক অভিযাত্রীদের চিনিয়ে দিচ্ছে,

—একেবারে সামনেই ছাখ গণেশ হিমল। বেশি উঁচু নয় ও। তোমাদের মুখোমুখি আছে বলে এইরকম দেখাচ্ছে। কী জানো, অনেকেই ওকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভাবে। চেহারায় মিল আছে কিনা, তাই ভাবে। কিন্তু ভাবলেই হল ! কোথায় উঁচু-ওস্তাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা ! আর কোথায় বেঁটে-বাঁটকুল সোয়া তেইশ হাজার ফুটের গণেশ হিমল ! তা যাক ! মরুক গে গণেশ হিমল। ও ব্যাটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থেকো না যেন, অন্যদেরও দেখো।

—ওই যে ! ওদিকে তাকাও ! বলেই পর্বত বাহাদুর তার উঁচিয়ে-রাখা হাতটাকে পশ্চিম থেকে পুবে সরিয়ে আনে খানিকটা। তুষারাচ্ছন্ন এক অপরূপ শৃঙ্গ দেখিয়ে শুরু করে,

—দেখছ ? ওই হল ল্যাংটাং।···নেই রাজার দেশে শেয়াল রাজা কিনা ! তাই আশেপাশের বাঁটকুলদের মধ্যে ওকে অত উঁচু দেখাচ্ছে। আসলে কিন্তু বেশি উঁচু নয় ও ; চব্বিশ হাজার ফুটও নয়।·· ল্যাংটাং

থেকে পুবে সরে এসো এবার। অন্নপূর্ণার প্রায় সমান উঁচু গোঁসাই থানকে ছাখ, গোঁসাই-এর পাশেই ছাখ দোরজে ল্যাকপা।...দেখলে তো? বেশ! ল্যাকপা থেকে অনেকটা পুবে সরে এসো তবে। ওই যে, দূরের ওই পাহাড়টা, ওর ঠিক পেছনেই ছাখ গৌরীশঙ্করকে।...চো ওয়ু শঙ্করের খুব কাছেই।...হ্যাঁ, দেখতে খাটো মনে হচ্ছে ওকে। কিন্তু খাটো ও মোটেই নয়; ধওলাগিরির প্রায় সমান উঁচু।...আর চো ওয়ুর খানিকটা পুবে, কিছুটা পেছনে কী ওটা?...

এইখানে একটু থামে পর্বত বাহাদুর। যেন মাস্টারমশাই মেজে আমাদের সবাইকে প্রশ্ন করে, ওটা কী?

আমরা কোন জবাব দিই না; নির্বাক বিস্ময়ে এ-ওর. মুখের দিকে তাকাই।

ওদিকে পর্বত বাহাদুরই আবার শুরু করে, ওই হল সাগরমাথা, তোমরা যাকে বলো এভারেস্ট্।...ভালো করে তাকাও ওর দিকে। ওর একেবারে পাশেই, একটু পুবদিকে লোৎসে আর মাকালুকে ছাখ। আবার মাকালুর গা-ঘেঁষেই ছাখ, কাঞ্চনজঙ্ঘা দাঁড়িয়ে।

দেখলাম। নাগেরকোটে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ-গম্ভীর নগাধিরাজ-পারিষদদের ওই অপরূপ দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

ওদিকে পর্বত বাহাদুর দারুণ ব্যস্ত তখনও। আমাদের পর্বত দেখানো শেষ করে সে অন্য আর একটি দলের দিকে এগিয়ে যায়। আবার শুরু করে, ওই হল ধওলাগিরি। একেবারে পশ্চিমে দাঁড়িয়ে।

—কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে কেন এখনও? প্রদীপবাবু বললেন, দূরের ওই পর্বতগুলোর সঙ্গে প্রথম-পরিচয় তো হল! এবার ট্যুরিস্ট্ বাংলোয় ফিরে চলুন বরং!

বললাম, ফেরবার আগে পর্বত বাহাদুরকে দিতে হবে না কিছু? এই যে, এতক্ষণ ধরে ও খাটল, এ-জন্য কিছু পয়সা?

প্রদীপবাবু বললেন, পয়সার জন্যে ভাববেন না। পর্বত নিজেই এসে নিয়ে যাবে।

—কিন্তু কী করে নেবে? ও তো আর জানে না, আমরা কোথায় উঠেছি!

—ঠিক জানে। সব খবর রাখে ও। দেখবেন, একটু বাদেই টের পাবেন।

প্রদীপবাবু মিথ্যে বলেননি। টের সত্যি পেলাম। সন্ধ্যের আগেই দেখলাম, ট্যুরিস্ট্-বাংলোতে পর্বত হাজির।

আমরা তখন শীতে কাঁপছি। নাগেরকোট জায়গাটা কাঠমাণ্ডুর তুলনায় যে কত ঠাণ্ডা, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছি, এমন সময় হাজির সে।

আমরা তাকে দেখে খুশিই হলাম। ওই দারুণ শীতেও উষ্ণ সংবর্ধনা জানালাম তাকে। কিন্তু সে বড় বেশি শীতল যেন। প্রাপ্য পয়সা নিয়ে কোনরকমে পালাতে পারলে যেন বাঁচে।

প্রদীপবাবু শেষ চেষ্টা করলেন তাকে আটকাবার। বললেন, পর্বত! এখন তো জরুরী কোন কাজ নেই তোমার। একটু বসলেই বা!

পর্বত নিরুপায় হয়ে বসল। ওদিকে প্রদীপবাবু আমাকে দেখিয়ে শুরু করলেন, আমার এই বন্ধু বলছিলেন, আমরা কে কোথায় উঠেছি, আবার কে উঠিনি আদৌ, এসেই যাই যাই করছি, তা তুমি কী করে টের পাও?

প্রদীপবাবুর কথা শুনে পর্বত বাহাদুর হেসে আকুল।

—কী করে টের্ পাই? বলেই আমার দিকে তাকিয়ে আবার হেসে লুটিয়ে পড়ল সে। এবং তারপর হাসির বেগটা একটু সামলে নিয়ে বলল, কেন? টের পাওয়া এমন কী শক্ত?...

তোমরা ছাখনি ? ··উঁচু একটা পাথরের ওপর বসে ছিলাম আমি ; যাত্রীদের আসা-যাওয়া দেখছিলাম ?

প্রদীপবাবু সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই, হ্যাঁ, দেখেছি। রোজই তো ওখানে বসো তুমি ! যাত্রীদের ওপর নজর রাখ।

পর্বত জানাল, তা রাখি ; তবে যাত্রীদের ওপর নয় শুধু, 'পহাড়'-এর ওপরও। কী জানো, বাদল খুলে গেলেই আমিও খুলে যাই। ওই উঁচু জায়গাটা থেকে নেমে এসে সবাইকে 'পহাড়' দেখাই।

বললাম, 'পহাড়' তুমি ভালোই দেখিয়েছ। কিন্তু বাবা পর্বত, তুমি জানলে কী করে যে, আমরা এই ট্যুরিস্ট্ বাংলোতে উঠেছি ?

—তোমাদের দেখে জানলাম। তোমরা বাংলোর পথটা ধরেই 'পহাড়' দেখবার জায়গাটাতে এলে যে !

—কি জানো, একটু থেমে আবার শুরু করে পর্বত, যারা 'রাইনো-ট্যুর'-এর গাড়িতে এখানে আসে, তাদের দিকে কড়া নজর রাখতে হয়। তারা এসেই তাড়াহুড়ো করে চলে যায় কিনা ! ··আর যারা আসে 'প্রাইভেট কার' বা 'ট্যাক্সিতে', হোল্ডল্ এবং মালপত্তর নিয়ে আসে, তাদের দিকে কড়া নজর না রাখলেও চলে। দেখেই তাদের বুঝে নিতে হয়, নাগেরকোটে দু'একদিন তারা থাকবে।

--মরুক গে নাগেরকোট ! প্রদীপবাবু শুরু করলেন এবার, তুমি বরং তোমার দেশের গল্প বলো। সেই যে, শেরপাদের দেশ হেলাম্বু, সেইখানকার গল্প।

—কিন্তু হেলাম্বুর গল্প শুনে তোমাদের কি ফায়দা হবে হুজৌর ?

—আমার এই বন্ধু, প্রদীপবাবু আমাকে দেখিয়ে বললেন, যেতে চান ওখানে। তোমার কাছ থেকে ওখানকার সম্বন্ধে শুনতে চান।

—ওখানকার পথ বড় দুর্গম হুজৌর ! হেলাম্বু যাওয়া বড় শক্ত ! পর্বত বাহাদুর আমার দিকে তাকিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে।

আমি বলি, হোক শক্ত। তুমি বলো তবু। হেলাম্বু দেখার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের।

—বেশ! দেখবে তবে; হেলাম্বু যাবে, পর্বত শুরু করে, রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকেই শুরু করবে যাত্রা।·····বেশি দূরের পথ নয় এ। কাঠমাণ্ডু থেকে ৩২ মাইল মাত্র·····কিন্তু মনে রাখবে, এই পুরো পথটা পায়ে হেঁটে যেতে হবে তোমাকে।·· ··· হেলাম্বু-পহাড়ে গাড়ি-ঘোড়া যায় না।

বললাম, হেলাম্বু-পাহাড়? সে আবার কোথায়?

—ওই হেলাম্বুতেই। কী জানো! 'পহাড়'-এর নাম থেকেই জায়গাটার নাম হল হেলাম্বু।·······আসলে গ্রাম তো আর একটা নেই ওখানে, অনেকগুলোই আছে। সবই শেরপাদের গ্রাম।

—কিন্তু শেরপাদের খবর কে আর রাখে, বলো? হঠাৎ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পর্বত শুরু করে, কে আর খুম্‌জুঙ্‌-এর কথা ভাবে?

শুধাই, খুম্‌জুঙ্‌ কী আবার?

পর্বত বুঝিয়ে দেয়, একটা গ্রাম। শেরপাদেরই গ্রাম। আমি ওই খুম্‌জুঙ্‌-এরই মানুষ হুজৌর!··· ···যেতে-আসতে ওখানে বড় কষ্ট! জায়গাটা চারিদিক থেকে পহাড়-ঘেরা কিনা! তাই কষ্ট।········আর শুধু খুম্‌জুঙ্‌ কেন, গোটা হেলাম্বুই দুর্গম পহাড়ে ঘেরা।·······কাঠমাণ্ডুর উত্তর-পুব দিকে পড়ে এই হেলাম্বু। বড় সুন্দর হেলাম্বু। সুন্দর সব পহাড় পেরিয়ে ওখানে যেতে হয়। পহাড় স্বর্গের দিকে উঠল কোথাও; কোথাও আবার পাতালের দিকে নামল।···ভারী শান্ত সব পহাড়। কাউকে ওরা কিছু বলে না। সারাক্ষণ চুপ মেরে থাকে একেবারে।···আর এছাড়া, পহাড়ের ঝরনাগুলোও কী সুন্দর! যার খুশি যাও! যত খুশি করো গিয়ে মজা, ওরা ভ্রূক্ষেপই করবে না; সেই আগে যেমন গান গাইছিল ঝমঝম ঝমঝম করে, ঠিক তেমনই গেয়ে চলবে।····

ওদিককার জলপ্রপাতগুলো গান গায় না আবার, হাসে। কলকল খলখল করে হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

—হ্যাঁ, ভালো কথা, একটু থেমে পর্বত বাহাদুর আবার শুরু করে, হেসে কী যেন ছড়াও গো তোমরা? মুক্তো? ওরাও ছড়ায়। হেসে হেসে ওরা যখন লুটিয়ে পড়ে, তখন সাদা মেঘের আকারে কত যে মুক্তো দেয় ছড়িয়ে!....তা যাবে ওখানে। দেখবে। এমন জিনিস হামেশাই তো আর দেখা যায় না! বাগমতী আর ইন্দ্রবতীর মতো সঙ্গিনীও পাওয়া যায় না সব পথেই।...কিন্তু বাবুজী, সবাই সঙ্গিনীর কদর বুঝলে তো! হাবাগোবারা ওদের আবার মা বলে। আরে দূর দূর! মা হবে কেন? ওরা হল গিয়ে রঙ্গিণী। তুমি নাচ, ওরাও নাচবে। তুমি সোহাগ দেখাও, ওরাও দেখাবে।...তবে হ্যাঁ, মনের মানুষকে পাশে নিয়ে যেন সোহাগ দেখিয়ো না, যেন নাচানাচি করো না! ওরা ক্ষেপে যাবে। মনের মানুষটিকে লুফে নেবে হয়তো।

এইখানে বাধা দিলাম। রহস্য করে বললাম, লুফে নেয় বুঝি সত্যি?

পর্বত বাহাদুর কিছু বলল না। যেন মুখে খিল এঁটে বসে রইল খানিকক্ষণ।

প্রদীপবাবু ফিস ফিস করে বললেন, শোনা যায়, ওর মনের মানুষকে নাকি ইন্দ্রবতী লুফে নিয়েছিল। ইন্দ্রবতী পেরোবার সময়েই...

এদিকে কথা শেষ করতে পারেন না প্রদীপবাবু। পর্বত বাহাদুর তার আগেই আবার শুরু করে, হ্যাঁ, হেলাম্বুর কথা শোন; ভাল করে লিখে রাখ সব; বলছিলে না, যাবে ওখানে!........যাবার সময় খাবার-দাবার নেবে কিছু। গরম জামাকাপড়ও কিছু নেবে। হেলাম্বু জায়গাটা অনেক উঁচুতে। কাঠমাণ্ডুর দ্বিগুণ উঁচুতে প্রায়।......অবিশ্যি অত উঁচুতে এক

লাফে উঠবে না কেউ; ধীরে ধীরে উঠবে। কাঠমাণ্ডু থেকে প্রথম যাবে ৫,০০০ ফুট উঁচু সুন্দরীজল-এ।…সুন্দরীজল থেকে মূল-খার্কা অবধি চড়াই পথ। মাত্র দু' মাইলের মধ্যে হাজার ফুট উঠে গেল পথটা।……মূল-খার্কায় পৌঁছে আরাম করো একদিন, বিশ্রাম নাও।……পরদিন বেরিয়ে পড় খাসরুবাস-এর পথে।….খাসরুবাস মূল-খার্কা থেকে ৬ মাইল মাত্র। তাই ভোরে বেরোলে দুপুরের অনেক আগেই পৌঁছে যাবে ওখানে। পৌঁছুতে কষ্ট নেই আদৌ; ও-পথের বেশির ভাগই উৎরাই। খাসরুবাস মাত্র ৫,০০০ ফুট উঁচুতে।…কিন্তু ওই খাসরুবাস-এর পর থেকেই শুরু হল দুর্গম পথ; ভীষণ চড়াই শুরু হল।…তবে খাসরুবাস থেকে বোরল্যাং অবধি ৭ মাইল পথে চড়াইটা বেখাপ্পা বা বিদ্ঘুটে নয় কোথাও। আসল বিদ্ঘুটে চড়াই পাবে বোরল্যাং থেকে পতি-ভঞ্জইয়াং যেতে।….ওখানে দেখবে, পথটা স্বর্গের দিকে উঠতে উঠতে হঠাৎ যেন ৭,০০০ ফুট উঁচু পহাড়ে থমকে দাঁড়াল।….এইবার তুমিও দাঁড়াও একটু। বোরল্যাং-এ যদি না জিরিয়ে থাকো তো এইখানে একটু জিরিয়ে নাও। এই পতি-ভঞ্জইয়াং থেকে হেলাম্বুর দিকে দু'টো পথ গেল। তুমি পুবদিকের পথটা ধরবে। ঠাকনি, তারাং মারাং, মাহাঃকল, নয়াপতি ও টিম্বু গ্রামকে পাশ কাটিয়ে এগোবে ধীরে ধীরে।…এইবার টারকে-ঘিয়ং যেতে পার তুমি; মেলেম্চী নদীর তীর ধরে ৮,০০০ ফুট উঁচু ওই গ্রামে যেতে পার।….তবে ক্লিবিল্, নুরপু, কাকনী ও খুম্জুং গ্রামও সুন্দর খুব। খুব সুন্দর! কিন্তু খুম্জুং-এর মেয়েরা আরও সুন্দর হুজৌর! আরও বাহারী!

খুম্জুং অবধি বলে আবার থামে পর্বত বাহাদুর। আবার কী যেন ভাবে।

এই সুযোগে আমি জিরিয়ে নিই একটু। বিচিত্র সব জায়গার নাম 'নোট' করতে করতে একবার থামি।

প্রদীপবাবু ফিস ফিস করেন, ওই খুম্জুং নিয়েই তো যত

ফ্যাসাদ। শোনা যায়, ওখানকারই এক মেয়ে ছিল ওর মনের মানুষ। ও নাকি বলত, আমি চলে গেলে দূরের ওই পাহাড়গুলোর দিকে তাকিও। ঠিক দেখবে আমাকে।

—বোঝা গেল! এইবার বোঝা গেল, পর্বত বাহাদুরের পর্বত-প্রীতির আসল কারণ কী! আর কেনই বা ও ইন্দ্রবতী নদীর কাছে পর্বতসাক্ষী নাগেরকোটকে বেছে নিয়েছে।

পর্বত বাহাদুর ভ্রূক্ষেপ করল না আমাদের কথা। সেদিন হেলাম্বু সম্পর্কে আরও অনেক কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিল।

নাগেরকোট-প্রসঙ্গে পর্বত বাহাদুর-কাহিনী এখানেই শেষ করলে ভাল হ'ত। কিন্তু তা যে করা গেল না, এজন্যে পর্বত নিজেই দায়ী।

পরদিন ভোরবেলা আবার দেখা ওর সঙ্গে। আমরা প্ল্যাটফর্মের মতো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরের তুষারাদ্রিদের রাজ্যে সূর্যোদয় দেখছি, এমন সময় দেখা।

—হুজৌর! হঠাৎ কে যেন ডাকল আমাদের।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, পর্বত বাহাদুর।

—পর্বত, তুমি এখানে? এই এত ভোরে?

পর্বত আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। উল্টে আমাকেই প্রশ্ন করল, কী দেখছ হুজৌর? ল্যাংটাং হিমল?

বললাম, না না। শুধু ল্যাংটাং কেন, সব হিমলকেই দেখছি।

—তা দ্যাখ, তবে ল্যাংটাংকে বড় স্পষ্ট দেখায় এখান থেকে। খুব কাছে কিনা! হেলাম্বু যদি যাও তো একবার যাবে ওখানে; ল্যাংট্যাং-এর গোঁসাইকুণ্ডকে একবার দেখবে। হেলাম্বু হয়ে ১৫,০০০ ফুট উঁচু এক গিরিসংকট পেরিয়ে ওখানে যেতে হয়।...ও জায়গাটা বেশি দূরে নয় হুজৌর! কাঠমাণ্ডু থেকে ৩৫ মাইল আর হেলাম্বু থেকে ১২ মাইল মাত্র।...কিন্তু হলে হবে কি! কোন জায়গার সঙ্গে ওর মিল নেই মোটে। সাড়ে ষোল হাজার ফুটের

চেয়েও বেশি উঁচু ওই গোঁসাইকুণ্ড আসলে যেন এক স্বর্গপুরী।··· স্বর্গের দেবকন্যেরা থাকেন ওর ধারে-কাছেই। সরস্বতী, রক্ত, দুধ, নাগ, সূর্য, ভৈরব—প্রতিটি কুণ্ড বা হ্রদেই ওঁরা থাকেন।···যেন হাত ধরাধরি করে থাকেন সব। যেন এক কুণ্ডের জল অন্যটিতে গিয়ে না পড়লে ওঁদের মন ভরে না।···জল অবিশ্যি পড়েও। পুবের সূর্য-কুণ্ড জল পাঠায় পশ্চিমের নাগ-কুণ্ড অবধি।···ওদিকে ঢুমজে গ্রামের শেরপারা অবাক হয়। দেবকন্যেদের এসব কাণ্ডকারখানার কিছুই ওরা বুঝে উঠতে পারে না;··· ওরা শুধু দেখে, দূর-দূরান্তর থেকে আসছে কত লোক।··· আসছে, ঢুমজে পেরিয়ে পশ্চিমদিকের বন-বরাবর চলছে সব। ··ওই বনের ঠিক পেছনেই আছে ঘাসে-ঢাকা সুন্দর এক মাঠ।···ওই মাঠ পেরিয়ে আরও উঁচুতে ওঠে যাত্রীরা।···· পাহাড়ের ওপর অদ্ভুত সমতল এক প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়ায়। ওই প্রান্তরেই পাথরে-গড়া ঘর আছে তিনটি। মেষ-পালকরা বিশ্রাম নেবে বলে আছে।···তা নেয় ওরা বিশ্রাম। ওরা নেয়, যাত্রীরা নেয়, আর নেয় চমরী গোরুরা।···ওখান থেকে গোঁসাইকুণ্ড পর্বতকে বড় সুন্দর দেখায়। হ্রদটিকেও দেখায় অপরূপ।··· আর শুধু হ্রদ কেন, গণেশ হিমল, ল্যাংটাং, দোরজে ল্যাকপা—সবাই যেন হুড়ো-হুড়ি দাপাদাপি করে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কিন্তু পর্বত বাহাদুর, সেদিনের সেই অস্পষ্ট আলোয় গোঁসাইকুণ্ডের পথের নিশানা সাধ্যমত টুকে রাখতে রাখতে আমি বলি, তুমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ? খুম্‌জুং-এর কোন্ মেয়েকে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় খুঁজতে বেরিয়েছ তুমি?

পর্বত কোন জবাব দেয় না। আমার কথা বুঝতেও পারে না বোধ করি।····ওদিকে দূর-পাহাড়ের গায়ে গায়ে রঙ্-বদল হয়। রাঙা রঙ্ সোনালী হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। সোনালী হয়ে ওঠে সাদা।...পাইন অরণ্য থেকে দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে। উত্তুরে হাওয়া থেকে থেকে চাবুক মারে।

অক্টোবরের শুরুতে এ চাবুক বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। তাড়াতাড়ি তাই ট্যুরিস্ট্-বাংলোতে ফিরি। উদ্যোগ করি কাঠমাণ্ডু-যাত্রার।

প্রদীপবাবু বাধা দেন, আরে দূর দূর! রাখুন কাঠমাণ্ডু! ঢুলিখেল চলুন বরং। দেখবেন, ভারী সুন্দর জায়গা!

বললাম, দেখতে আপত্তি নেই। শুনেছি, ও নাকি দ্বিতীয় নাগেরকোট।

—ঠিকই শুনেছেন। জায়গাটা সে-রকমই বটে। ঠিক সেই পর্বতশৃঙ্গদের দেখবার প্ল্যাটফর্ম।

—কিন্তু প্ল্যাটফর্মে যাবেন কী করে? ঢুলিখেল অনেকটা দূরে যে এখান থেকে!

—কে বলল দূরে! এখান থেকে ভক্তপুর নেমে খানিকদূর উঠলেই তো ঢুলিখেল!

—খানিকদূর মানে তো পনের-বিশ মাইল?

—তা হবে। কিন্তু জীপ পেলে এ পথটুকু পাড়ি দিতে আর কতক্ষণ!

—জীপ কি পাবেন?

—পেতেও পারি। চেষ্টা করে দেখাই যাক না!

দেখলাম। চেষ্টাও হল অনেক। কিন্তু জীপ পাওয়া গেল না কিছুতেই। অগত্যা লোক্যাল জীপ সার্ভিসে কাঠমাণ্ডু ফেরা স্থির হল। ফেরবার পথে পর্বত বাহাদুরের সঙ্গে আবার দেখা।…

দেখলাম, কয়েকজন ট্যুরিস্ট্কে সে বলছে, বাদল খুল গিয়া শেঠ! ম্যয় ভি আ গিয়া!

—কিন্তু আমরা যে চললাম পর্বত বাহাদুর! ওর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিতে গিয়ে প্রদীপবাবু বলেন।

পর্বত ভ্রূক্ষেপ করে না। আমাদের দিকে নির্বিকার নিরাসক্ত চোখে একবার তাকায় শুধু। বলে, বাদল খুল গিয়া শেঠ!

তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ ; সত্যি খুলে গেছে বাদল। নাগেরকোট-এর পাহাড়ীয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে নগাধিরাজ-পারিষদদের স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

অস্পষ্ট হয়ে উঠছি বরং আমরাই। ধীরে ধীরে এগোচ্ছি পাহাড়-পদতলে ভিড় করা মেঘলোকের দিকে।

॥ এগারো ॥

সেদিন কাঠমাণ্ডু পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ছত্রপটি ফিরতে ফিরতে বেলা বাজল প্রায় চারটে। ফেরবার পথে ট্যুরিস্ট্-অফিস থেকে টুলিখেল-এর টিকিট কাটলাম। 'রাইনো-ট্যুর'-এর টিকিট।

শোনা গেল, পরদিন সকালেই যাত্রীদের নিয়ে স্টেট্-বাস যাবে টুলিখেল-এ, 'রাইনো-ট্যুর' হবে। এই 'ট্যুর' সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু বলে রাখি। কারণ, কাঠমাণ্ডুতে দু'চার দিনের জন্যে যাঁরা যান, 'রাইনো'র সাহায্য তাঁরা নিলেও নিতে পারেন।

'রাইনো ট্যুর' রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে হয়। কাঠমাণ্ডুর 'ট্যুরিস্ট্ ডিপার্টমেন্ট' এর দেখাশুনো করেন।

ভাল বাস আছে এজন্যে। সরকারী বাস। পনের-বিশ জন বেশ আরামেই বসেন ওতে। আর বসেন সুশিক্ষিত একজন 'গাইড'।

'ট্যুর' চলার সময় এই 'গাইড' যাত্রীদের সব কিছু বুঝিয়ে দেন। বোঝাতে অসুবিধে নেই। মাইক্রোফোন থাকে গাড়িতে।

কিন্তু কোথায় মাইক্রোফোন আর কোথায় গাইড। পরদিন ভোরে গাড়িতে উঠে দেখি, জনপ্রাণী নেই। গাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

ট্যুরিস্ট্-অফিস-এর এক কর্মীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, 'প্রাণী'রা একে একে সব উঠবেন। গাড়ি এইখান থেকে ছেড়ে নামকরা এক একটি হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ; ওঁরা তখন উঠবেন একে একে।

দাঁড়াবার সময় আগে থাকতেই ঠিক করা থাকে। এ 'ট্যুর'-এ সময়ের নাকি ভীষণ কড়াকড়ি।

তা হবে। যা রটে, তার কিছু হয়তো বটে! শেষ অবধি দেখলাম, গাড়ি আটটায় ছাড়ার কথা; আটটা পাঁচে ছাড়ল।

—রোজই নাকি এইরকম ছাড়ে। এতক্ষণে আমার ঠিক সামনের আসনেই উঠে বসেছেন এক সাহেব সহযাত্রী, তিনি বললেন।

তাঁর কাছ থেকে আরও শুনলাম, এই 'রাইনো-ট্যুর'কে নির্ভর করেই তিনি নাকি কাঠমাণ্ডু ও তাঁর প্রতিবেশী-এলাকা দেখছেন।

দেখতে অসুবিধে নেই কিছু। 'ট্যুর' নাকি প্রায় প্রতিদিনই হয়। কোন কোন দিন সকালে-বিকেলে দুবেলা হয়। সকালের প্রোগ্রামে যদি থাকে পশুপতি ও বোধনাথ, বিকেলে তবে থাকবে হনুমান-ঢোকা ও স্বয়ম্ভুনাথ। আবার আজ যদি ভক্তপুর বা ভাতগাঁউ যায় গাড়ি, তো কাল যাবে ললিতপুর বা পাত্তান।····যাবে এবং তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসবে। কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না। সময়ের ভীষণ কড়াকড়ি।

এই কড়াকড়ির কথাটা আগেও অবিশ্যি শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম যে, টিকিটের 'রেটটা'ও নাকি বেশি। নেপাল কারেন্সিতে 'পার হেড্' 'পার ট্যুর' আট টাকা।

সব শুনে 'রাইনো-ট্যুর' পছন্দসই মনে হয়নি।

প্রদীপবাবুও ইন্ধন যুগিয়েছিলেন, দূর দূর! ওতে গিয়ে কেউ আবার কিছু দেখে! টাকাগুলো শুধু জলে ফেলে।

কিন্তু না, 'একেবারেই জলে ফেলে' বলতে আমি নারাজ। আমার ধারণা, 'রাইনো-ট্যুর'-এর যাত্রীরাও দেখে বৈকি! তবে 'পথে পথে ঘুরে বেড়ানো' বা 'দেখে দেখে চেখে বেড়ানো' যাত্রীদের তুলনায় কম দেখে।

এই আমার কথাই ধরা যাক। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছি অনেক; কিন্তু এ-দেখারও দরকার ছিল। 'রাইনো-ট্যুর'-এ না বেরোলে কাঠমাণ্ডুর রাজসিক হোটেলগুলোর সম্যক পরিচয় পেতাম

না। জানতেই পেতাম না যে, 'রাইনো-ট্যুর'-এর প্রায় অর্ধেকটাই হল কাঠমাণ্ডুর 'হোটেল-ট্যুর'।

হ্যাঁ, 'ট্যুর' শুরু হয় অচিরেই। গাড়ি এক হোটেল ছেড়ে অন্য এক হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। যাত্রীরা উঠে আসেন দেখতে দেখতে। কোনটি থেকে একজন, আবার কোনটি থেকে দু'জন ওঠেন।

'ট্যুরিস্ট্ বাস' সৌলটি হোটেলে যায় প্রথমে। হনুমান-ঢোকা পেরিয়ে, উত্তর দিকে এগিয়ে খানিকটা, পশ্চিমমুখো একটা পীচ-ঢালা পথ ধরে।

পথটা কিছুদূর গিয়েই নিরিবিলি একেবারে। হনুমান-ঢোকা বা বসন্তপুর এলাকার কোলাহল থেকে একেবারে আলাদা।

সৌলটি হোটেল আবার এ-পথটা থেকেও আলাদা হয়ে গিয়ে নিজের আভিজাত্য বজায় রাখছে। এ-থেকে বেরিয়ে-যাওয়া কাঁচা একটা পথ ধরে সামান্য একটু এগোলেই সৌলটি।

এই হল কাঠমাণ্ডুর এক নম্বর হোটেল। 'ফাইভ্ স্টার' হোটেল এটি, পুরোদস্তুর ইণ্টারন্যাশন্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড-এর।

দূর থেকে দেখলেও এর স্ট্যাণ্ডার্ড কিছুটা মালুম হয়। বুঝে নিতে আদৌ কষ্ট হয় না যে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে শুরু করে ড্রিংক্স্ এবং ড্যান্স্ অবধি সবরকম ব্যবস্থাই এতে আছে।

শুনেছি, ব্যবস্থার দিক দিয়ে না হোক, দক্ষিণার দিক দিয়ে এ নাকি কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলকেও হার মানায়। এখানে থাকতে গ্র্যাণ্ড-এর দ্বিগুণের চেয়েও নাকি বেশি টাকা লাগে।

—তা লাগুক, সৌলটি হোটেলের সামনে বসে ভাবি, ধনী বিদেশীরা এভারেস্ট্-এর দেশ দেখতে এসে সেলামী কিছু দিক। গরীব দেশটার এতে উপকার হবে ; বিদেশী মুদ্রা লাভ হবে কিছু।

এদিকে লাভ-ক্ষতির কথা ভাবতে গিয়ে খেয়ালই করিনি এতক্ষণ, গাড়ি ছেড়েছে। সৌলটি থেকে এক বিদেশিনী উঠেছেন গাড়িতে।

এবার অন্য এক হোটেলে যাত্রা-শুরু। সৌলটি হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে হনুমান-ঢোকার দিকেই ফিরে আসি আবার। এবং তারপর ঢোকা ছাড়িয়ে, কিছুটা পুবদিকে এগিয়ে, প্যানোরামা হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

এ-হোটেলটা সৌলটির মতো বাহারী নয়। শুনেছি, 'ডাব্‌ল্ স্টার' হোটেল এটি। এখানে থাকতে দক্ষিণাও নাকি সৌলটির তুলনায় অনেক কম।

প্যানোরামা থেকে দু'জন যাত্রী উঠলেন। ওঁদের একজন মাঝবয়সী এক সর্দারজী, অপরজন কুড়ি-বাইশ বছরের এক তন্বী।

প্রথম-দর্শনে তন্বীটিকে সর্দারজীর মেয়ে বলে মনে হয়। কিন্তু একটু আলাপ হতেই ভুল ভাঙে। বোঝা যায়, মেয়ে নন উনি; সর্দারজীর 'ধর্মপত্নী'।

এই 'পত্নী'টিকে নিয়ে সর্দারজী গিয়েছিলেন নামচেবাজার। এখন ঘরে-ফেরার পথে দু'চারদিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

—হঠাৎ নামচেবাজার? অবাক হয়ে শুধিয়েছিলাম ওঁকে।

উনি জবাব দিয়েছিলেন, হঠাৎ নয়। 'পত্নী'র পাল্লায় পড়ে।

—পাল্লা তবে রীতিমত কঠিন?

—হ্যাঁ, কঠিন তো বটেই! আরে মশাই, ও হল গিয়ে মানালীর মাউণ্টেনীয়ারিং ইন্‌স্টিট্যুট্-এর ট্রেনিং-নেয়া মেয়ে। আমি কি পারি ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে? বলেই আড়চোখে তাকালেন 'পত্নী'টির দিকে।

'পত্নী' কোন জবাব দিলেন না। গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। জবাব দিলাম আমি, কিন্তু দিব্যি তো দিয়েছেন পাল্লা!

—দিয়েছি। তবে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এজন্যে। ওফ্! কী যে দুর্গম পথ নামচেবাজার-এর!

এদিকে সর্দারজীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে খেয়ালই করিনি; ট্যুরিস্ট্ বাস এতক্ষণে অন্য আর একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ হোটেলটির নাম গ্রীন। এ-ও ডাব্‌ল্‌ স্টার।

এখান থেকে যাত্রী কেউ উঠলেন না। গাইড উঠে এলেন শুধু। উঠেই আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন, গুড্‌ মর্ণিং! জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান অ্যাণ্ড্‌ লেডিজ্‌!

গাইড-এর এই অভ্যর্থনা কুড়োতে গিয়েই সর্দারজীর গল্পে ছেদ পড়ে। সবাই আমরা ব্যস্ত হয়ে ওঁর দিকে তাকাই।

উনি থামেন নি তখনও। বলে চলেছেন, এখন আমরা যাব স্নো-ভিউ হোটেলে। ত্রিভুবন রাজপথ ধরে সোজা যাব।

তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন তিনি। রাজপথ এরই মধ্যে আমরা ধরেছি। গাড়ি সোজা উত্তর দিকে এগোচ্ছে। রত্না-পার্কের গা-ঘেঁষে ছুটছে বলতে গেলে। আর ওদিকে গাইডও দিব্যি ছুটিয়েছেন বক্তৃতা। বলছেন, বাঁ-পাশে ওই যে বিরাট বাড়িটা, ও-হল মিলিটারী হসপিট্যাল। ওর ঠিক পাশেই বীর হসপিট্যালকে দেখুন। আর ওই যে দেখুন, ঠিক বাঁ-দিকে সেণ্ট্রাল পোস্ট্‌-অফিস।...ভারত এটি উপহার দিয়েছে নেপালকে। 'এইড্‌ মিশন্‌'কে দিয়ে গড়িয়েছে।......তা এইড্‌ সবাই দেয় আমাদের। ভারত, চীন, পাকিস্তান, রাশিয়া, জার্মানী, আমেরিকা, —সবাই। ...সামনেই বাঁ-পাশে দেখুন 'আমেরিকান এম্‌ব্যাসী'; আর ওই যে, ডান-পাশে, নাকের ডগাতেই একেবারে 'জার্মান এম্‌ব্যাসী'।

এদিকে দেখতে দেখতে 'এম্‌ব্যাসী' এলাকা পেরিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গাড়ি; নেপাল-রাজপ্রাসাদকে ছুঁই ছুঁই করে।

প্রাসাদ চোখে পড়তেই গাইড নতুন উৎসাহে শুরু করেন, এ-হল আজকের রাজমহল। রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্না আজ এখানেই থাকেন।

মহলটিকে বিরাট মনে হয়। ঝড়ের বেগে ছুটেও সেটি পেরোতে অনেকক্ষণ সময় লাগে।

লক্ষ্য করি, বিরাট উঁচু প্রাচীরে তা ঘেরা। প্রাচীরের ওপর কাঁটা-তারের বেড়া রয়েছে আবার। আর প্রাচীর থেকে খানিকটা দূরে রয়েছে রাজপ্রাসাদ।

প্রাসাদটিকে ভাল নজরে পড়ছে না। গাছ-গাছালির আড়ালে প্রায় অদৃশ্য সে। দৃশ্য বরং নতুন আর একটি বাড়ি; প্রাসাদের খুব কাছেই তাকে গড়ে-তোলা হচ্ছে।

গাইড বললেন, এ-বাড়িতেই প্রাসাদ হবে ভবিষ্যতে; নতুন রাজপ্রাসাদ।

কিন্তু প্রাসাদ কত আছে কাঠমাণ্ডুতে? এক, দুই, তিন, চার, অজস্র? আন্তর্জাতিক মানের হোটেলগুলো সবই তো প্রাসাদ!

গাড়ি আর একটি প্রাসাদকে পেরিয়ে এলো দেখতে দেখতে। হোটেল শঙ্করকে পেছনে ফেলে উত্তর-পুব দিকে এগোল।

খানিকদূর এগোতেই স্নো-ভিউ হোটেল।

গাড়ি কয়েক মিনিট দাঁড়াল ওখানে। চার-পাঁচজন যাত্রী হেলতে হেলতে, দুলতে দুলতে এগিয়ে এলেন।

ওদিকে গাইড বলে চলেছেন সমানে। কাঠমাণ্ডুর হোটেল-গুলোর গুণাগুণ বর্ণনা করছেন।

—এবার ফিরব আমরা; তিনি বললেন, হোটেল শঙ্কর ও অন্নপূর্ণা হয়ে রত্না-পার্কের দিকে ফিরব।

ফিরলাম ঠিক। ফেরবার পথে হোটেল শঙ্কর ও অন্নপূর্ণাতেও গাড়ি দাঁড়াল। কিন্তু যাত্রী উঠল না একজনও।

গাইড অবিশ্যি আমাদের চমকে দিয়ে বললেন, দাঁড়ানোই বড় কথা এখানে; যাত্রীদের ওঠা-না-ওঠা নয়। যাত্রী কেউ না থাকলেও অন্নপূর্ণা, শঙ্কর বা সোলটি-জাতীয় অভিজাতদের ঠিক সেলাম জানাই আমরা। রোজই সকাল-বিকেল জানাই।

ভাবলাম, তাজ্জব ব্যাপার যা হোক! হোটেল-ভক্তির অনন্য-সাধারণ নিদর্শন!

গাড়ি এতক্ষণে করোনেশন হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আরও দু'তিনজন যাত্রী উঠেছেন এরই মধ্যে।

যাত্রীদের সবাই দূরদেশী পর্যটক। সর্দারজী আর ওই তন্বীটি ছাড়া ভারতীয় একজনও নেই।

না থাকুক। সর্দারজী একাই একশো। গাইড থামবার সঙ্গে সঙ্গেই উনি শুরু করেছেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কী যে দুর্গম পথ নামচেবাজার-এর!

এইখানে সর্দারজীর কথায় বাধা পড়ে আবার। গাড়ি ছাড়ে; আর গাইডও সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেন, এবার ঢুলিখেল-এর দিকে এগোচ্ছি আমরা। আসল 'ট্যুর' এই এতক্ষণে শুরু করছি।

এদিকে সর্দারজী খেঁকিয়ে ওঠেন, ট্যুর না রাবিস; যেতে নামচেবাজার, তো মুরোদ বুঝতাম!

বললাম, 'রাইনো-ট্যুর' নামচেবাজার অবধি কোনদিনই হবে না। তার চেয়ে ওদিককার গল্পটা শুরু করুন; দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। দেখার অভাব শুনে পুষিয়ে নিই!

—শুনুন যত খুশি; সর্দারজী বলেন, কিন্তু দোহাই আপনার! গল্প ভাববেন না একে। এর প্রতিটি ঘটনা দিবালোকের মতো সত্যি।... হ্যাঁ, সত্যি একদিন বেনেপা থেকে হাঁটা-পথে যাত্রা শুরু করি। সূর্য-কুশীর ওপর গড়ে-তোলা নড়বড়ে দু'টো সেতু পেরিয়ে ডোলালঘাট-এর দিকে এগোই।... সেদিন বেশ জোরেই এগোই আমরা। চড়াই-এর তুলনায় উৎরাই বেশি থাকায় এগোতেও খুব একটা কষ্ট হয় না। কিন্তু তবু ডোলালঘাট পৌঁছুতে পুরো একটা দিন লেগে যায়।.......পরদিন চড়াই বেয়ে স্বর্গে উঠি যেন। সারাদিনের ধকলের শেষে রিসিংগো পৌঁছুই। এই রিসিংগোতে ভাল বাজার আছে। তাই কেনাকাটি করতে হয় কিছু। অভিযানের জন্যে রসদ সংগ্রহ করতে হয়।......ওদিকে অভিযান পরদিনই শুরু করি আবার। অদ্ভুত সুন্দর সব উপত্যকা আর

ঝরনা দেখতে দেখতে কাটা-খোটে নামে এক জায়গাতে এসে আশ্রয় নিই।……কাটা-খোটে থেকে নামদে একদিনের পথ; এবং নামদে থেকে জিরি আরও একদিনের।……ওই জিরিতে সিকরেড-খোলা নামে নদী পেরিয়েছিলাম একটা। কিন্তু ওই নদীর কথা আজ আর তেমন মনে নেই। আজ মনে পড়ছে গৌরীশঙ্করের কথা। মনে পড়ছে, জিরি থেকে শঙ্করের যে অপরূপ দৃশ্য দেখেছি, জীবনে তা ভুলব না……দৃশ্যের দিক থেকে লিখু-খোলা উপত্যকাও অবিশ্যি কম যায় না। তবে বরাইখারগা হয়ে ওখানে পৌঁছুতে পুরো দু'টো দিন পেরিয়ে যায়।……লিখু-খোলার পরে চড়াই পথ আবার। জুনবেসী অবধি আবার স্বর্গে ওঠা।……কিন্তু স্বর্গের বুঝি শেষ নেই আর। আমাদেরও ওঠার বুঝি আর বিরাম নেই।……জুনবেসী থেকে বেরিয়ে নতুন করে উঠতে শুরু করি আবার। দুরন্ত রিংমো-খোলা পেরিয়ে দুধ-কুণ্ডের দিকে এগোই।……এই দুধ-কুণ্ড জায়গাটি অপরূপ। এখান থেকে তুষারাচ্ছন্ন মধ্য-হিমালয়কে দেখে মনে হয়, হাত বাড়ালেই বুঝি নাগাল পাব তাকে।……দুধ-কুণ্ডে একদিন বিশ্রাম নিয়ে বেনগড়-এর দিকে এগোই আমরা। মাঝপথে দাতে নামে একটা জায়গায় একরাত্রির জন্যে থামি।……দাতে আর বেনগড়-এর মধ্যে পড়ে দুধ-কুশী। অনেক কষ্টে তা পেরোই। কিন্তু বেনগড়ে পৌঁছুতেই সব কষ্ট পুষিয়ে যায় যেন। ওখান থেকে দুধ-কুশী নদী-উপত্যকার যে অপরূপ দৃশ্য দেখি, তার দৌলতে সব ক্লান্তি যেন উবে যায়।……কিন্তু গেলেও থামবার উপায় নেই। আরও এগোতে হবে। আরও!……এগোই ঠিক। পরদিনই খুমজুং-এর পথ ধরি।……ওই খুমজুং-এ বিশ্রাম নিয়ে একদিন, দুধ-কুশীকে আবার পেরিয়ে নামচেবাজারের দিকে এগোই। নামচেবাজার যখন পৌঁছুলাম, তখন সন্ধ্যে হয় হয়; সর্দারজীর তন্বী পত্নীটি নাটকীয়-ভাবে শুরু করলেন এইবার। বললেন, প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু ওই পাহাড়পুরীতে তখন বাজছে সূর্য-বিদায়ের কাঁসর-ঘণ্টা।

·····ঠিক সামনেই মাহালাংগুর-হিমলের চূড়ায় চূড়ায় আবির ছড়িয়ে পড়ছে।······আর দূরে, খানিকটা মাত্র দূরে লোৎসে-নুপৎসে গিরিশিরার তুষার-বসনের গায়ে গায়ে রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে কে যেন।·······লোৎসে-নুপুৎসেকে ছাপিয়ে-ওঠা এভারেস্ট্‌কে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে। তার এখানে-সেখানে জড়ো হওয়া মেঘের ঝালরকে মনে হচ্ছে সন্ন্যাসীর জটা।···কিন্তু জটাজুটবিলম্বিত আরও যে কত মহাত্মা সেখানে!···কোয়াংডে, ঠামসেরকু, কাংটেগা, আমা-দাবলাম—কত আরও!···এদিকে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে দেখতে দেখতে। মহাত্মারা দৃষ্টির আড়ালে চলে যান।·······খুম্বিলা পর্বতের বুকে মেষপল্লী নামচেবাজার হঠাৎ কেমন যেন স্তব্ধ, বিষণ্ণ ও থমথমে হয়ে ওঠে।···রাত্তিরে ঘুম হয় না ভাল।···অনেক দূর থেকে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসে।···বুঝি, হিমানী সম্প্রপাত মূর্তিমান শাসন হয়ে নামছে কোথাও, কোথাও আবার ঝরনাধারা মূর্তিমতী মা হয়ে ঘুম-পাড়ানীয়া গান গাইছে।···কিন্তু ওরা কারা? থেকে থেকে কারা কাঁদছে? দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন?···গভীর রাতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসি একবার। কয়েক শো ফুট নিচে দুধ-কুশী উপত্যকার দিকে তাকাই। স্পষ্ট নজরে পড়ে না কিছু; কিন্তু সন্দেহ হয়, কান্নাটা ওইখান থেকেই আসছে।···দুধ-কুশী উপত্যকায় হয়তো পাইনের মিছিল। উত্তুরে হাওয়ার চাবুক খেয়ে মিছিলের অভাজনরা কান্না শুরু করেছে হয়তো। হয়তো বা ওদেরই কাঁপন দুধ-কুশীর জলতরঙ্গের সঙ্গে মিলেমিশে দীর্ঘশ্বাস হয়েছে।··এদিকে সকাল হতেই দেখি ম্যাজিক! দেখি, দীর্ঘশ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। সারা পাহাড়পুরীতে খুশির ঝলক। প্রতিবেশী শৈলশিখরগুলো খুশি ছড়াচ্ছে। খানিকটা উঁচুতে থিয়াংবোচে বৌদ্ধ-বিহার থেকেও ছড়িয়ে পড়ছে খুশির আশীর্বাদ।···বিহার-এর চূড়ায় তাল তাল সোনা। ভোরের আলোয় চকমক করছে ওরা। গলে গলে চারিদিকে যেন ছড়িয়ে

পড়ছে।···কিন্তু দুধ-কুশীর ধারে-কাছের পাইনরা কোথায়?··· নদীখাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, পাইনের চিহ্নমাত্রও নেই। গ্র্যানিট-পাথরের অদ্ভুত আশ্চর্য এক গহ্বরের ভেতর দিয়ে দুধ-কুশী ছুটছে।···কিন্তু ছোটে কি শুধু দুধ-কুশীই? আর কেউ ছোটে না? যুগে যুগে অভিযাত্রীরা ছোটেনি এই নামচেবাজার দিয়ে? দুধ-কুশীর সঙ্গে পাল্লা দেয়নি ওরা? কুশীর জন্মতীর্থকে ছাড়িয়েও কি ওরা এগিয়ে যায়নি?···সেদিন আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম, যাচ্ছে ওরা। ওরা এগোচ্ছে।···এই নামচেবাজার-এর বেস্‌-ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এভারেস্ট্‌-এর পথ ধরছে সব।···দুর্গম পথ। ভার-পিঠে শেরপারা নুয়ে পড়ছে। ব্যস্ত হয়ে অভিযাত্রীরা তদারকী করছে।···আর অভিযাত্রী-দলগুলো এগোচ্ছে সার-বেঁধে, এঁকে-বেঁকে।···কত দল! সার-বেঁধে চলা কত লোক! এরিক সিপ্‌টন, ল্যাম্বার্ট, হাণ্ট, হিলারী, তেনজিং, নাওয়াং গোম্বু—ওঁরাও একদিন এই পথ ধরেই গেছেন।···তেনজিং-এর ছেলেবেলা কাটে এই নামচেবাজার থেকেই খানিকটা দূরে ঠামেতে।···"কী ওটা? ওই যে, আকাশ ফুঁড়ে স্বর্গের দিকে উঠে গেছে, ওটা কী?" ছেলেবেলায় প্রায়ই তিনি মাকে শুধোতেন।·· মা কিন্‌জোম্‌ বলতেন, "ওই হল চোমোলুংমা। তামাম পৃথিবীর মা উনি। উনি দেবী।"···ছেলে বলত, "ওই দেবীর কাছে যাওয়া যায় না?"··· মা জবাব দিতেন, "না, যায় না। এত উঁচু ওই পর্বত যে, ওর ধারে-কাছে পাখি অবধি যায় না।"···ছেলে ওদিকে নাছোড়বান্দা। "কিন্তু আমার যে যেতে ইচ্ছে করে!" প্রায়ই জানিয়ে দিত সে।··· মা বাধা দিতেন, "ইচ্ছে করলেও যেতে নেই বাবা। স্বর্গের দেবী থাকেন সেখানে। মানুষ সেখানে গেলে পাপ হয়।"···কিন্তু ছেলে শুনলে তো! চোমোলুংমার ডাক শুনতে পেয়েছে সে; মায়ের নিষেধ তার কানে পৌঁছুলে তো!···একদিন তেরো বছরের ওই ছেলেটি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোল। ঘর বলতে সোলো খুম্বুর এক

ছোট্ট গ্রাম ঠামে। আর বাইরে বলতে রুক্ষ, উঁচু-নীচু ও রাক্ষুসে সব পাহাড়।...কিন্তু তবু ছেলেটি ভয় পেল না মোটেই। সে ভাবল, চোমোলুংমা যেতে হলে ওই পাহাড়গুলো ডিঙোতে হবে।... ওদিকে পাহাড় ডিঙোতে গিয়ে আশ্চর্য এক পায়ে-চলা পথ চোখে পড়ল ছেলেটির। সে শুনল, এ পথ গেছে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর দিকে।...“রাজধানী? সে আবার কী জিনিস? কোথায় সে?...” ভাবতে ভাবতে উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ ধরে এগোয় ছেলেটি।... এদিকে পথ আর ফুরোয় না। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তাটা শেষ হয় না যেন কিছুতেই। অবশেষে চৌদ্দ দিন পর রাজধানী কাঠমাণ্ডুর দেখা মিলল। ছেলেটি অবাক হল দেখে যে, বড় অদ্ভুত এক জায়গায় এসেছে সে। জায়গাটিতে লোকজন কত! কত ঘরবাড়ি, বাজার-হাট! আর কত সুন্দর সুন্দর সব মন্দির!...রাজধানীকে দেখে আনন্দে আটখানা হল ছেলেটি। মনের সুখে সে ওখানকার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াল। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল পুরো দু'টি সপ্তাহ।...তারপর হঠাৎ একদিন মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল, বাবা ঘাঙ্ লা মিঙ্মার কথা। রাজধানীর পথে দাঁড়িয়েই ছেলেটি ভাবল, বাবা এখন কী করছে, কে জানে! কে জানে, মা কী করছে এখন!...ভাবতে ভাবতে ঘরের জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সে; রাজধানীতে দেখা-পাওয়া সোলো খুম্বুর কিছু লোকজনের সঙ্গ নিল। খুম্বুর লোকেরা রাজধানী থেকে ঘরে-ফেরার সময় যত্ন করে নিয়ে এলো ছেলেটিকে।...ছেলেটির মা-বাবা দীর্ঘ দেড় মাস পর তাকে দেখে হাতে চাঁদ পেলেন যেন। প্রথমে ওরা বুকে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। তারপর কষে কয়েক ঘা করে চড় মারলেন। ঠামে গ্রামটির দূর-দূরান্তর থেকে চিৎকার শোনা গেল ওঁদের,—“দুষ্টু ছেলে কোথাকার! না বলে-কয়ে পালিয়ে যাওয়া হয়েছিল!”... ছেলেটি প্রতিজ্ঞা করল সেদিন, আর কখনও পালাবে না!...কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙতে সময় লাগল মোটে

পাঁচ বছর। ঠিক পাঁচ বছর পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে আবার কাউকে কিছু না-বলে ঘরছাড়া হল সে।···এবার নতুন এক পথ ধরল ছেলেটি। রাজধানী কাঠমাণ্ডুর দিকে না গিয়ে দার্জিলিঙ্-এর দিকে এগোল।···এবারের পথ আরও দুর্গম। এ পথে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় কখনও। কখনও আবার পা টিপে টিপে চোরের মতো হাঁটতে হয়। এ পথে নদী পড়ে যখন-তখন। জলভরা ভীষণ সব পাহাড়ীয়া নদী। খুব সাবধানে ডিঙোতে হয় ওদের।··· ছেলেটি কিন্তু খুব সাবধানী। নদী ডিঙোবার সময় যেমন, অরণ্য বা পর্বত ধরে এগোবার সময়ও তেমনি সাবধানে পথ চলে সে। বার বার তার মনে হয়, যেমন করে হোক, চোমোলুংমায় তাকে যেতে হবে; তাকে বাঁচতে হবে।···"চোমোলুংমায় যাচ্ছে একদল যাত্রী। আগামী বছর যাচ্ছে"। সহযাত্রী থোন্‌ডুপ বলে।··· "আমিও যাব ওদের সঙ্গে; চোমোলুংমায় যাব"। আঠারো বছরের ছেলেটি জবাব দেয়।···"যাবে বৈকি! নিশ্চয়ই যাবে"! আশ্বাস দেয় থোন্‌ডুপ।···ছেলেটি আশ্বস্ত হয় না তবু। বলে,···"যদি যেতে হয় তো তাড়াতাড়ি চলো। নইলে সবাই আমাদের ফেলে চলে যাবে যে!"···"না না। যাবে না কেউ"। থোন্‌ডুপ বুঝিয়ে দেয়, "কেউ যাবে না, আমরা দার্জিলিঙ্-এ না পৌঁছুন অবধি।"··· "কিন্তু কখন পৌঁছুব আমরা?···কখন?" ছেলেটির প্রশ্নবাণে অস্থির হয়ে ওঠে তার দলের এগারো জন সঙ্গী।···এদিকে সঙ্গীদের সবাই কিন্তু ঘর-পালানো। ঠিক ওই ছেলেটিরই মতো না বলে-কয়ে চলে এসেছে ওরা। একদিকে দারুণ অভাব আর অন্যদিকে নতুনকে জানার প্রবল আগ্রহ ওদের ঘরছাড়া করেছে।···কিন্তু ছেলেটি টেক্কা দিল সবাইকে। শেষ অবধি সে আবার দলছাড়া হল। ঘটনাচক্রে সঙ্গীদের সবাই এগিয়ে গেল তাকে পেছনে ফেলে।··· এবার সিমনা নামে ছোট্ট এক পাহাড়ী শহরে এলো ছেলেটি। সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় হল রিঙ্গা লামার।···রিঙ্গা লামা লোক

ভাল। ছেলেটিকে আদর-যত্ন করে বাড়িতে নিয়ে গেল সে। শুধাল, "কোথায় যাবে তুমি"?···ছেলেটি জবাব দিল, "দার্জিলিঙ্। ওখান থেকে চোমোলুংমায় যাবে যাত্রীরা।"···রিঙ্গা লামা বলল, "কী আশ্চর্য! আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি। ব্যবসার কাজে দার্জিলিঙ্ যাচ্ছি। তুমি চলো না আমার সঙ্গে!"···ছেলেটি খুশি হয়ে বলল, "বেশ! চলুন!"···দেখতে দেখতে পথ-চলা শুরু হল আবার। তবে এবার আর পায়ে হেঁটে নয়, মোটরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দার্জিলিঙ্-এর কাছাকাছি একটি গ্রাম আলু-বাড়িতে ওরা পৌঁছুল। রিঙ্গা লামা বললে, "আমার এক ভাই পওরী চাষবাস করে এখানে। তুমি এখানেই থাক।"···ছেলেটি বাধ্য হয়ে কিছুদিন ওখানে থাকল। কিন্তু তার মন পড়ে রইল চোমোলুংমার যাত্রীদের কাছে।···অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের ও খুঁজে বের করল। দলনেতাকে গিয়ে বলল, "তোমাদের সঙ্গে চোমোলুংমায় যেতে চাই আমি। আমায় নেবে?"··· দলনেতা জবাব দিলেন, "না।"···"নেবে না? কেন নেবে না আমায়?" অবাক হয়ে শুধাল উনিশ বছরের ছেলেটি।···দলনেতা বুঝিয়ে দিলেন, "নেব না, কারণ, তোমার পোশাক-আশাক দেখে মালুম হচ্ছে, তুমি একজন নেপালী। কী জানো, নেপালী দিয়ে কাজ হবে না আমাদের। আমরা চাই শেরপা।"···ছেলেটি শেষ চেষ্টা করল এইবার; বলল, "বিশ্বাস করুন। আমি একজন শেরপা। নামচেবাজার-এর খুব কাছেই ঠামে অঞ্চলে থাকি।"···কিন্তু দলনেতা বিশ্বাস করলেন না এই কথা। ছেলেটিকে দলে না নিয়েই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চোমোলুংমা বা এভারেস্ট্-এর দিকে এগিয়ে গেলেন।···তিনি এগোলেন। কিন্তু উঠতে পারলেন না এভারেস্টে। উঠল এই ছেলেটি। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে সত্যি একদিন চোমোলুংমায় উঠল সে।

এদিকে নামচেবাজার, ঠামে আর তেনজিং-এর গল্প শুনতে শুনতে

খেয়ালই করিনি এতক্ষণ, গাড়ি এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে। সামনেই চোখে পড়ছে একটি বাজার।

সর্দারজী বললেন, দেখুন। এই হল বেনেপা। এইখান থেকেই নামচেবাজারে যাত্রা শুরু করি আমরা।

বেনেপা সম্বন্ধে 'রাইনো-ট্যুর'-এর গাইডও কী যেন বলছিলেন। কিন্তু ওঁর কথা কিছুই কানে গেল না আমার।·····বার বার আমার মনে হতে লাগল নামচেবাজার, ঠামে আর এভারেস্ট্-অভিযাত্রীদের কথা।

কিন্তু অভিযাত্রী আমরাই বা কম কিসে? এই যে বেনেপা ছাড়িয়ে, ভক্তপুর পেরিয়ে ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উঠছে গাড়ি, এ-ও কি রীতিমত একটা অভিযান নয়?

এ-ও বটে অভিযান, আজ ভাবি। বার বার আজ স্বপ্ন দেখি যেন। দেখি, যত ওপরে উঠছি, ভক্তপুরের মন্দির আর ঘরবাড়িগুলো ছোট হচ্ছে ততই।······ততই বিরাট ভক্তপুর একসঙ্গে যেন এই এতটুকু হয়ে উঠে ধরা দিচ্ছে।

এদিকে খানিকদূর এগিয়েই দক্ষিণ দিকে বাঁক নিল গাড়ি। ভক্তপুর হঠাৎ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। আর সামনের পথটা এক লাফে যেন উঠে গেল কয়েকশো ফুট।

কিন্তু ওঠার বুঝি শেষ নেই। পথেরও অন্ত নেই বুঝি। গাড়ি বাঁক নিচ্ছে তো নিচ্ছেই। উঠছে তো উঠছেই। সামনের পাহাড়টার চূড়া তাক করে যেন উঠছে।

হ্যাঁ, চূড়াই বটে। দেখতে দেখতে তা ডিঙিয়ে গেল গাড়ি। উৎরাই বেয়ে খানিকটা যেন নিচে নামল।

নিচে নামবার মুখেই তুষার-ধবলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আবার। আবার নাগেরকোট-এর নাটকাভিনয়।

তবে অভিনয়টা পুরোপুরি জমতে সময় লাগে আরও মিনিট দশেক। ঢুলিখেল পৌঁছুন অবধি অপেক্ষা করতে হয়।

ঢুলিখেল পৌঁছে দেখি, নাগেরকোট-এর সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল। এরা ঠিক যেন একই ছাঁচের দু'টি প্রেক্ষাগৃহ, নগাধিরাজের রঙ্গমঞ্চে ঠিক একই অভিনয় দেখছে অনুক্ষণ।

তবে ঢুলিখেল-এর তুলনায় নাগেরকোট ছিমছাম আরও। আরও পরিচ্ছন্ন। আদিম থেকে আধুনিক হবার সাধনাটা নাগেরকোট ঢুলিখেল-এর তুলনায় বেশি করেছে।

তা করুক। ওই আদিম বন্য ভাবটুকুর জন্যই ঢুলিখেলকে বেশি ভালো লাগে আমার। বেশি স্বাভাবিক মনে হয়।

এদিকে ঢুলিখেল-এ পৌঁছুবার খানিক পরেই 'রাইনো-ট্যুর'-এর গাইড ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চূড়াগুলোকে চিনিয়ে দিচ্ছেন একে একে। সর্দারজী সস্ত্রীক গিয়ে গাইড-এর পাশে দাঁড়িয়েছেন। আর আমি দাঁড়িয়েছি খানিকটা দূরে।

চূড়া চিনতে আর আমার মন চাইছিল না। অনেক চিনেছি। পর্বত বাহাদুর সব চিনিয়ে দিয়েছে।

কয়েকজন দূরদেশী ট্যুরিস্ট্‌কে দেখলাম মুভি-ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। এখানেও মুভি? বিরক্তিতে ভরে উঠল মনটা।

মনে হল, এখানে তো চলছে না কিছু। পাহাড় পারিষদরা চলছে না। অরণ্য চলছে না। সময় চলছে না। মুভি এখানেও?

এদিকে চূড়া দেখে সর্দারজী এগিয়ে এসেছেন এতক্ষণে। আক্ষেপ শুরু করেছেন, এবার ছুটি। ঢুলিখেল দেখে দেশে ফিরব এবার। পাহাড়-পর্বতে আর নয়।

—কেন নয়? সর্দার-গিন্নী প্রতিবাদের জন্যে কখন যে প্রস্তুত হয়েছিলেন, খেয়ালই করিনি।

—কেন নয়? হঠাৎ শুরু করলেন তিনি, গোঁসাইকুণ্ড দেখবার কথা ছিল না?

—না, ছিল না; সর্দারজী রীতিমত বিরক্ত, আর থাকলেও যে কথা সব সময় রাখতে হবে এমন কোন ধরাবাঁধা আইন নেই।

—কিন্তু মানাঙ্গার বেলায় তো আইন ছিল। সর্দার-গিন্নীও ছাড়বেন না কিছুতেই, তখন তো বললেই 'রোহ্‌টাং পাশ'-এ যেতে! পশমিনার ব্যবসা ফেলে রেখেও যেতে!

—যেতে তুমিও। ট্রেনিং ফাঁকি দিয়ে ঘর-বাঁধার স্বপ্ন দেখতে!

স্বপ্ন? ওদের এই দাম্পত্য-কলহ দেখে আমার মনটাও স্বপ্নে ডুবে গেল যেন। যেন স্পষ্ট মনে হল আমার, এমনই হয়। মাউন্টেনীয়ারিং-এর ট্রেনিং নিতে গিয়ে মানুষ ঘর-বাঁধার স্বপ্ন দেখে। আর ঘরে এসে দেখে, ট্রেনিং-এর জীবনটাই সুন্দর ছিল।···কী যে আসলে সুন্দর, মানুষ তা নিজেই জানে না।···এবং জানে না বলেই অদ্ভুত কতকগুলো 'ফ্যালাসী' তার জীবনটাকে অস্থির-উত্তাল করে তোলে।

এদিকে সর্দার-গিন্নীও অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমার কাছে নালিশ জানিয়ে বলছেন, কী জানেন, প্রতিটি পুরুষেরই তিনটি করে বৌ দরকার। একটি সাক্ষাৎ সীতা, কথায় কথায় সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা দেবে। আর একটি ফ্লোরেন্স নাইটেংগেল, সেবায়-শুশ্রূষায় নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দেবে। আর তৃতীয়টি উর্বশী; সে সেবাও করবে না, অগ্নিপরীক্ষাও দেবে না; নেচে-হেসে যখন-তখন শুধু স্বর্গীয় পুলক সৃষ্টি করবে।

আমি এই কথার জবাবে কী যেন বলতে চেষ্টা করি। কিন্তু তার আগেই সর্দারজী বাধা দেন, না না, তিনটি বৌ কেন মাত্র! বলা হোক যে ৩৬৫টি দরকার।

সেদিন বৌ-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা আরও খানিকদূর এগিয়েছিল; এবং গাইড যদি না ফেরার তাড়া দিতেন তো এই গবেষণা শেষ অবধি যে কোথায় গিয়ে ঠেকত, তা আমরা কেউ জানি না।

ফেরার পথে দেখি, শিখ-দম্পতি চুপচাপ। গাইড দম বন্ধ করে বসে। আর যাত্রীরা চূড়াদর্শন করেই চূড়ায়-চড়ার পরিশ্রমে অবসন্ন।

অদ্ভুত এক অবসন্নতা আমাকেও অবিশ্যি পেয়ে বসেছে। কয়েকদিন ধরে ধকল যাচ্ছে খুব। প্রতিবেশীর অরণ্যে-পর্বতে, মঠে-মন্দিরে খুব ঘুরেছি।

আজ প্রদীপবাবু সঙ্গে নেই। পুজোর ছুটির পর 'এইড্ মিশন্'-এর অফিস খুলে যাওয়ায় আসতে পারেননি। এলে এখনই হয়তো নতুন প্রোগ্রাম হ'ত। ঢুলিখেল থেকে ফিরে আবার কোথায় যাওয়া যায়, তা দিয়ে আলোচনা চলত।

কিন্তু না, সে-সব আলোচনা এখন বন্ধ। এখন আলোচনা চলছে মনে মনে। শিখ-দম্পতিকে নিয়ে চলছে।

ভাবছি, ওঁদের কি মানালীতে প্রথম-পরিচয়? সর্দারজী কি পশমিনার ব্যবসা করেন?

পশমিনা···মানালী···রোহ্টাং পাশ, দেখতে দেখতে বিপাশা নদীর দেশে চলে যাই যেন। যেন স্পষ্ট দেখি, বিপাশার তীরেই সর্দারজী দাঁড়িয়ে। অপরূপা এক তন্বীকে দেখছেন তিনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছেন।

তন্বীটি উঠছে খাড়া পাহাড় বেয়ে; 'মাউন্টেনীয়ারিং ট্রেনিং' চলছে।

ওই পাহাড়টিকে কে না চেনে! মানালী থেকে বশিষ্ঠ যাবার পথে সকলেই আজ দাঁড়ায় ওখানে। ট্রেনিং-পাহাড় দেখে।

দেখছিলেন সর্দারজীও। ঘটনাচক্রে 'ট্রেনী'কেও পেয়ে গিয়েছিলেন চোখের একেবারে সামনেই। কিন্তু হায় বিপাশা! কোথাকার ট্রেনিং কোথায় গিয়ে ঠেকে! কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! তাই না 'ট্রেনিং' পড়ে থাকে, পশমিনার ব্যবসা বন্ধ হয়। 'রোহ্টাং পাশ'-এ কপোত-কপোতী গুঞ্জরন করে। বিপাশাকে সাক্ষী রেখে মুগ্ধ দু'টি প্রাণী পথ চলে।

কিন্তু জীবনের পথ এমন অদ্ভুত কেন? দুরন্ত বিপাশার মতো সে-পথে কলকল খলখল করে ছোটা যায় না কেন? বিপাশার

তীরের ওই খাড়া পাহাড়টা ধরে ওঠার আনন্দ সে-পথে নেই কেন? তন্বীটি দুঃখে বিরক্তিতে একসঙ্গে হাজার প্রশ্ন করে একদিন।

পশমিনার ব্যবসায়ী সর্দারজী বুঝিয়ে দেন, জীবনটা এ-রকমই।

—তা কখনও হয়? প্রতিবাদ আসে অপর দিক থেকে, হিমালয়কে যে ভালোবেসেছে, সে কখনও ঘরে বসে থাকতে পারে? ডাক শুনতে পায় না সে? দূরের ডাক?

ভাবছিলাম সেদিন আকাশ-পাতাল। এমন সময় গাড়ি এসে ভক্তপুরের কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঁড়াল। শুনলাম, জল নেয়া হবে; এঞ্জিন নাকি গরম হয়েছে।

জল নেয়ার অবসরে প্রায় সবাই গাড়ি থেকে নামলাম। পায়চারি শুরু করলাম কেউ কেউ। ওদিকে পাহাড়ীয়া ছেলেমেয়েরা মুহূর্তের মধ্যে ঘিরে ধরেছে আমাদের; পয়সা চাইছে।

অনেকেই দিলেন পয়সা। অনেকে আবার পরম উৎসাহে ওদের ছবি তুলতে শুরু করলেন।

—আপনার ক্যামেরা নেই? আমার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ প্রশ্ন করেন সর্দারজী।

আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দি, না, নেই।

—সে কী! ছবি রাখেন না?

—রাখি। কিন্তু সে-সবই অপরের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করা।

—এই ধরুন না কেন, সর্দারজীর ক্যামেরাটিকে লক্ষ্য করে আমি আবার শুরু করি, ছবি আপনার কাছেও চাইতে পারি। আমার ঠিকানাটি দিয়ে বলতে পারি, দেবেন পাঠিয়ে এদিককার কিছু স্মৃতি।

—বেশ তো! দেব। দিন না ঠিকানা! সর্দারজী হাসিমুখে সাড়া দেন।

আমি ঠিকানা দি তৎক্ষণাৎ। সর্দারজীর ঠিকানাটাও নোট-বইতে লিখে রাখি। কিন্তু সর্দার-গিন্নীর দেখলাম, কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এখানে যেমন, কাঠমাণ্ডু পৌঁছেও তেমনি ঠিকানা বা ছবির ব্যাপারে আদৌ উতলা নন তিনি।

বিদায় নেবার সময় তিনি শুধু একটি কথা বললেন, যাবেন একবার। নামচেবাজার যাবেন। নামচেকে না দেখলে আসল নেপালের কিছুই দেখলেন না।

ঠিক। ঠিক। কিছুই দেখলাম না, 'রাইনো-ট্যুর' থেকে ফিরে ছত্রপটি যাবার পথে বার বার ভাবি।

কখনও আবার সান্ত্বনা দি নিজেকে, কে বলে, দেখলাম না! জায়গা না দেখি, মানুষ তো দেখলাম!...দেখলাম যে, সর্দার-গিন্নীর মতো কুশী বা বিপাশারা পাহাড়ীয়া পথেই মানায় ভালো। পর্বত বাহাদুররা পর্বতের বুকেই মানিয়ে যায়।

কিন্তু পর্বত-দর্শন তখনও বুঝি বাকি ছিল। তাই সেদিন 'এইড্ মিশন্'-এর অফিস থেকে ফিরেই নতুন প্রোগ্রাম শুরু করেন প্রদীপবাবু। বলেন, নাগেরকোট আর ঢুলিখেল দেখলেন; এবার কাকনীও দেখে আসুন।

বললাম, আর নয়, অনেক দেখেছি। আর তাছাড়া, পরশু সকালে পোখরা যাবার কথা।

—পরশুর পরদিন যাবেন।

—তা কী করে হয়! 'অ্যাড্ভান্স বুকিং' হয়ে গেছে।

—'বুকিং' নিয়ে ভাবেবেন না। 'রয়্যাল নেপাল এয়ার-লাইন্স্'-এ ফোন করে ও আমি ঠিক করে দেব।

—বেশ! দেবেন। কিন্তু আমার ছুটিটা দেবেন কি? কাঠমাণ্ডু আর তার আশপাশ দেখতেই যে ছুটি ফুরিয়ে এলো!

—ফুরোক। তাই বলে কাকনী দেখবেন না? এমন সুন্দর একটা জায়গা! আর এত কাছে এখান থেকে!

অগত্যা কাছের জায়গাটিকে দেখতে হল। পরদিনই সকালে একটি জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল ওদিকে।

শুনলাম, বেশি দূরের পথ নয় কাকনী। কাঠমাণ্ডু থেকে ১৮ মাইল মাত্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,৫০০ ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে সে-ও নাকি হিমালয়-দর্শনের প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। আর তাছাড়া, সে নাকি কাঠমাণ্ডু-উপত্যকার একদিকে, আর অপরদিকে ত্রিশূলী নদী-উপত্যকার সীমানা নির্দেশ করছে।

মনে মনে বললাম, খুব ভাল। নির্দেশককে দেখে নেয়া যাক তবে। কাঠমাণ্ডু-উপত্যকা ছাড়বার আগে সীমান্ত-প্রহরীকে একবার অন্ততঃ অভিবাদন জানানো যাক।

এদিকে অভিবাদনের মাহেন্দ্রলগ্ন অতি দ্রুত ঘনিয়ে আসে। ছত্রপটি পেরিয়ে, বালাজু-উদ্যান ছাড়িয়ে ত্রিশূলী রোড ধরি আমরা। কখনও ঘোর রুক্ষ, আবার কখনও ঘন সবুজ পাহাড়ীয়া পরিবেশ আমাদের অভ্যর্থনা করে।

তবে সবুজেরই জয়যাত্রা যেন। খানিকদূর এগোতেই মনে হল, জয়যাত্রা যেন সবুজেরই। পাহাড়ের গা-বেয়ে চূড়া অবধি উঠে-যাওয়া অরণ্য সবুজ; আবার ওই একই পাহাড়ের গা-বেয়ে ধাপে ধাপে নেমে-যাওয়া কৃষিক্ষেত্রও সবুজ।

এই সবুজের অভ্যর্থনা কুড়োতে কুড়োতে, নাম-না-জানা সব ঝরনার কলতান শুনতে শুনতে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই কাকনী পৌঁছুই আমরা। আমাদের গাড়ি এসে কাকনী-পর্বতের পাদদেশে দাঁড়ায়।

শুনলাম, গাড়ি এখান থেকে ট্যুরিস্ট্-বাংলো অবধি স্বচ্ছন্দেই যেতে পারে। যাবার অসুবিধে নেই কিছু। ভাল রাস্তা আছে।

ঠিক করলাম, ট্যুরিস্ট্-বাংলোতেই যাওয়া যাক সরাসরি। ড্রাইভারকে বলা যাক।

কিন্তু বলতে হল না বিশেষ কিছু। দেখা গেল, ড্রাইভার আমাদের কথাবার্তা থেকে আগেই বাংলোর আঁচ পেয়েছে। আর গাড়িও ছেড়ে দিয়েছে নির্দেশের অপেক্ষা না করেই।

কিন্তু তবু শুধালাম একবার, কোথায় চললে ?

ও বলল, ট্যুরিস্ট্-বাংলো।

—ঠিক আছে, যাও।

গেলাম ঠিক। চড়াই বেয়ে আরও খানিকটা ওপরে উঠলাম।

খানিকদূর উঠেই দেখি, ঢিবির মতো একটা পাহাড়। এবং পাহাড়টার একেবারে চূড়ায় একটা দোতলা বাড়ি।

—ওই হল ট্যুরিস্ট্-বাংলো। ড্রাইভার বুঝিয়ে দেয়।

অথচ না বোঝালেও চলত। চ্যাপ্টা-মতো ওই পাহাড়টির ওপরে মূর্তিমান নিঃসঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে-থাকা ওই বাড়িটিকে ঠিকই আমরা চিনতাম।

বাড়ির দিকে এগোই এবার। পাথুরে সিঁড়িপথ ভেঙে ধীরে ধীরে তার কাছে আসি।

কিন্তু কাছে আসতেই ম্যাজিক যেন। অবগুণ্ঠন খুলে রেখে পশ্চিম-হিমালয় একেবারে যেন সামনেই হাজির।… স্পষ্ট চোখে পড়ে হিমালয়ের অসংখ্য চূড়া।…চোখে পড়ে, কিন্তু চেনা যায় না ঠিক। …তবে গণেশ হিমলকে চিনতে অসুবিধে হয় না কিছু। তার চার-চারটি চূড়া চেনা দেবার জন্যেই যেন ভুবন-ভোলানো তুষার-কিরীট-গুলোকে মেলে ধরে।

ওদিকে আমাদের দেখতে পেয়ে ট্যুরিস্ট্-বাংলোর ম্যানেজার এসে গেছেন। বিনীত নমস্কার জানিয়ে অভ্যর্থনা করছেন অতিথিদের।

ম্যানেজার-সাহেবের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ট্যুরিস্ট্-

বাংলোতে ঘরের সংখ্যা মোট চার; আর বেড্-এর সংখ্যা আট। একটি ছাড়া সব বেড্ই এখন ফাঁকা। অতএব থাকার ব্যাপারে অসুবিধে নেই কিছু।

—কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে? শুধোন মাত্রই ম্যানেজার-সাহেব জবাব দিলেন, অসুবিধে আছে। ট্যুরিস্ট্রা নিজেরাই এখানে রান্না করে খান।

—কিন্তু আমরা যে খেতেই জানি শুধু! রান্নাটা জানি না। আমি করুণভাবে নিজেদের অক্ষমতা নিবেদন করি।

ম্যানেজার-সাহেব অভয় দেন, ঠিক আছে। ঘাবড়াবেন না। খাবার বাইরে থেকে আনিয়ে দেব।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি কথা রেখেছিলেন তিনি। ভাল খাবারই আনিয়েছিলেন।

আর না আনালেই বা কী! কাকনীতে ছিলাম তো মাত্র কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা।

পরদিন ভোরেই কাঠমাণ্ডু বেরিয়ে পড়েছিলাম আবার। কাকনীর অধিবাসী তামাঙ্দের ভাল করে না দেখেই, আপেল-বাগিচায় ভাল করে না ঘুরেই রাজধানীর দিকে ছুটেছিলাম। ফেরবার পথে আমাদের সঙ্গী ছিলেন সুরেশচন্দ্র রক্ষিত। সেই 'ইণ্ডিয়া এইড্ মিশন্'-এর সুরেশচন্দ্র, কাঠমাণ্ডু আসবার পথে দামনে উঠেছিলেন যিনি; এবং যিনি পালঙ্-এ নেমে গিয়েছিলেন।

সুরেশবাবুর সঙ্গে ট্যুরিস্ট্-বাংলোতেই দেখা।

—আপনি এখানে? অবাক হয়ে শুধিয়েছিলাম ওঁকে।

উনিও অবাক হয়েছিলেন, আপনি?

—এই ঘুরতে ঘুরতে।

—আমি 'এইড্ মিশন্'-এর কাজে।

—ক'দিন থাকবেন?

—আর একদিন। কাল সকালেই ফেরার কথা।

—কোথায় ফিরবেন ?

—কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি।

—ভালই হল। একসঙ্গে ফেরা যাবে।

—একসঙ্গে ?

—হ্যাঁ, আমরাও কাল কাঠমাণ্ডু ফিরছি।

—বেশ তো! গল্প করতে করতে ফেরা যাবে।

সুরেশবাবুর কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্যি। পরদিন অনেক গল্প হল ফেরার পথে। নাগেরকোট, কাকনী, পোখরা, পাত্তান, ভক্তপুর, জনকপুর অনেক জায়গাকে নিয়ে কথা উঠল।

জনকপুর যাচ্ছি না শুনে সুরেশবাবু স্তম্ভিত।

—সে কী! যাচ্ছেন না ? সবিস্ময়ে বলেছিলেন তিনি।

আমি বলেছিলাম, না, এ-যাত্রায় আর হল না। হাতে সময় নেই। আর তাছাড়া, যাতায়াতের অসুবিধে অনেক।

—অসুবিধে! বলেন কী! ওখানেই তো যাতায়াতের সুবিধে। দ্বারভাঙা থেকে জয়নগর হয়ে ট্রেনে যাওয়া যায় ওখানে।

—বেশ তো! যাব একবার।

—এবারেও যেতে পারেন। কাঠমাণ্ডু থেকে প্লেন যায় জনকপুর।

—না না, প্লেন নয়; যদি যাই তো ট্রেনেই যাব।

—খুব ভাল। তাই যাবেন। ওখানকার জানকী-মন্দিরকে দেখে আসবেন একবার।

—আপনি দেখেছেন নাকি ?

—একবার নয়, কয়েকবারই দেখেছি। 'এইড্ মিশন্'-এর কাজে জনকপুরে মাঝে মাঝে যেতে হয় আমার।…কী জানেন, ওখানকার জানকী-মন্দিরটি বড় সুন্দর। মন্দিরের সীলিং-এ মার্বেল-পাথরের কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর এছাড়া, বাইরে থেকে দেখলেও মন্দিরটিকে ভাল লাগে।

—ভাল লাগার মতো মন্দির কাঠমাণ্ডুতেও তো কত দেখলাম।

—তা দেখুন ; কিন্তু এর জাত একেবারে আলাদা। নেপালের অন্য কোন মন্দিরের সঙ্গেই মিল নেই এর।…এর গম্বুজ, চূড়ামণি, ঝুল-বারান্দা, দেওয়ালের গায়ে কারুকার্য—সব কিছুই ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।‥ আর স্মরণ করিয়ে দেয় রামায়ণের সেই অমর কাহিনী।‥সেই মিথিলার রাজা জনক, রাজধানী জনকপুর, রাজনন্দিনী সীতা, হরধনু-ভঙ্গ, রাজরাজেশ্বর রাম ও রাম-জানকীর পরিণয়।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ফেলে সুরেশবাবু হাঁপাতে লাগলেন।

আমি বললাম, বেশ! জনকপুরে যাব একবার। জানকী-মন্দিরকে দেখব।

—দেখবেন, নিশ্চয়ই দেখবেন। বলতে বলতে বালাজু-উদ্যানের কাছে সুরেশবাবু নেমে গেলেন সেদিন। নামবার মুহূর্তে একবার শুধিয়েছিলাম ওঁকে, হঠাৎ এখানে? এই বালাজুতে?

সুরেশবাবু সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিলেন, এখানেও গবেষণা। নেপালের বৈষয়িক উন্নতি নিয়ে নতুন গবেষণা চলছে এখানেও।

ভাবলাম, আশ্চর্য! আশ্চর্য এক মানুষ এই সুরেশবাবু! সেবারে যেমন, এবারেও তেমনি পথে উঠলেন তিনি, পথেই নামলেন। বৈষয়িক উন্নতির পথে নেপালের জীর্ণ, শীর্ণ; অথচ চলমান প্রয়াসকে তিনিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যেন।

কিন্তু দেখার তখনও বুঝি বাকী ছিল। কাঠমাণ্ডু ছেড়ে পোখরা যাবার দিন মর্মে মর্মে তা টের পেলাম।

—ব্যাপার কী? ছেলেপিলে কই বাড়িতে? প্রদীপবাবুকে অভিযোগ করলাম একবার।

প্রদীপবাবু জবাব দিলেন না কিছু। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

বললাম, না না; এসব চলবে না। সামনের বার এসে যেন ছেলেপিলে দেখি।

কয়ালবাবু টিপ্পনী কাটলেন, সামনের বার 'এইড্ মিশন্'-এর এই স্টাফ্ থাকে কিনা দেখুন!

বললাম, যে স্টাফ্ই থাকুক, আপনাদের 'মিশন্' তো সাক্সেস্ফুল?

প্রদীপবাবু বললেন, হ্যাঁ, 'মিশন সাকসেস্ফুল; বাট্ মিশনারী ডাইড্'।

—মানে?

—মানে? কয়ালবাবু বুঝিয়ে দিলেন, প্রদীপবাবুর একটি ছেলে হয়েছিল মাস কয়েক আগে। কিন্তু তিন দিনের দিন…

প্রদীপবাবু বাকি অংশটা পূর্ণ করে দিলেন, মিশনারী ডাইড্।

—ডাইড্? প্রদীপবাবুর স্ত্রী শুভ্রার দিকে তাকালাম একবার। দেখলাম, তার চোখ ছলছল করছে।

কাঠমাণ্ডু ছেড়ে চলে আসার মুহূর্তে মনটা ভারী হয়ে ওঠে আমারও। কিন্তু তবু এগিয়ে চলি আবার। আবার অজানার পথ ধরি।

এবার যাব পোখরা। অন্নপূর্ণা আর ধবলগিরির দেশে যাব।

বারো

চলেছি পোখরা। খানিক আগে কাঠমাণ্ডু ছেড়েছি। মনটা সেই থেকে ভারী। প্রদীপবাবুর কথাটা মনে আসছে বার বার, মিশন সাক্‌সেস্‌ফুল, বাট্‌ মিশনারী ডাইড্‌।

কিন্তু মিশনারী কত রকমের যে আছে এই দুনিয়ায়!

আমার পাশেই দেখলাম একজন। ম্যারী রুবেল-এর 'দি গড্‌স্‌ অব্‌ নেপাল' বইটি হাতে নিয়ে বসে। দেখলাম, ভদ্রমহিলা বিদেশিনী। ইংরেজ, জার্মান বা ফরাসী-টরাসী হবেন হয়তো। কৌতূহল হল ; ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে তো বটেই, বইটি সম্বন্ধেও।

একবার বললাম, যদি কিছু মনে না করেন তো বইটি একটু···

—ওহ্‌! শ্যুর শ্যুর! মহিলাটি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং আমি কথা শেষ করার আগেই বইটি তুলে দিলেন আমার হাতে।

বললাম, থ্যাঙ্ক্‌ ইউ!

—নিড্‌ নট্‌ মেন্‌সান্‌! বিনীত জবাব এলো অপরদিক থেকে।

আমি এইবার 'দি গড্‌স্‌ অব্‌ নেপাল'-এর পাতা ওল্টাতে শুরু করি। পড়বার চেষ্টা করি কিছু।

কিন্তু পড়ে, কার সাধ্যি! রয়্যাল নেপাল এয়ার-লাইন্‌স্‌-এর ফ্রেণ্ড্‌সিপ্‌ প্লেনখানা যেন ডিগবাজী খেতে খেতে ছুটছে।

অগত্যা পড়া বন্ধ করে আত্মরক্ষার উদ্যোগ করি। কোমরে বেল্ট বাঁধি।

কিন্তু বিদেশিনী দেখলাম নির্বিকার। কোনদিকে এতটুকু যদি ভ্রূক্ষেপ থাকত ওঁর! এদিকে ওঁর এই ভ্রূক্ষেপহীন নিরাসক্ত ভাবটাই কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তোলে আমার। আমি নিজের মনকেই একের পর এক প্রশ্ন করি, কে ইনি? কোথায় চলেছেন? পোখরা? আসছেন কোত্থেকে? ইংল্যাণ্ড? একা আসছেন?

দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে ওঁর সঙ্গে; এবং অধিকাংশ প্রশ্নের জবাবও কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেয়ে যাই।

—হ্যাঁ, একাই আসছেন উনি। ইংল্যাণ্ড থেকেই আসছেন। ওঁর নাম মিসেস জেইন টমাস। প্রতি বছর উনি নেপাল আসেন। কাঠমাণ্ডু হয়ে পোখরা আসেন প্রতি অক্টোবরে।

—কিন্তু কেন আসেন? ওঁকে শুধিয়েছিলাম একবার। একটু যেন খোঁচা দিয়েই বলেছিলাম, প্রতি বছর একই জায়গা দেখতে ভালো লাগে?

মিসেস জেইন টমাস হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন এ-কথায়। জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ, লাগে। কারণ, এইখানেই···

হঠাৎ দারুণ দোল খেয়ে ওঠে ফ্রেণ্ড্‌সিপ্‌ প্লেনটা। মিসেস জেইন টমাস-এর কথার খেই হারিয়ে যায়।

আমি আবার শুধোই, এইখানে কী?

মিসেস টমাস এই কী-র জবাবে যা বলেছিলেন, নেপালের অন্য সব কাহিনী ভুলে গেলেও তা আমি জীবনে ভুলব না।

মনে পড়ে, মিসেস টমাস বলেছিলেন পনের-বিশ বছর আগেকার মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনার কথা। ধবলগিরি অভিযানে গিয়ে তিনজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী কিভাবে প্রাণ হারান, সে-কথা।

ওই অভিযাত্রীদেরই একজন তাঁর স্বামী মিঃ টমাস। প্রায় বাইশ হাজার ফুট উঁচুতে ভয়াবহ এক হিমানী-সম্প্রপাত অতর্কিতে আঘাত হানে তাঁকে। হাজার নেকড়ের বিভীষিকা নিয়ে তাঁকে থাবা মারে। তিনি এবং তাঁর দু'জন সহযাত্রী মারাত্মকভাবে আহত হন। ওদিকে অন্য সহযাত্রীরা আশা ছাড়েন না কিছুতেই। বলেন, এক অভিযান ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু তাতে কী! অন্যটাতে সফল হব। তাড়াতাড়ি পোখরা ফিরে গিয়ে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে তুলব আহত বন্ধুদের।···কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত কেউ-ই

বাঁচলেন না। দু'জন পথেই শেষ হয়ে গেলেন। আর তৃতীয়জন মিঃ টমাস গেলেন পোখরা পৌঁছে।

এই পোখরাতেই সমাধি আছে মিঃ টমাস-এর। তাঁর বন্ধুদের গড়া ছোট্ট অথচ পবিত্র এক সমাধি। মিসেস টমাস প্রতি বছর যান ওখানে। স্বামীর মৃত্যুদিনে সমাধির পাশে বসে প্রার্থনা করেন।

—কী জানেন! প্রার্থনা বিফল হয়নি। সানন্দে জানিয়েছিলেন মিসেস টমাস, ধবলগিরি শেষ অবধি হার মেনেছে। মানুষ জয় করেছে তাকে। মিশন শেষ অবধি সাক্সেস্‌ফুল।

বললাম, হ্যাঁ, সাক্সেস্‌ফুল। মিশন সাক্সেস্‌ফুল; বাট মিশনারী ডাইড্‌।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রদীপবাবুর কথাটাই বললাম আবার। আবার ভাবলাম, মিশনারী কত রকমের যে আছে এই দুনিয়ায়! এ ভদ্র-মহিলাও তো একজন মিশনারী! অদ্ভুত আশ্চর্য এক মিশন নিয়ে পোখরায় যাচ্ছেন উনি। প্রতি বছরই যান।

দেখতে দেখতে পোখরার গল্প জমে ওঠে ওঁর সঙ্গে।

উনি দেখলাম, উচ্ছ্বসিত; পোখরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ একবারে।

বললেন, জায়গাটাকে দেখলে কী মনে হয়, জানেন? মনে হয়, যেন সব ঠিক ছিল। সব।

ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা আর মাচ্ছাপুছ্‌রে মিলে তাকে গ্রাস করবে, ঠিক এইরকম একটা পরিকল্পনা যেন ছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল, কেমন করে যে সব বানচাল হয়ে গেল, হিমসমাধি লাভ করতে করতে অল্পের জন্যে কেমন করে যে বেঁচে গেল পোখরা-উপত্যকা, কেউ তা জানে না। কিন্তু পোখরায় এসে দাঁড়ালে জানবার ইচ্ছে হয়। মনে হয়, এর সবুজ মাঠে-ময়দানে একটিবার কান পাতলেই মুহূর্তে সব রহস্য জানা যাবে। প্রাগৈতিহাসিক অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে নিজেই উপযাচক হয়ে এসে ধরা দেবে পোখরা।

কিন্তু হায় রে প্রাগৈতিহাসিক মায়াজাল! তাকে পোষ মানানো কি এতই সোজা! মনে পড়ে, মিসেস টমাস-এর সঙ্গে কথা বলার অবসরে এই পোষ মানাবার কথাই ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম, পথের দূরত্বকে তো জয় করল মানুষ! কিন্তু কালের দূরত্বকে করল কি? মহাকাল যেখানে দু' হাতে দু'টি অবগুণ্ঠন নিয়ে অতীত আর ভবিষ্যৎকে প্রহরা দিতে ব্যস্ত, সেখান থেকে বাস্তবাগীশ মানুষ কি বলার মতো খবর সংগ্রহ করল কিছু?

অস্বীকার করব না, কিছু খবর সে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সে খবর এমন কিছু নয়, যা দিয়ে কালের দূরত্বকে পথের দূরত্বের মতোই খাটো করা চলে।

পথ দেখতে দেখতে কত যে খাটো হয়ে এলো বিজ্ঞানের দৌলতে!

এই কাঠমাণ্ডু-পোখরা পথের কথাই ধরা যাক। প্রায় একশো মাইল এই পথটুকু বিমানে পাড়ি দিতে আমাদের এক ঘণ্টাও লাগবে না; কিন্তু পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে গেলে এক সপ্তাহেরও বেশি লাগত নিশ্চয়।

শুনেছি, কিছুদিন আগেও কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা পায়ে হেঁটেই যেত সব; এবং যাওয়া মানেই ছিল রীতিমত একটা অভিযান।

কাঠমাণ্ডু থেকে কাকনী যেতে হত প্রথমে এবং তারপর কাকনী থেকে ত্রিশূলী।

এই ত্রিশূলী জায়গাটা রাজধানী থেকে ২৫ মাইল দূরে। আজ ওখানে হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্টেশন গড়ে উঠেছে। কিন্তু কয়েক বছর আগেও কোথায় ছিল ইলেকট্রিক! তখন সে-পথে আলোক ছড়াবার দায়িত্বটা সূর্য এবং রডোডেনড্রন ফুলগুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছিল।

হ্যাঁ, রডোডেনড্রন অনেক ছিল ওদিকে। ত্রিশূলী থেকে সমারি হয়ে কাটুঞ্জে যাবার পথে হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে ছিল ওরা।

কিন্তু ওরাই ছিল শুধু? শুধু কোমলরাই ছিল? ভীষণরা নয়?

নেপালীরা জবাব দেয়, কে বলে, নয়! ভীষণদেরই রাজত্ব ছিল সে-পথে। সেদিককার চড়াই-উৎরাই ভীষণ, খাদগুলো ভীষণ; ভীষণ নদীনালাগুলো।

নদী কত যে সে-পথে! কত ভয়ঙ্করী যে সেই পাহাড়ী পথে নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে পথ চলে!

ত্রিশূলী চলে কোথাও। কোথাও আবার চলে ভারাঙ্-ভুরুঙ্-খোলা। আঁখু কুল কুল করে চলে কোথাও। কোথাও আবার মত্ত মাতঙ্গিনীর মতো চলে বুধি-গণ্ডকী। ভুশুণ্ডী-খোলা ঢিমে তালে চলে কোথাও। কোথাও আবার বিজয়পুর-খোলা বা শ্বেতী নদী দ্রুত লয়ে চলতে চলতে পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

কিন্তু দাঁড়ালই বা! পাহাড়ীয়া কলমুখরাদের শাসন ক'জন শুনত আর! প্রাণের দায়েই মানুষকে তখন ছুটতে হ'ত দুর্গম ওই পার্বত্য-পথে।

সে-পথে জনপদ কত! কত গ্রাম! হান্সে বাজার, অরু ঘাট, খান্চক্, গোর্খা, জার্ওয়ার্, খোপ্ল্যাঙ্, তার্কু ঘাট, কুন্ছা, দেওরালী—সবাই সে-পথে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিমান চালু হওয়ায় সে-পথটা কি অকেজো হয়ে গেল এখন?

নেপালীরা জানায়, অকেজো! কে বলে, অকেজো হল! বিমান তো কাঠমাণ্ডু-পোখরা পথের বড় জোর দু'টি মাত্র জায়গায় ভরতপুরে বা গোর্খায় নামিয়ে দিতে পারে আপনাকে। বাকি প্রায় সব জায়গাতেই আপনাকে যেতে হবে পায়ে হেঁটে। কেননা, বাস বা ট্রাক চলে না সে-পথের বেশির ভাগ অংশেই। জীপ চলারও প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রেই ওঠে না।

অবিশ্যি শুনেছি, গাড়ি চলাচলের আয়োজন নাকি চলছে। কাঠমাণ্ডু-পোখরা পথটা তৈরি হচ্ছে দ্রুত। রাজধানী থেকে ত্রিশূলী অবধি প্রায় ৪৪ মাইল পথে এরই মধ্যে গাড়ি চলছে।

চলুক গাড়ি। কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরার পুরো ওই ১০০ মাইল পথেই গাড়ি চলুক। সেদিন বিমানে যেতে যেতে ভাবি, গাড়ি যদি চলে তো নেপালের সাধারণ মানুষদের দুঃখ-কষ্ট কমবে; আর আমাদের মতো পর্যটকদের দেখার সুখ বাড়বে।

কারণ, গাড়িতে ভ্রমণ করলে দেখা যায় অনেক কিছু। কিন্তু বিমান-ভ্রমণটাকে চিরকালই আমার ভ্রমণের প্যারোডী বলে মনে হয়।

প্যারোডীর কথাটা মনে এলো সেদিনও। সেদিনও ভাবলাম, এই যে নিচে রিলিফ্-ম্যাপ দেখছি, একে নেপাল না ভেবে ভূপাল ভাবলে ক্ষতি আছে কি কিছু?

—না, ক্ষতি আছে। হঠাৎ একবার মনে হল যেন। একবার হঠাৎ যখন মেঘের আবরণ সরে গেল, যখন অন্নপূর্ণা আর ধবলগিরি তাদের ভুবন-ভোলানো মহিমা নিয়ে ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে, তখন স্পষ্টই মনে হল, ক্ষতি আছে। হিমকান্তা এই রূপপুরীকে অন্য কিছু ভাবলে ক্ষতি আছে। এ-পুরী অতুলনীয়, অনির্বচনীয়, অপরূপ।

ধীরে ধীরে অপরূপেরই খাসমহল পোখরায় নেমে এলাম আমরা; এবং নেমেই মনে হল, যেন সব ঠিক ছিল, সব। ধবল-গিরি, অন্নপূর্ণা আর মাচ্ছাপুছ্রেরা মিলে তাকে গ্রাস করবে, ঠিক এইরকম একটা পরিকল্পনা যেন ছিল।

পরিকল্পকদের একজনকে সামনেই দেখছি একেবারে। মাচ্ছাপুছ্রেকে দেখছি। দেখছি, পোখরা-উপত্যকার একপ্রান্তে মুকুট একটি। আকাশ-ছোঁয়া বিরাট এক মুকুট, রাজ্যের যত রুপোলী ঝালর গায়ে মেখে ঝলমল করছে।

প্রথম-দর্শনেই মাচ্ছাপুছ্রেকে চিনতে কষ্ট হয়নি এতটুকু। মাছের পুচ্ছের মতো দেহ ওর, তাই মাচ্ছাপুছ্রে; তাই কষ্ট হয়নি চিনতে।

কিন্তু মাচ্ছাপুছ্‌রের ঠিক পাশেই কী ওরা? ওই যে দু'টো 'অদ্ভুত', মেঘলোক ভেদ করে স্বর্গলোকের দিকে উঠে গেল, ওরা কী?

—ওরাই অন্নপূর্ণা। মিসেস টমাস উপযাচক হয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

কিন্তু না বোঝালেও চলত। অন্নপূর্ণার কথা এত শুনেছি, এত ছবি দেখেছি তার এবং এতদিন ধরে এতভাবে তার মূর্তিটিকে মনের মধ্যে লালন করেছি যে, কেউ না বলে দিলেও ঠিক বুঝে নিতাম, ওই হল অন্নপূর্ণা।

বিমানে আসতে আসতেও অন্নপূর্ণাকে ঠিকই চিনেছিলাম। চিনবার জন্যে কারও সাহায্য নিতে হয়নি।

এদিকে পোখরায় নেমে অন্নপূর্ণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন মিসেস টমাস। বললেন, এখন আসি! আবার দেখা হবে!

কিন্তু কখন দেখা হবে? কোথায় উঠবেন উনি?

কিছুই বললেন না মিসেস টমাস। এয়ার-পোর্টের ঘন-সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে বলতে গেলে ছুটলেন।

কিন্তু আমাকে ছুটলে চলবে না। অন্নপূর্ণা পর্বতকে চিনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলেও চলবে না। অন্নপূর্ণা হোটেলেরও খোঁজ করতে হবে।

এদিকে খোঁজ করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল, 'দি গড্‌স্‌ অব নেপাল' আমার হাতেই থেকে গেছে। মিসেস টমাসকে ফেরৎ দেওয়া হয়নি। কিন্তু তবু করলাম হোটেলের খোঁজ। এক সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে অন্য একটির সমাধানে মাতলাম। প্রদীপবাবুর পরামর্শ মতো স্থানীয় একটি লোককে শুধালাম, ভরা পরণা অন্নপূর্ণা হোটেল মাইলে কহন পৌনা সাকছু? অর্থাৎ, অন্নপূর্ণা হোটেলটি কোথায়, বলতে পারো?

লোকটি বলল, হো; অর্থাৎ হ্যাঁ, পারি।

বললাম, পারো তো খুব ভালো। কত দূরে সেটা? কাটি টাটা ছা?

লোকটি জানাল, কির্‌পয়া সোজহৈ যান্থু হোস। অর্থাৎ, দয়া করে সোজা যাও। ঠিক পেয়ে যাবে।

কিন্তু দয়া আর করতে হল না। পথ চিনে-নেওয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতে হল না। তার আগেই একটি কুলি এসে সাহায্য করল। মালপত্তরগুলো উঠিয়ে নিয়ে সে সোজা চলল অন্নপূর্ণা হোটেলের দিকে।

রাস্তায় পা দিয়ে দেখি, অন্নপূর্ণা হোটেল নাকের ডগায় একেবারে!

হ্যাঁ, আমার নাকের ডগায় অন্নপূর্ণা, আর পায়ের ডগায় এয়ার-পোর্ট।

পোখরার হোটেলগুলো এয়ার-পোর্টের গা-ঘেঁষা যেন। তবে পোর্টের 'রান-ওয়ে' থেকে খানিকটা উঁচুতে ওরা। 'রান-ওয়ে'র দিকে মুখ করে ওরা সারবেঁধে দাঁড়িয়ে।

অবিশ্যি সারটা বড় নয় খুব একটা। মোট তিনটি মাত্র হোটেলকে মূলধন করে পোখরা তার ট্যুরিস্ট্‌দের অভ্যর্থনা জানায়।

ওই মূলধনগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা বলতে গেলে পোখরা পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার হয়েছিল। অন্নপূর্ণায় ঢুকবার আগে বাকি দু'টোকেও যাচাই করে নিতে হয়েছিল আমায়। প্রশ্ন উঠবে, সাত-তাড়াতাড়ি অত যাচাই কেন?

জবাব হল, যাচাইটা সুখের সঙ্গে সঙ্গতির বনিবনার খাতিরে। পকেটের সঙ্গে হোটেলের ব্যালান্স্‌-এর খাতিরে।

কিন্তু ব্যালান্স্‌ শেষ অবধি হল কি?

আমি বলি, হল। কারণ, তিনটি হোটেলের মধ্যে এক নম্বর 'স্নো ভিউ' ধনীদের, তিন নম্বর 'হিমল' নিম্ন মধ্যবিত্তদের, আর দু' নম্বর 'অন্নপূর্ণা' মধ্য মধ্যবিত্তদের।

আমি ওই ছ'নম্বরটিকেই বেছে নিলাম। কারণ, মধ্য মধ্যবিত্তদেরই একজন আমি ; এবং এছাড়া, আমার পকেটের মধ্যমরকম অবস্থাটা ছ'নম্বরের প্রণামীর সঙ্গে কোনক্রমে খাপ খেয়ে গেল। আর মুহূর্তে বার বার মনে এলো আমার, মন্দ কি! বাইরে অন্নপূর্ণার অবারিত দাক্ষিণ্য তো আছেই ; এখন ভিতরেও যদি থাকে তো ভালো ছাড়া কি এমন মন্দ !

এছাড়া অন্নপূর্ণা হোটেলের কায়দা-কসরৎও ভারী চমৎকার। ভিতর-বাহিরকে এক করার আয়োজন হোটেলের সিংহদ্বারেই সে করে রেখেছে। সাইন-বোর্ডে অন্নপূর্ণা পর্বতের গায়ে নিজের নামটিকে প্রকাশ করে গোড়াতেই আদি ও অকৃত্রিম হতে চেয়েছে সে।

অকৃত্রিম হবার কিছুটা সাধনা 'স্নো ভিউ'রও অবিশ্যি ছিল। কিন্তু তার বাঙালী মালিকের সঙ্গে আলাপ করে বিস্ময়ে-বেদনায় হতবাক হয়ে গেলাম।

অথচ, সত্যি বলতে কি, মালিকটিকে দেখে খুশিই হয়েছিলাম প্রথমে। ভেবেছিলাম, বিদেশ-বিভুঁইয়ে এর থেকে সাহায্য না হোক, অন্ততঃ সুপরামর্শ পাওয়া যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, যতই আলাপ হল ওর সঙ্গে, ততই উনি 'সু'কে ছেড়ে 'কু'র ওপরে ভর করলেন।

—কোত্থেকে আসা হচ্ছে মশাইয়ের ? এক সর্দারজীর সঙ্গে বসে মূল্যবান কোন তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করতে করতে অনেকটা যেন অনুকম্পাভরেই শুধালেন উনি।

বললাম, কলকাতা।

—কলকাতা ? আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়তে লাগলেন উনি ; এবং তারপর পড়তে পড়তে নিজেকে হঠাৎ সামলে নিয়ে বললেন, দ্যাট ডেড্ সিটি ?

বললাম, ডেড্ কিনা জানি না। আমাদের মতো বেশ কয়েক লক্ষ হতভাগ্য এখনও ওখানে বেঁচে আছে বলেই জানি।

—সেই বাঁচা আর আমার এই 'স্নো-ভিউ' হোটেলের বাঁচায় আসমান-জমিন ফারাক মশাই। ভদ্রলোক বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন।

আমি বললাম, তা বেশ তো! এবং সেজন্যেই তো বেড়াতে আসা এখানে!

—বেড়াতে এসেছেন বুঝি? মূল্যবান পদার্থটির আর এক চুমুক খেয়ে আর একটা হেঁচকি তুলে বলতে লাগলেন তিনি, তা এসেছেন যখন, থাকুন। বেশ কিছুদিন থাকুন। চাঙ্গা হোন।

শুধালাম, চার্জ কী রকম আপনার?

—বেশি কিছু নয়। পার হেড্ পার ডে কুড়ি টাকা মাত্র।

—থাকা-খাওয়া নিয়ে কুড়ি টাকা?

—আজ্ঞে না, শুধু থাকার জন্যে। খাওয়ার চার্জ আলাদা।

—খেতে কী রকম পড়ে?

—ঠিক নেই কিছু। খাওয়া বুঝে। এই ধরুন পার হেড্ পার ডে চল্লিশ থেকে একশো টাকা।

কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম নিশ্চয়। নিশ্চয় আমার চোখ-মুখ দেখে হোটেলের মালিক আঁচ করেছিলেন, আমি যেন বলতে চাইছি, অত বেশি চার্জ করার মতো কায়দা-দুরস্ত হোটেল তো তোমার নয়!

—আমার এখানে চার্জ এরকমই। আপনার না পোষায়, অন্যত্র দেখতে পারেন। ভদ্রলোক সরাসরি জানিয়ে দিলেন এবার।

আমি অন্যত্র দেখবার লজ্জাটুকু ঢাকব বলে প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করলাম, শুনেছি, পোখরায় একটা অ্যালুমিনিয়াম বাংলো আছে। ট্যুরিস্ট্‌দের জন্যে সরকারের গড়া বাংলো। ওটা কোথায়, বলতে পারেন?

—হ্যাঁ, পারি বলতে। এবার রীতিমত রহস্যের ছলে জবাব দিলেন ভদ্রলোক। জানালেন, ওরই জায়গায় গড়ে উঠেছে আমার এই 'স্নো ভিউ' হোটেল।

—কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম বাংলোর কথা পোখরার ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্লেট-এ লেখা আছে স্পষ্ট। ছবি-সহই আছে, আমি মরিয়া হয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

উনি রহস্যময় হয়ে উঠলেন আবার। বললেন, নেপালে এরকম অনেক কিছুই থাকে মশাই। থাকে, আবার থাকেও না।

—এদিকে আমারই হয়েছে বিপদ, একটু থেমে আবার শুরু করলেন ভদ্রলোক, বাঙালী যে-কেউ এখানে আসুক, আমাকে ধরবেই ঠিক। বলবে, যা হোক সুবিধে করে দিন মশাই ; হোটেল-চার্জে কিছু কনসেসান করে দিন। বাঙালী হয়ে বাঙালীকে যদি না দেখেন তো ·····

বাধা দিয়ে বললাম, তা তো ওরা বলতেই পারে!

—কিন্তু ওরা পারে, আমি পারি নে? আমি পারি নে বলতে যে, বাঙালীর এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারাও একটু ব্যাক্ করুন? অন্যদের চেয়ে দু'চার পয়সা বেশি দিয়ে আপনারাই বরং ইন্‌সেন্‌টিভ্ দিন আমাকে।

—ভগবানের ইচ্ছায় আপনার কি আর ইন্‌সেন্‌টিভ্-এর অভাব হয়?

—হয় মশাই, হয়। 'দি ডেড্ সিটি'র লোকেরা এলেই ফ্যাসাদ হয় আমার। ওরা নানান সব বায়নাক্কা করে।

—আর করবে না বায়নাক্কা। ওকে অভয় দিয়ে বিদায় নেবার উদ্যোগ করি এবার। বলি, দেশে ফিরে গিয়ে ওদের জুলুমবাজী এবং আপনার মহানুভবতা সম্বন্ধে আমি লিখব।

ভদ্রলোক এবার সন্দেহের চোখে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, যদি লেখেন তো দয়া করে মনে রাখবেন একটা কথা; কলকাতা বোঝাতে দি ডেড্-এর জায়গায় 'দি গ্রেট' লিখবেন। আর সবাইকেই আমার অবস্থাটা কন্‌সিডার্ করতে বলবেন একটু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলব। নিশ্চয়ই বলব। এই যা কথা হল

আপনার সঙ্গে, যা দেখলাম, তা হুবহু বলব। কোন ভয় নেই। বলতে বলতে বেরিয়ে এলাম স্নো-ভিউ থেকে।

এরপর হোটেল হিমল। ওখানে গিয়ে দেখি, উল্টো চিত্র। হোটেলের বয় এবং ম্যানেজার থেকে শুরু করে প্রোপ্রাইটার পর্যন্ত সবাই বিনয়ের অবতার একেবারে। আর শুধু কি বিনয়! কুলি চিনিয়ে না দিলে আমি চিনতেই পারতাম না, কে বয় আর কে প্রোপ্রাইটার! এ ছাড়া, স্নো-ভিউর প্রোপ্রাইটারটি বসতে বলেন নি আমাকে। অথচ নিজে তিনি মূল্যবান একটি আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বলতে গেলে শুয়েই ছিলেন।

এদিকে এরা দেখছি উল্টো। আমাকে না শুইয়ে ছাড়বে না। আর নিজেরা থাকবে ঠায় দাঁড়িয়ে।

কিন্তু না, হোটেল হিমলেও শোওয়া বা বসা কোনটাই হল না আমার। হিমল-এর মেঝেতে ঘনদূর্বাদলের শোভা দেখে, আর দেখে জল এবং আলো সম্বন্ধে তার যোগীসুলভ নিস্পৃহতা, ওখানেও থাকবার ভরসা হল না।

থাকতে হল ওই অন্নপূর্ণাতেই। কাঠমাণ্ডুর প্রদীপ চৌধুরীর নির্দেশমতো ওই মধ্যবিত্তদের আশ্রয়টিকেই শেষ অবধি বেছে নিতে হল।

ওদিকে বেছে নিয়েও বিপদ। আশ্রয়কুঞ্জটিতে ঢুকে সবে বসেছি, সবে বিশ্রাম নেবার উদ্যোগ-আয়োজন করছি, এমন সময় অলুক্ষুণে একটা শব্দ কানে আসে যেন। যেন মনে হয়, মচ্ মচ্ শব্দে গাছ বা ডালপালা-জাতীয় কিছু একটা ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু কোথায় ভেঙে পড়ছে? শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে আসি ঘরের বাইরে। এসে দেখি, কই! কিছুই হয়নি। বিপর্যয়ের এতটুকু চিহ্নও নেই কোথাও। সামনেই দেবদারু গাছটা দিব্যি দাঁড়িয়ে। দূরে মহীরুহেরা নিথর হয়ে দিব্যি।

তবে? তবে ওই বিদ্‌ঘুটে শব্দটা হল কোত্থেকে?

একবার ভাবলাম, শব্দ আদৌ হয় নি বোধ হয়। আমি ভুল শুনেছি।

ঘরে এসে বসলাম আবার। বিশ্রাম নেবার উদ্যোগ করলাম। কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই আবার সেই শব্দ।

হোটেলের এক বয়কে ডাকলাম এবার। শুধালাম, ব্যাপার কী? গাছপালা ভেঙে পড়ল কোথাও?

বয় ঠিক জবাব দিল না। যেন কিছুই হয়নি, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বলল, ধাণ্ডা নামানা; অর্থাৎ, ওতে ভাববার কিছু নেই।

—বেশ! ভাবব না। ঠিক করলাম শেষ অবধি। ধরে নিলাম, ওই বিশেষ শব্দটাও পোখরার আরণ্যক-বিশিষ্টতার একটা অঙ্গ।

এদিকে অরণ্যপুরীকে নিয়ে আনন্দেই দিন কাটে। পরদিন দুপুরেই ফেওয়া-হ্রদ দেখতে বেরিয়ে পড়ি।

অন্নপূর্ণা হোটেলকে পেছনে ফেলে পীচ্-ঢালা পথ ধরি একটা। এবং তারপর সে-পথটা ধরে দক্ষিণদিকে এগিয়ে কয়েক কদম পশ্চিম-মুখো হই।

পশ্চিমের পথে পীচের নামগন্ধ নেই। তার এখানে-সেখানে ছড়ানো পাথর। ছোটবড় নানা আকারের অসংখ্য পাথর। জায়গায় জায়গায় মাটি চোখে পড়ে ওখানে। কোথাও আবার চোখে পড়ে বুনো লতাপাতা।

হ্যাঁ, পথটা ষোল আনা বুনো। পশ্চিমের অরণ্যের দিকে বুনো একটা সরীসৃপের মতো এগোল সে। এবং হঠাৎ তাকে দেখে মনে হল, এই বুঝি রূপকথার রাক্ষুসে অজগরটার মতো সে নড়েচড়ে উঠবে।

কিন্তু না, নড়ল না কিছু। প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র জানোয়ারটা মরে ভূত হয়ে থাকবার ভান করল। মনে হল, আদিমটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে সেই কোন্ আদ্যিকালেই।

কিন্তু পথ আদিম, আর আমরা নই? এই যে ভরা দুপুরে প্রায় জনমানবহীন এই পাহাড়পুরীতে ধুঁকতে ধুঁকতে আমরা চলেছি? বিশ্বজগৎ কি আমাদের খবর রাখে এখনও?

ওদিকে আমাদের ডান-পাশে মাচ্ছাপুছ্রে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য এখন। অন্নপূর্ণা এখন বোরখা-পরা নারীর মতো অবগুণ্ঠিতা।

কিন্তু আকাশে চিহ্নমাত্র নেই অবগুণ্ঠনের। মেঘ নেই এক টুকরোও। সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে ওখানে। নীলের গায়ে রুপোলী জরি ঢালছে।

গিরিরাজদের দরবারে সূর্যের এই এতটা জারিজুরি খাটে না। রাজারা সূর্যদেবকে আগুন ছড়াতে দেখলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুরু করে। নিজেরা সঞ্চয় করে রেখেছে যে তুষার, তারই খানিকটাকে সাত-তাড়াতাড়ি বাষ্প করে দিয়ে নজরানা দেয় দেবতাকে। এবং তারপর সেই নজরানার দৌলতেই নিজের নিজের ওপর মেঘের চন্দ্রাতপ গড়ে তোলে দিব্যি।

মনে হল, অন্নপূর্ণা আর মাচ্ছাপুছ্‌রে ঠিক এমনিতরো চন্দ্রাতপের আড়ালে এখন। আর আমরা এখন চন্দ্রাতপবিহীন; খোদ সূর্যদেবের অগ্নিবৃষ্টির একেবারে মুখোমুখি।

প্রাণান্তকর ওই বৃষ্টির হাত থেকে অনেক কষ্টে রেহাই পাই সেদিন। হঠাৎ দেখা-পাওয়া কয়েকটা দেবদারুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাবি, হ্যাঁ, খুদে এক একটি গিরিরাজ বটে আমরাও। আমাদেরও মাথায় চন্দ্রাতপ এখন। দেবদারুরা এখন আমাদের সহায়।

মনে পড়ে, হঠাৎই দেখেছিলাম ওই দেবদারুদের। ঢেউ-খেলানো একটা প্রান্তর ধরে চলতে চলতে হঠাৎ দেখেছিলাম, প্রান্তরের একপ্রান্তে পথের ঠিক গা ঘেঁষেই ওদের কয়েকটির জটলা।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জটলা শুরু হয়। আমরা ছায়ায় দাঁড়িয়ে ধুঁকতে থাকি। হিসেব কষতে থাকি, পথ আর কতদূর।

এক রাখাল বললে, পথ আরও বেশ খানিকটা দূর। এয়ার-পোর্ট থেকে ফেওয়া তাল আড়াই মাইল পথ প্রায়। কিন্তু আমরা এখনও এক মাইলও আসি নি।

ওদিকে স্থানীয়রা একটি দু'টি করে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। প্রথমে আসে কয়েকটি মোষ, তারপরে গরু, তারপরে এক পাল ভেড়া। ওরা ধীর মন্থর গতিতে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

কিন্তু আমরা কতক্ষণ আর রাজা সাজব? কতক্ষণ চন্দ্রতপের তলায় দাঁড়িয়ে গৃহপালিত জানোয়ারদের এই চলাচল দেখব?

এদিকে আমাদেরও যে না চললেই নয়। ফেওয়া তালের দিকে না এগোলেই নয় এবার। কিন্তু এগোয় কার সাধ্যি!

সূর্য এতক্ষণে পশ্চিমদিকে হেলতে শুরু করেছে বটে। কিন্তু সেই হেলানো সূর্যের তির্যক রশ্মি বল্লম উঁচিয়ে তেড়ে-আসা সৈন্যের মতো ধারে-কাছেই রয়েছে আমাদের।

অতএব নিরুপায় হয়েই সাত-পাঁচ ভাবি আমরা। সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে-আসা পাখিরা যেমন, আমরাও ঠিক তেমনি সবাই একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করি। এই চালাচালির ফলশ্রুতি ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। কেননা, এক জায়গায় বিপদ বুঝলে অন্য এক বিপদের ব্যূহের ভিতর দিয়ে তড়িৎগতিতে পালাবার যে স্বভাব পাখিদের আছে, তার অনেকটাই যেন সেদিন রপ্ত করেছিলাম আমরা।

কিন্তু কেন করেছিলাম? ডানা ছাড়াই সেদিন বলতে গেলে কেন উড়েছিলাম?

সহযাত্রীদের ভাষায়, অবাঞ্ছিত একটি অতিথির আবির্ভাবে। প্রায় দশ-বারো হাত লম্বা এক অজগরের তাড়নায়।

অজগর-মহারাজ দিব্যি হেলে-দুলে এঁকে-বেঁকে দেবদারুর ছায়ার দিকে এগিয়ে আসছিল এবং ভাবটা দেখাচ্ছিল এইরকম যে, তোমরা কেন বাপু এখানে? দেবদারুর এই চন্দ্রাতপ তো আমার খাস-এলাকা!

ঠিক ঠিক। এলাকা তো বটেই! কার এলাকায় কে করে অনধিকার-প্রবেশ! ভাবতে ভাবতে ডানা ছাড়াই সেদিন একরকম উড়ে চলি আমরা। বর্শাধারী সূর্য-সহচরদের দহন সহ্য করতে করতে চলি।

খানিকদূর এগিয়ে ফিরে তাকাই একবার। 'অজগর আসছে তেড়ে' কি না, বুঝে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু না, তেড়ে আসে না কেউ। দেবদারু-কুঞ্জটা গা-ছমছমে স্তব্ধতা নিয়ে খাঁ খাঁ করে শুধু।

আর আমরা শুধুই পথ চলি। পথটা এবার গেছে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে। বাড়িগুলো নাকি 'ইণ্ডিয়া এইড্ মিশন'-এর অফিস এবং কোয়ার্টার। তৈরী হয়ে গেছে ওদের কিছু। আর কিছু তৈরী হচ্ছে।

—কিন্তু এইড্ মিশন এখানে কেন? স্থানীয় একজনকে শুধোতেই তিনি বললেন, কাজ চলছে এদিকে। রাস্তার কাজ। ভারতের সহযোগিতায় পোখরার উন্নয়ন হচ্ছে।

ভাবলাম, হোক উন্নয়ন। গরীবকে গরীব না দেখলে কে দেখবে আর! উন্নয়নটা আর কোন্ দিক দিয়ে হবে!

কিন্তু এদিকে আমাদেরও যে একটু-আধটু উন্নয়ন দরকার। পেটে ক্ষিধে, দেহে ঘাম, মাথায় আগুন। একটা কিছু আশ্রয় না হলে যে আর চলছে না!

হয়তো চলত। ফেওয়া তাল-এর দেখা পেলে সব কষ্ট পুষিয়ে যেত হয়তো। কিন্তু কোথায় ফেওয়া তাল! নগাধিরাজ-সোহাগিনী বিপুল সেই হ্রদটির নামগন্ধও নেই কোথাও।

অগত্যা ধুঁকতে ধুঁকতে আবার চলি। পাহাড়ীয়া পোখরার প্রায়-সমতল পাথুরে প্রান্তর ধরে আবার এগোই।

খানিকদূর এগোতেই ঝোপ চোখে পড়ে একটা। এবং সেই ঝোপের আড়ালেই চোখে পড়ে এক খণ্ড রুপোলী পাত।

শুনলাম, ঐ নাকি ফেওয়া তাল। ঐখানেই শুরু হল সে।

কিন্তু আমাদের শুরুটা কোন্ দিক দিয়ে হবে? ফেওয়া তালে যাব কোন্ পথে? অনেক কষ্টেও পথ খুঁজে পাই না কিছু। যাকেই জিজ্ঞেস করি, বলে, আর একটু যাও। আর একটু। ঠিক পেয়ে যাবে।

এদিকে একটু একটু করে প্রায় আধ মাইল এসে পড়েছি। রুপোলী পাতটা বড় হতে হতে বিরাট এক নদীর চেহারা নিয়েছে। কিন্তু ফেওয়া তালে যাবার পথ আর খুঁজে পাই না।

আমাদের বাঁ-দিকে ফেওয়া তাল। চাষবাসের উদ্যোগও সেদিকে। ঘন সবুজ ধানগাছগুলো সমতলের বেশ খানিকটা অবধি জায়গাকে গালিচার মতো আচ্ছন্ন করে ফেওয়ার উপকূল অবধি চলে গেছে। এবং আমাদের ঠিক পাশেই রয়েছে ধান-ক্ষেতের সীমানা-নির্দেশক বেড়াগুলো।

ঐ বেড়া ডিঙিয়ে ফেওয়ায় যেতে হবে নাকি ?

স্থানীয় একজন বুঝিয়ে দিলেন, হ্যাঁ, ডিঙিয়েই। সামনে পড়বে ঘাট। ডিঙোবার ভালো ব্যবস্থা আছে ওখানে।

কিন্তু কোথায় ঘাট! সামনেই তো মন্দির দেখছি একটা। বেশ সুদৃশ্য আর বিরাট এক মন্দির। যেন আমাদের অভ্যর্থনা করবে বলে দাঁড়িয়ে।

ভাবলাম, অভ্যর্থনাটা কুড়িয়ে নেয়া যাক একবার। মন্দিরটিকে একবার অন্তত দেখে নেয়া যাক!

কিন্তু দেখতে গিয়ে বিপদ। মন্দিরের প্রবেশ-পথেই গুরুতর বাধা একেবারে।

দেখি যে, সঙীন উঁচিয়ে এক প্রহরী মিলিটারী-কায়দায় থামাবার চেষ্টা করছে আমাদের। যেন মুহূর্তে আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বলছে, থামস!

বাধ্য হয়েই থামলাম আমরা। আর ওদিকে মিলিটারী-ইউনিফর্ম-পরা প্রহরী এগিয়ে এলো।

ওই প্রহরীর কাছ থেকেই শুনলাম, সামনের এই যে সুদৃশ্য বিরাটটি, যাকে আমরা মন্দির ভেবেছি, আসলে এ হল একটি প্রাসাদ। নেপালের বর্তমান রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্নার প্রাসাদ এ। এর নাম রত্ন-মন্দির।

বললাম, রত্ন-মন্দির ? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি বটে নামটা। দেখেছি, ফটকের গায়ে লেখা আছে।

সহযাত্রীদের একজন বললেন, কিন্তু দেখেও বুঝতে পারি নি। ভেবেছি, মন্দির-টন্দির না হয়ে এ যায় না।

প্রহরী উত্তরে পরিষ্কার হিন্দীতে যা জানাল, বাংলা করলে তার মানে দাঁড়ায় এইরকম, ভাবলেও অন্যায় করো নি কিছু। কারণ, এক হিসেবে মন্দির এ তো বটেই। রাজ-মন্দির। রাজারানী কি ভগবানের থেকে আলাদা?

বললাম, না না, আলাদা কেন হবে? বরং নেপালে দেখেছি, রাজাই ভগবান; ভগবানই রাজা।

—হুঁ! বলে প্রহরী এবার স্যালুট ঠুকল আমাদের। রাইফেল কাঁধে ফেলে পায়চারি করতে শুরু করল। আবার নিজের কাজে মন দিল সে।

কিন্তু আমাদের মন তখন পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে-থাকা অপরূপ ওই হ্রদটাতে।

দেখতে পাচ্ছি ওকে স্পষ্ট। দেখছি যে, ওরই তীর ঘেঁষে এগোচ্ছি। অথচ ওকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছি না। ঘাট খুঁজে পাচ্ছি না এমন একটা, যেখানে গিয়ে নৌকো পেতে পারি; যেখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, হ্যাঁ, হ্রদের দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিয়েছি ঠিক।

অগত্যা আরও এগোই। প্রায় তিন ফার্লং লম্বা রত্ন-মন্দির মহলটিকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে চলি।

সামনে, আমাদের একেবারে নাকের ডগাতেই আকাশ-উঁচু পাহাড়। ঘন সবুজ অরণ্যের সেখানে সমারোহ। অরণ্যে কিসের যেন গুঞ্জরন চলছে। কানাকানি ফিসফিস চলছে কী রকম যেন।

কিন্তু কানাকানি কিসের? কিসের ফিসফিসিনি? হঠাৎ এখন এই অসময়ে হাওয়া বইতে শুরু করল বলে? না কি হঠাৎ অতিথিরা এলো বলে?

জানি নে। পাহাড়-পর্বতের নিজস্ব ভাষা এগুলো। এত করেও এদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না।

কী করে চিনব? ভাষা কি একটা? না কি হিমালয়ের সব অঞ্চল একরকম? জম্মুর ন্যাড়া পাহাড় আর কাশ্মীরের তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের ভাষা কি এক? অলকনন্দা-শোভিত রহস্যময় বদ্রীনাথ আর বাগমতী-লালিত অপরূপ পশুপতিনাথ কি এক ভাষায় কথা কয়? বিপাশার দেশ কুলু আর মন্দাকিনীর দেশ কেদারনাথের ভাষা কি এক? সবুজ শিলং, দুর্জয়লিঙ্গ-সহচর দার্জিলিঙ্ আর আরণ্যক সিকিমের ভাষায় মিল আছে কি কিছু?

মিল একটুখানি হয়তো আছে; কিন্তু অনেকখানিই নেই আবার। দার্জিলিঙের পাইন আর কাশ্মীরের পপলারের ভাষায় মিল নেই, নেপালের বিষ্ণুমতী আর কেদারখণ্ডের বিষ্ণুগঙ্গার ভাষায় মিল নেই। মিল নেই চেনারের মর্মরধ্বনির সঙ্গে দেবদারুর হাহাকারের, বার্চ-বীথির দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শাল-মহুয়ার উষ্ণশ্বাসের।

পোখরার পাহাড়পুরীতে উষ্ণশ্বাসেরই প্রাধান্য যেন। শাল-মহুয়ার সরব আত্মপ্রচারের যেন ঘনঘটা। হ্যাঁ, আত্মপ্রচার তো বটেই। এবং সেই সঙ্গে বটে সরবও। কেননা, স্পষ্ট অনুভব করলাম, গুঞ্জরনটা দেখতে দেখতে জোরদার হয়ে উঠল। যেন শাল-মহুয়ারা কথা কইতে কইতে কাছে এগিয়ে এলো। হাওয়ার দাপট বেড়ে উঠল ক্রমেই।

কিন্তু এই দাপাদাপি মিনিট কয়েকের জন্যে মাত্র। তারপরেই সব আবার চুপ। সব একেবারে বোবা হয়ে গেল যেন। যেন কোন্ এক অজানা মন্ত্রবলে মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল।

দেখেছি, নগাধিরাজের ভিতরমহলে হামেশাই ঘটে এমন। শান্ত স্তব্ধ অরণ্যগুলো হামেশাই নড়ে-চড়ে উঠে জানিয়ে দেয়, আমরা আছি।

আছি বটে আমরাও। অনেকক্ষণ বাদে নিজের অস্তিত্বটা ঠাওর

হয় যেন। যেন নিজের এবং সহযাত্রীদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাই।

ওদিকে একটু পরেই ঝরা-পাতার ওপর খস খস শব্দ ওঠে। একটা গোসাপ ত্রস্তভাবে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে যায়। কয়েকটা মাছরাঙা ফেওয়ার দিক থেকে ছুটে আসে।

কিন্তু আমরা কতক্ষণ আর ছুটব এই রকম? সেদিন নিজেকেই প্রশ্ন করি বার বার। এবং একবার নেহাৎই আকস্মিকভাবে সেই প্রশ্নের জবাব যেন পেয়ে যাই। দেখি যে, আমাদের পথটা থেকে বেরিয়ে সরু একফালি পথ বাঁ-পাশের ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়ে চলে গেছে। এবং সেই পথেরই একপ্রান্তে ফেওয়া তালের গা-ঘেঁষে চোখে পড়ছে কয়েকটা নৌকো।

ওই তাহলে ঘাট! খুশি মনেই সরু পথটা ধরে এগিয়ে চলি এবার।

কিন্তু খানিক দূর এগিয়েই নতুন বিপদ। দেখি যে, পথ একেবারে রুদ্ধ; প্রায় সাত ফুট উঁচু কাঁটা-গাছের বেড়া আমাদের দিকে সঙীন তুলে দাঁড়িয়ে।

কী করব, আকাশ-পাতাল ভাবছি। এমন সময় এক পাহাড়ীয়া এগিয়ে আসে। বোধ করি, আমাদের দেখে করুণা হয় তার। পরিষ্কার হিন্দীতে সে শুধোয়, ফেওয়া দেখোগী?

আমরা শিশুর মতো অসহায় আর কৌতূহলী তখন। বললাম, হ্যাঁ, দেখব।

—দেখো! বলেই তাড়াতাড়ি কাজে লেগে যায় ওই পাহাড়ীয়া। বেড়ার গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে শুরু করে। আমাদেরও কেউ কেউ এগিয়ে যায় ওকে সাহায্য করতে।

এদিকে এত করেও আসল কাজ কিন্তু হয় না। বেড়ার অন্তত একটি খুঁটি সরাতে না পারলে পথ হয় না যাবার।

যাবার পথ শেষ অবধি হল। অনেক কষ্টে একটি খুঁটি তুলে নিল পাহাড়ীয়া।

আমরা ফেওয়ার দিকে এগিয়ে চললাম এবার। পাহাড়ীয়াটিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

—লোক এখানে আসে কী করে? ওকে শুধালাম একবার।

ও বলল, কেন! এ-পথ দিয়েই আসে। এই তোমরা যেমন এলে, ঠিক তেমন করেই।

—তেমন করেই মানে? খুঁটি তুলে নেয়া হয় রোজ? বেড়া খুলে দেয়া হয়?

—তা কেন হবে? বেড়া আর খুঁটি যেমন আছে, ঠিক তেমনই থাকে। তবে কি না, একটি সাঁকোও থাকে ওখানে।

—সাঁকো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সাঁকো। বেড়ার দু'পাশে গাছের দু'টি গুঁড়ি ফেলে তা গড়া হয়। একটি গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে সব। আর একটি বেয়ে নামে।

—কিন্তু গুঁড়িগুলো দেখলাম না যে আজ? সাঁকো যে আজ চোখে পড়ল না?

—দিন কয়েক হল কে যেন সরিয়ে নিয়েছে ওদের।

—সরিয়ে নিয়েছে? কিন্তু কেন বলো তো?

—কেন, তা কী করে বলব?

ভাবলাম, ঠিক। ও কী করে বলবে! নিঝুম নিস্তব্ধ এই পাহাড়পুরীতে গোটা একটা পাহাড়কে সরিয়ে নিলেও কারও বলার উপায় নেই, কে নিয়েছে; কেন নিয়েছে!

এদিকে দেখতে দেখতে ফেওয়ার তীরে পৌঁছুই আমরা। চারদিকের পাহাড়পুরীর মাঝখানে বিরাট ওই হ্রদটাকে রূপকথার জগৎ বলে ভাবি।

রূপকথাই বটে। ফেওয়া তালের মাঝি কালী বাহাদুর সত্যি আজ আমার কাছে রূপকথা। মনে পড়ে, ফেওয়ায় চলতে চলতে রূপকথা দিয়েই গল্প শুরু করেছিল সে।

কালী বাহাদুর বলেছিল, একবার ল্যাজায়-মুড়োয় ঝগড়া; তুমুল ঝগড়া।

মিথ্যে বলে নি সে। নেপালী রূপকথায়ও পাই, একবার ল্যাজায়-মুড়োয় ঝগড়া; তুমুল ঝগড়া। কোন এক হ্রদের সঙ্গে পর্বতের নাকি তুমুল ঝগড়া একবার।

হ্রদ বলে, আমি বড়।

পর্বত বলে, আমি।

হ্রদ বলে, কিন্তু আমি যে তোমায় ধরে রেখেছি! পুরো তোমাকেই যে ধারণ করে রেখেছি!

পর্বত অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

—মানে এমন কী শক্ত আর! আমার টলটলে জলের দিকে তাকাও, ঠিক বুঝবে।

—আচ্ছা, তাকালাম না হয়!

—তাকিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—কী দেখছ এবার? তোমাকেই না?

পর্বত রীতিমত বিরক্ত, দেখছি তো হয়েছেটা কী?

—হয়েছে এই যে, হ্রদ সগর্বে জানিয়ে দেয়, তুমি ধরা পড়ে গেছ আমাতে। আমি তোমার চেয়ে বড় কিনা! তাই ধরা পড়েছ!

পর্বতও ছাড়বার পাত্র নয়। ফস করে কড়া এক জবাব দেয়। ধরা অমনি পড়লেই হল! তোমার ওই জল তো আমারই কাছ থেকে ধার করা। আমারই তুষার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া।

হ্রদ গর্জে ওঠে এইবার, ওঃ! ভারি আমার পাওনাদার রে!

পর্বতও শাসিয়ে ওঠে, ওঃ! ভারি আমার ধরনেওয়ালা রে!

শোনা যায়, দীর্ঘক্ষণ চলে এই ঝগড়া; এবং অবশেষে ভগবান মঞ্জুশ্রীর চেষ্টায় এর নাকি সুরাহা হয়।

মঞ্জুশ্রী বলেন, কেউ বড় নয় তোমাদের। কেউ ছোটও নয়। কারণ, তোমরা দু'য়ে মিলে এক।

—এক ? পর্বত ও হ্রদ একই সঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

মঞ্জুশ্রী বুঝিয়ে দেন, হ্যাঁ, এক। আসলে একটিই মাছ। বিরাট মাছ। তার ল্যাজটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে পর্বত হয়ে। দেহটা আছে পাতালে। আর মুড়োটা হ্রদে।

ভগবান মঞ্জুশ্রীর কথা শুনে ল্যাজা-মুড়ো থ। কিন্তু ভগবান থামেন নি তখনও। বলে চলেছেন, ছোট-বড়র প্রশ্ন মনে এলেই একে অপরের দিকে তাকিয়ো তোমরা। সত্যিকারের এক ও অখণ্ডকে বুঝতে চেষ্টা করো।

রূপকথা বলে, চেষ্টা সেই থেকে নাকি চলে আসছে। ঠিক মাছের ল্যাজের মতো দেখতে মাচ্ছাপুছ্‌রে পর্বত তাকিয়ে আছে ফেওয়া-হ্রদের দিকে। আর ফেওয়া মাচ্ছাপুছ্‌রের দিকে।

সেই থেকে ফেওয়ার জলে নিত্য ছায়া পড়ে মাচ্ছাপুছ্‌রের। আর ফেওয়াকে জল দেয় মাচ্ছাপুছ্‌রেরই বরফ-গলা নদী আর ঝরনাগুলো।

জল, কত জল ওই ফেওয়ায়! আর কী টলটলে জল! মাচ্ছাপুছ্‌রে ক্ষণে ক্ষণে নাচে ওই জলের তলায়। ক্ষণে ক্ষণে আবার কাঁপে।

ফেওয়ার ঢেউ ছোট হলে কাঁপে মাচ্ছাপুছ্‌রে। আর ঢেউ বড় হলে নাচে।

আমরা নাচন দেখেছি তার। ফেওয়া তালে ছোট্ট এক ডিঙি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি যখন, তখন কত দেখেছি!

মনে পড়ে, ওই নাচন দেখতে দেখতেই ল্যাজা-মুড়োর হদিস পাই। কালী বাহাদুর নেপালী-রূপকথাটা বলে।

আর বলে, স্থানীয়রা নাকি হ্রদ বলে না ফেওয়াকে। বলে, তলাও। ফেওয়া তলাও।

কালী বাহাদুরও তাই বলেছিল, ইয় ছা ফেওয়া তলাও। অর্থাৎ, এই হল ফেওয়া তাল।

—শুধুমাত্র এই? হ্রদে ঘুরতে ঘুরতে ওকে শুধিয়েছিলাম একবার।

ও জবাব দিয়েছিল, জী শেঠ! ইয়।

কিন্তু এই বা কম কিসে? এই যে পাহাড়-ঘেরা রহস্যময় জলপুরী, কোন্ দিক দিয়ে কম এ? এর দুই প্রতিবেশী ধবলগিরি ও অন্নপূর্ণা তো নগাধিরাজের দুই জবরদস্ত পারিষদ।

হ্রদে ঘুরতে ঘুরতে অন্নপূর্ণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে হঠাৎ। হঠাৎ মেঘের যবনিকা সরে যায়। মন্ত্রবলে আকাশ ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে আসে মাচ্ছাপুছ্‌রে।

হ্যাঁ, মাছেরই বটে ওই পুচ্ছটা। সাদা ধবধবে কোন মাছের। তার জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু যা কালো দেখাচ্ছে, শিকারী সূর্য সেজন্য দায়ী। আলোর খাবলা দিয়ে সাদা আঁশগুলোর কিছু কিছু নিলাম করে নিয়েছে সে।

তা নিক। মাচ্ছাপুছ্‌রের দৌলতখানায় টান পড়ে নি ওতে। অন্নপূর্ণার ওতে কিছু যায়-আসে নি।

মাচ্ছাপুছ্‌রের ঠিক পেছনেই তুষার-উত্তরীয় ধীরে ধীরে স্বর্গের দিকে উঠে গেল যেন। অন্নপূর্ণার একটি চূড়ার দিকে উঠে গেল।

লোকে বলে, ওই অন্নপূর্ণারই একটি শাখা-পর্বত মাচ্ছাপুছ্‌রে। কিন্তু কালী বাহাদুর অন্য কথা বলে। ওর মতে, শাখা-প্রশাখার ব্যাপারটা বিলকুল মনগড়া। মাচ্ছাপুছ্‌রে মাছেরই ল্যাজ আসলে। ল্যাজটা পর্বত হয়ে আছে। আর মুড়োটা আছে ফেওয়া তলাও-এর জলে।

কিন্তু ওই তলাও-এর জলটা স্ফটিক-স্বচ্ছ কেন এত? কেন ওর ওপর দিয়ে যেতে যেতে বার বার মনে আসে, কালী বাহাদুরের আজব গল্পটা সত্যি হলেও হতে পারে?

গল্প অনেক জানে কালী বাহাদুর। দাঁড় টানতে টানতে অনেক কথা বলে সে। কিন্তু সে-সবের বেশির ভাগই আজ আর মনে নেই। আজ ফেওয়ার ওপর দিয়ে তর তর করে ছুটে-চলার কথাটা মনে পড়ে শুধু।

মনে পড়ে, চলেছি। হ্রদ ধরে দ্রুত চলেছি আমরা। পাহাড় চারদিক থেকে হ্রদটিকে ঘিরে রেখেছে। আর সেই পাহাড়ের গায়ে অরণ্য শোভা পাচ্ছে সারি সারি।

হ্যাঁ, অরণ্য সারি সারি সেখানে। অনেক অরণ্য। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে সর্বত্র অরণ্য।

হ্রদের গা-ঘেঁষে উঠে গেল ওরা। পাহাড়ের চূড়া তাক করে উঠল। এবং উঠতে উঠতে, উঠতে উঠতে খাড়া পাহাড়ের গায়েই সীমানা শেষ হয়ে গেল ওদের।

শুনেছি, বিচিত্র সব গাছ আছে ওখ। দর, শাল মহুয়া দেবদারু ও শিশুর ওখানে নাকি রাজত্ব।

কিন্তু কোথায় রাজত্ব? অরণ্যের মাঝে মাঝে ঘর-বাড়ি চোখে পড়ছে যে! পাহাড়ীয়াদের কুটির চোখে পড়ছে জায়গায় জায়গায়।

কালী বাহাদুর বলেছিল, কুটিরগুলো হাল আমলের। হালে অরণ্য-রাজার সঙ্গে লড়াই বেধেছে মানুষ-রাজার, এবং তাইতেই রাজত্বটা কারও আর একচেটিয়া থাকছে না।

—তা না থাকুক, হ্রদ ধরে চলতে চলতে ভাবি, স্বর্গের দিকে হাত-বাড়ানো নগাধিরাজের চূড়াগুলো ছাড়া একচেটিয়া রাজত্ব এদিকে আর কারই বা আছে।

চূড়াদের আর একটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন। দেখছি, স্বর্গাভিসারী ধবলগিরিকে। হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোণে ধ্যান-সমাহিত সন্ন্যাসীর মতো স্তব্ধ ও গম্ভীর সে। তার সারা দেহে জমাট তুষারের মহিমায় সে চিরধবল।

কিন্তু তাকে ধবলগিরি বলে না স্থানীয়েরা। বলে, ‘ধওলাগিরি’।

মনে পড়ে, কালী বাহাদুরও তাই বলেছিল। হ্রদের ওপর দিয়ে যখন তর তর করে এগিয়ে চলেছিলাম, তখন সে বলেছিল, ওই যে দেখছ 'পহাড়', ওই হল 'ধওলাগিরি'।

—কিন্তু আসলে 'পহাড়' নয় এ; একটু থেমে কালী বাহাদুর আবার শুরু করে, আসলে এ হলো এক সাধু-মহাত্মা। মস্ত বড় এক মহাত্মা। ধ্যান করতে করতে এইরকম হয়ে গেছেন।

—তা হবেন হয়তো! কালী বাহাদুরের কথাটা বিশ্বাস করবার ভাব দেখাই।

এদিকে উৎসাহ পেয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করে সে, হুজৌর! আসল ঘটনা তুমি জান না। যদি জানতে···

কালী বাহাদুরের কথাটা শেষ হয় না। তার আগেই প্রলয় শুরু হয় হঠাৎ। হঠাৎ হুড়মুড় করে কী যেন ভেঙে পড়ে।

ঘটনার আকস্মিকতায় দারুণ চমকে উঠি আমরা। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে কালী বাহাদুরের দিকে তাকাই।

—ও কিছু নয়। কালী বাহাদুর আশ্বস্ত করে, কিছু নয় ও। ধস নামল। 'পহাড়'-এর খানিকটা ভেঙে পড়ল হ্রদের জলে।

—ওই যে! ছাখ না! বলেই কালী বাহাদুর ধসে-পড়া জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

দেখলাম একটু-আধটু ধস নামছে তখনও। আর বিরাট একটা ঢেউ রাক্ষসীর মূর্তি ধরে এগিয়ে আসছে।

—ও কিছু নয়, কিছু নয়। কালী বাহাদুর আবার আশ্বস্ত করল আমাদের। এবং অদ্ভুত কৌশলে নৌকোটাকে যেন আগলে রাখল।

কিন্তু তবু হঠাৎ দারুণ দুলে উঠল নৌকো। হঠাৎ এমনকি ধবলগিরিও যেন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

আর কালী বাহাদুর হো হো করে হেসে উঠল আমাদের অবস্থা দেখে। বলল, ডরো মৎ মালিক! মৎ ঘাবড়াও! এদিকে

হামেশাই হয় এমন। হামেশাই ভিজে-পহাড় আলগা হয়ে পড়ে। ধস নামে।

সেদিন ধসের গল্প আরও অনেক হল কালী বাহাদুরের সঙ্গে। ফেওয়া-হ্রদে ঘুরতে ঘুরতে অনেক গল্প হল।

কালী বাহাদুর একবার বললে, সাহাব, এবার ফিরে চলো।

বললাম, এখনই ?

—হ্যাঁ সাহাব, এখনই। বেলা যে পড়ে এলো। এ-সময় প্রায়ই ঝড় ওঠে ফেওয়ায়। এই যে দেখছ আশেপাশের পহাড়গুলো, এদের ওপর থেকে ভূতপ্রেতরা নামে।

—ভূতপ্রেত ? ওসব আবার বিশ্বাস করো ?

—না করে উপায় কী ? সত্যি ওরা আসে যে! ফেওয়ার জল খেতে আসে।

—বয়ে গেছে ওদের আসতে! ওদের আর কাজ নেই কিনা!

—তুমি আসল ব্যাপার জানো না। জানলে আর এ-কথা বলতে না।

—আসল ব্যাপারটা কী, শুনি ?

—অনেকদিন আগে, অনেক অনেকদিন আগে ভূতদের এক সভা হল সাগরমাথায়, মানে তোমাদের এভারেস্ট্-এ। সে সভায় ভূতের নেতারা বলল, মন ভালো নেই। বড় শীত এই সাগর-মাথায়। ভীষণ ঠাণ্ডা। অতএব, জায়গা-বদল দরকার। বারোমাস আর এখানে থাকা চলে না।…নেতাদের কথায় সায় দিল সব ভূত। বলল, ঠিক ঠিক! থাকা চলে না।…এদিকে হল কি, যে নেতা, অর্থাৎ কিনা, যে একেবারে সকলের সেরা নেতা, সে বলল, কিন্তু চলে না বললেই তো আর চলে না ; ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে সব কিছু। প্রথমেই দেখতে হবে, এই সাগরমাথা ছেড়ে অন্য কোথাও আমরা আদৌ যেতে পারি কিনা।…ভূতরা এইখানে চিৎকার করে উঠল। সবাই বলল, পারি পারি পারি।…নেতা এদের থামিয়ে

দিয়ে বলল, না, ভাইসব। পারি না। কারণ, ভাই-ভূতদের জন্যে সাগরমাথা আর বোন-ভূতদের জন্যে অন্নপূর্ণা অনেক আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছেন ভগবান।...এই কথা শুনে সব ভূত চিৎকার শুরু করল আবার। বলল, আমরা তবে ভগবানের কাছে যাব। আর্জি পেশ করব।...নেতা বললেন, বেশ! তাই করো।...এইবার সব ভূত গেল ভগবানের কাছে। গিয়ে এমন হল্লা শুরু করল যে, ভগবানের কানে তালা লাগে আর কি!...কিন্তু তবু সব শুনে তিনি বললেন, তথাস্তু। জায়গা-বদল তোমরা করবে। ফেওয়া তলাও-এর চারিদিকে আছে যে পহাড়গুলো, তাদের চূড়ায় গিয়ে থাকবে তোমরা।...ভূতরা ভগবানের কথা শুনে তো খুব খুশি।......কিন্তু ভূতদের যিনি সবচেয়ে বড় নেতা, তিনি মোটেই খুশি নন।.. তিনি বললেন, ভগবান, পহাড়গুলোতে ঠাণ্ডা নেই সত্যি; ওখানে আমাদের কষ্ট হবে না, তাও সত্যি। কিন্তু একটা যে অসুবিধে হবে!.. ভগবান বিরক্ত হয়ে বললেন, অসুবিধে আবার কী?....নেতা বললেন, ও পহাড়গুলোর চূড়ায় একেবারেই যে তুষার নেই ভগবান! ওখানে থাকলে আমরা জল পাব কী করে? ভগবান বললেন, জল তো সামনেই রইল তোমাদের। ফেওয়া তলাও রইল। তেষ্টা পেলে ওখানে নেমে জল খাবে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা; যখন-তখন নামবে না। সূর্য যখন বেশ খানিকটা হেলে পড়বে, যখন বেলা পড়ে আসবে, তখন নামবে। এই অবধি বলে একটু থামল কালী বাহাদুর; এবং তারপর আবার শুরু করল, তাই বলছিলাম সাহাব, আসল ব্যাপার তুমি জানো না। জানলে আর অমন কথা বলতে না।

কালী বাহাদুরের কথার প্রতিবাদ করলাম না আর। শুধু বললাম, বেশ! ফিরেই চলো।

মনে পড়ে, ফিরছি। ফেওয়ার স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে আমাদের নৌকো। তর তর করে এগোচ্ছে। থেকে

থেকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠছে একটা। কালী বাহাদুর দাঁড় টানছে। অনেক দূরে বরাহী-মন্দির। ফেওয়ার মাঝখানকার দ্বীপটিতে বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে তাকে।

গল্পের ঝোঁকে খেয়ালই করিনি; দীর্ঘ পথ চলে এসেছি দেখতে দেখতে।

কিন্তু না; অতটা আসা ঠিক হয়নি, একবার ভাবি।

ওদিকে পরমুহূর্তেই আবার আশঙ্কা ঘিরে ধরে। বার বার মনে হয়, এ-ধরনের অপরাহ্ণে ঠিক এমনিতরো পাহাড়ীয়া হ্রদে ঝড় তো হতেই পারে। শুনেছি, কাশ্মীরের উলার-হ্রদে ঝড় হয় অপরাহ্ণে; উড়িষ্যার চিল্কায়ও হয়।

কিন্তু কত ঘুরলাম দেশ দেশে! কত দেখলাম! অথচ কালী বাহাদুরের দোসর আর পেলাম না। ঝড়ের এমন অদ্ভুত-আশ্চর্য ব্যাখ্যা দিতে শুনলাম না আর কাউকে।

আর শুধু ঝড় কেন, কালী বাহাদুরের পৃথিবীতে সব কিছুই অদ্ভুত যেন। সেখানে সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তবের বালাই নেই। অতিপ্রাকৃত সেখানে প্রাকৃতের হাত ধরে চলে। রূপকথা আর উপকথা সেখানে প্রতিদিনের সত্যি হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে, বরাহী-মন্দিরের দিকে ফিরে আসার সময় আর এক গল্প শুরু করে কালী বাহাদুর, শেঠ সাহাব! নৌকো অনেক ডুবেছে এ-হ্রদে। অনেকে এখানে মরেছে।……একবার……তোমাদের ভারত থেকেই জবরদস্ত একদল খিলাড়ী এলেন। ওরা দার্জিলিঙ্ না কোথায় থাকেন, পহাড়ে ওঠার তালিম নেন।……এখানে এসেই ওরা বললেন, নৌকো নিয়ে ফেওয়ায় ঘুরে বেড়াবেন। 'তলাও'-এর শেষ-মাথা অবধি' যাবেন একেবারে।……আমি বললাম, শেব, যাবেন। কিন্তু এখন নয়। বেলা পড়ে এলো এখন। ফেওয়ায় ঝড় উঠতে পারে।……কিন্তু ওরা আমার কথা শুনলে তো!……উল্টে আমাকেই শুনিয়ে দিলেন দু'কথা, কোথায় ঝড়!

একরত্তি ঢেউ নেই হ্রদে ; আর বলে কিনা ঝড় !······আমি তখন ঝড়ের আসল কারণটা বুঝিয়ে বললাম। ভূতুড়ে ব্যাপারটা জানালাম।······আমার কথা শুনে ওদের কী হাসি! আমাকেই সব ভূত ভাবে আর কি !······তাই শেষ অবধি চুপ করে গেলাম। তবে নিজে না গিয়ে নৌকোটা আমি ছেড়ে দিলাম ওদের হাতে।··· এদিকে নৌকো পেয়ে কী যে খুশি ওরা ! যেন সাগরমাথার চূড়ায় উঠেছে, এইরকম খুশি।······কিন্তু আমি খুশি হতে পারলাম না। ······দারুণ এক ভাবনায় একেবারে দমে গেলাম।·······অথচ ওদের চোখে-মুখে ভয়-ভাবনার চিহ্নমাত্র নেই। নৌকো নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে ওরা বেরিয়ে পড়ল। আর আমি তীরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখলাম, খানিকক্ষণের মধ্যেই বরাহী-মন্দির ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে গেল ওরা।···কতক্ষণ তীরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আজ আর তা মনে নেই। কিন্তু সেই ঝড়ের কথাটা মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে, পহাড়ের চূড়া থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ফেওয়ার ওপর কারা যেন দাপাদাপি শুরু করল। কারা যেন প্রচণ্ড কোলাহল শুরু করল চারিদিকে। মচ্-মচ্ করে গাছ ভাঙল, ঝুপ ঝুপ করে ধস নামল ; আর তলাও-এর ঢেউগুলো ফোঁস ফোঁস করতে করতে বরাহীর একেবারে পায়ে এসে আছড়ে পড়ল।···সন্ধ্যের দিকে অবিশ্যি শান্ত হল ফেওয়া। ঝড়ও থামল। কিন্তু সেই খিলাড়ীরা কোথায় ? ·· সন্ধ্যে পেরিয়ে যায়, রাত বাড়তে থাকে, ওদের আর দেখা নেই।··· গেল কোথায় সব ? ফেওয়ার তীরে বসে ভাবি। অনেক রাত অবধি ভাবি কত কী !···কিন্তু ওরা আর আসে না।···ওদের দেখা পাই পরদিন।···পরদিন দেখি, ফেওয়ার তীরে ফুলে-ফেঁপে ভেসে উঠেছে সব। আর দশ দশটা নতুন শরিক গিয়ে ভিড় করেছে সামনের ওই পাহাড়গুলোর চূড়ায়।

এদিকে খেয়ালই করিনি এতক্ষণ, গল্প শুনতে শুনতে বরাহী-মন্দিরের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছি। কয়েকটি নেপালী

তরুণীর গান শুনতে পাচ্ছি অস্পষ্ট। ওরা সরু লম্বা একটি নৌকোতে করে আমাদের দিকেই এগোচ্ছে।

আরও খানিকটা এগোতেই গানটা স্পষ্ট হল। শুনলাম, ওরা গাইছে—

মাইলে বাতু ভুলে
মাইলে বাতু ভুলে।
হামি কহন জানে
হামি কহন জানে।

অর্থাৎ, পথ হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে ফেলেছি। আমরা কোথায় যাব? যাব কোথায়?

তরুণীরা গান গাইতে গাইতে আমাদের পেরিয়ে চলে গেল।

মনে হল, তলাও-পারাপার করছে ওরা; হামেশাই ঠিক এই একই গান গাইতে গাইতে ওরা এরকম করে।

কালী বাহাদুর বলেছিল, এ একটা নেপালী লোকসঙ্গীত। এদিককার মেয়েরা প্রায়ই গায় এটা।

মনে পড়ে, এই লোকসঙ্গীতটার মানেও সেদিন কালী বাহাদুরের কাছে জেনে নিয়েছিলাম। এবং তারপর বরাহী-মন্দির-শোভিত ওই দ্বীপটিতে নৌকো ভিড়েছিল যখন, তখন তারই হাত ধরে নেমেছিলাম তীরে।

তীরে নামতেই কিসের একটা কোলাহল যেন। হঠাৎ যেন কাদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে গেল।

ভালো করে তাকাতেই দেখি, জলচর পাখি একদল। আমাদের সাড়া পেয়ে উড়ে পালাতে ব্যস্ত।

একটা কাঠ-ঠোকরা শুধু উড়ল না। আমাদের ঠিক সামনেই এক গাছে বসে আপন মনে কাজ করে গেল।

কয়েকটা বুলবুল দেখলাম, বরাহী-মন্দিরের ছাদে বসে। দেখলাম, কোনদিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই ওদের; বসে আছে তো আছেই।

ওদিকে দেখতে দেখতে মন্দিরটির সামনে পৌঁছুই একেবারে। ছোট্ট সুন্দর ওই দেব-দেউলের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাই।

দেখি যে, দেউলটি দোতলা; দুই ছাদওয়ালা প্যাগোডা যেন একটি। পৃথিবীর কলকোলাহলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সে যেন আপন নীরবতার ভাণ্ডারটুকু ভরে তুলতে ব্যস্ত।

ভাণ্ডারের একেবারে মাঝখানে থাকেন বরাহী ভগবতী। প্যাগোডা মন্দিরে বসে ভক্তদের পুজো গ্রহণ করেন। শুনেছি, জাগ্রত দেবী তিনি। তাঁর কাছে ভক্তগণ আসে দূর-দূরান্তর থেকে। আসে, পুজো দেয়, প্রার্থনা জানায় কত!

সেদিন আমিও জানাই প্রার্থনা। পাহাড়-পরিরক্ষিত হ্রদ-পরিবেষ্টিত, স্তব্ধ, গম্ভীর সেই মন্দিরটির সামনে দাঁড়িয়ে বলি, দেবী, প্রসন্না হও। ভক্তদের সুখে রাখো।

কিন্তু সুখ কোথায়!

বরাহী-মন্দির থেকে ফেরবার পথে কালী বাহাদুরও ঠিক এই একই কথা বলে, সুখ কোথায়! এদিককার মানুষরা বড় কষ্টে আছে। বড় কষ্টে! দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না অনেকেই।

বললাম, আরও ট্যুরিস্ট্ এলে ওদের কষ্ট খানিকটা কমত।

—তা কমত! কিন্তু ট্যুরিস্ট্‌রা এদিকে বড় একটা আসে না।

—কী করে আসবে! ওদের থাকবার সুবিধে চাই তো! হ্রদ দেখবারও চাই ভালো ব্যবস্থা।

—ঠিক বলেছেন। ব্যবস্থা প্রায় কিছুই নেই এদিকে।

—নেই যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এই পাঁচ-ছ মাইল লম্বা, দেড়-দু' মাইল চওড়া ফেওয়া তলাও। এর পাশে কোথাও একটা হোটেল পর্যন্ত নেই। রেস্ট্-হাউস বা ডাক-বাংলোও নেই একটা যে কেউ এসে এখানে থাকবে।

—আমরা কিন্তু নৌকো নিয়ে তৈরী। তোমরা কেউ এলে তলাও দেখিয়ে আমরা খুশি।

—তোমরা খুশি হলেই তো আর চলবে না। ট্যুরিস্ট্‌দেরও খুশি হতে হবে। তোমাদের এই হাড়-জিরজিরে সরু লম্বা ডুবু-ডুবু নৌকোগুলো দেখে ক'জন ট্যুরিস্ট্‌ খুশি হন, সে-বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে।

এইখানে কালী বাহাদুর একটু যেন আহত হয়। বলে, আমাদের নৌকো তোমার তাহলে পছন্দ নয়?

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি, আমার পছন্দে যায়-আসে না কিছু। সকলের পছন্দটাই বড় কথা।

—সকলে কী চায়?

—চায় ভালো নৌকো, আধুনিক হোটেল, সুন্দর ঘাট।

—ঘাট তো আমাদের আছে! ওই তো আছে! ওদিকেই তো যাচ্ছি, বলে কালী বাহাদুর সামনেই কাদা-ভর্তি অপরিচ্ছন্ন ঘাটটাকে দেখায়।

আমি ওই ঘাটের পাশে কুমায়ুনের নৈনীতাল, শ্রীনগরের ডাল-হ্রদ আর মাউন্ট্‌ আবুর নকি হ্রদের ছবি আঁকি মনে মনে; এবং মনের চোখে যেন দেখতে পাই, ওদের চেয়ে পুরো এক শতাব্দী পেছিয়ে আছে এই ফেওয়া তাল। যুগের সঙ্গে যেন সে তাল রাখতে পারছে না কিছুতেই।

কিন্তু আমি রেখেছিলাম তাল। এক শতাব্দী পেছিয়ে গিয়ে ফেওয়ার তালে তাল দিয়েছিলাম নিশ্চয়। কারণ, না যদি দিতাম তো কালী হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠত না আমার সঙ্গে। বলত না, চলুন সাহাব! আমাদের ঘরে চলুন। সামনেই ঘর।

অবাক হলাম খুব। কেননা, খদ্দেরের কাছ থেকে পাওনা পয়সা এবং সেই সঙ্গে অতিরিক্ত পাওনা বকশিশ্‌ আদায়ের মুহূর্তে কোন মাঝি যে তার ঘরে আমন্ত্রণ জানাতে পারে, তা কিন্তু কাশ্মীর কুমায়ুনের কোথাও দেখি নি।

তাই কালী বাহাদুরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম না সরাসরি।

শুধু জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম, এদিকে খাবার-টাবারের দোকান আছে কিছু ?

—কী খাবার সাহাব ?

—এই ধরো, চা-জলখাবার !

—না, ভালো দোকান এদিকে নেই। তবে চায়ের দোকান আমাদের বাড়িতেই একটা আছে বটে।

—আছে ? কালী বাহাদুরের কথা শুনে আশান্বিত হলাম এবার। বললাম, চলো তবে। তোমাদের বাড়িতেই তবে চলো।

চললাম। সেই খুঁটি-তুলে-নেয়া জায়গাটা ডিঙিয়ে অপ্রশস্ত ও অমসৃণ একটা পথ পেরিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলাম।

বাড়ি যেতেই চায়ের দোকানটি চোখে পড়ে প্রথমে। দেখি যে, জীর্ণ-শীর্ণ এক ঘরের দাওয়ায় এক মাঝবয়সী নেপালী বসে বসে ঝিমুচ্ছে। চারপাশে তার চায়ের কিছু সরঞ্জাম, বিড়ি-সিগারেট কয়েক প্যাকেট ; আর কয়েকটা ভাঙা বৈয়াম।

আমাদের সাড়া পেয়েই সে উঠল। অভ্যর্থনা জানাল সসম্ভ্রমে।

বললাম, চা-টা কিছু মিলবে ?

—খুব মিলবে। তবে দুধ নেই। দেরি হবে একটু।

—তা হোক ! বলতে বলতেই দেখি, টেরিলিন-এর শার্ট-প্যান্ট্-পরা এক ভদ্রলোক ; দাওয়ার এক কোণে কম্বলের ওপর চুপচাপ বসে।

ভদ্রলোকটি নিজে থেকেই আলাপ করলেন। ইংরেজীতে বললেন, ভয় নেই। বেশি দেরি হবে না। দুধ ওর বাড়িতেই আছে।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাড়ির মালিকটির দিকে তাকাই। আসল ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করি।

মালিক বুঝিয়ে দেয়, দুধেল ভৈঁস আছে আমার বাড়িতে।

সামনেই আছে। দুধ দুইয়ে এনে চা করব। আপনি ততক্ষণ বরং ওর সঙ্গে একটু গল্প করুন ;—বলেই টেরিলিন-পরা লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে সে বিদায় নেয়।

আমি কালী বাহাদুরকে ফিস ফিস করে শুধোই, কে উনি ? কালী কিছু বলে না। খানিক হাসে শুধু।

—দোকানের মালিকটি কে ? তোমার বাবা ? আবার প্রশ্ন করি আমি।

—জী সাহাব ! কালী সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়। এবং দিয়েই বলতে গেলে একরকম ছুটে আমার সামনে থেকে পালিয়ে যায়।

ওদিকে ভদ্রলোকটি আমার কৌতূহল টের পেলেন আশা করি। কেননা, কালী বাহাদুর চলে যেতেই উনি আমাকে ওর কম্বলের ওপর বসবার অনুরোধ জানিয়ে সবিনয়ে সরল হিন্দীতে বললেন, ম্যয় ত কৃষক হুঁ।

ভাবলাম, কৃষক ! তবে তো ভালোই হল। চাষবাষের খবর পাওয়া যাবে এর কাছ থেকে। বন-জঙ্গলের খবরও পাওয়া যাবে।··· আসার সময় পথে একটা অজগর দেখেছি। অতএব, জঙ্গল নিয়েই প্রশ্ন করা যাক প্রথমে।

—শুনছি, নেপালের তরাইয়ে নাকি চাষবাস হচ্ছে খুব ? জন্তু-জানোয়ার নাকি ক্রমেই নির্মূল হচ্ছে ? প্রথম প্রশ্নটা কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই করে বসলাম।

—তা হচ্ছে। জবাব এলো অপর দিক থেকে, তবে ঠিক নির্মূল নয়। এখনও হামেশাই চোখে পড়ে ওদের।

—চোখে যে পড়ে, তা অবিশ্যি খানিকটা আঁচ করলাম। পথে আসতে আসতে দেখলাম বিরাট এক অজগর।

শুধু অজগর কেন, নেপালের তরাই বাঘ আর গণ্ডারের জন্যেও বিখ্যাত। রাপ্তী আর রিউ নদীর আশেপাশে হামেশাই চোখে পড়ে ওদের। ভিখ্‌না থোরি, কসরা আর সুখীভর-এর জঙ্গলে ওদেরই

তো বলতে গেলে রাজত্ব। এই অবধি বলে একবার থামলেন তিনি; এবং তারপর কী যেন একটু ভেবে নিয়ে আবার শুরু করলেন, সুখীভর-এর গল্প শুনবেন?

মনোযোগী ছাত্রের মতো বললাম, হ্যাঁ, শুনব; বলুন!

—কী জানেন, অমন জঙ্গল ত্বনিয়ায় খুব অল্পই আছে। তার এখানে-সেখানে দাঁড়ালেও বাঘের গর্জন শোনা যায়; গণ্ডারের পথ-চলার মচ্ মচ্ শব্দ ভেসে আসে। বলেই মুখ-চোখের এমন একটা ভাব করলেন ভদ্রলোক, যে দেখে মনে হল, পোখরায় বসেই উনি সে-সব শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

শুধালাম, ট্যুরিস্ট্‌রা যান না ওখানে?

—না, যান না; সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন ভদ্রলোক, সাধারণের জন্যে তো ও জায়গা নয়। শুধুমাত্র রাজাবাহাত্বররাই শিকার খেলেন ওখানে। একবার হল কী জানেন, রাজা পঞ্চম জর্জ এলেন নেপালে।

বললাম, ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ?

—হ্যাঁ, রাজাই বটে। ভদ্রলোক আসল গল্প শুরু করেন এইবার। চোখ ত্ব'টিকে মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফারিত করে বলেন, একবার তিনি নেপালে এলেন।···আসবার আসল কারণ কী?···না, শিকার খেলবেন রাজা। নেপালের তরাইকে একটু পরখ করবেন। ···নেপালীরা এ প্রস্তাবে খুব খুশি। সবাই বলল, বেশ তো! করুন না পরখ!···এদিকে খড়্গ বাহাত্বরের চোখে ঘুম নেই। কারণ, পঞ্চম জর্জকে নিয়ে শিকারে যাবার ভারটা রাজা ওর ওপরেই দিয়েছেন।

এইখানে বাধা দিলাম আমি। শুধালাম, খড়্গ বাহাত্বর আবার কে?

—কে আবার! নেপালের এক নামজাদা শিকারী। লোকে বলত, খালি হাতে বাঘ মারে ও। ওর লাথি খেয়ে গণ্ডার শুয়ে পড়ে।

—ওই খড়্গা বাহাদুরকে আপনি দেখেছেন ?

—না না। আমি দেখব কোত্থেকে! আমার বাবা দেখেছেন। ওর শিকারের গল্প বাবার কাছ থেকেই শুনেছি। বাবা বলতেন, পঞ্চম জর্জ যখন এলেন, তখন খুব নাকি ধুমধাম হয়েছিল সুখীভর-এর জঙ্গলে। তখন 'থারুস'দের কদর খুব নাকি বেড়ে গিয়েছিল।··· আর কেনই বা বাড়বে না। ওরা হল গিয়ে মাহুত, হাতির চালনদার; ওদের তালিম ছাড়া রাজা-বাহাদুর শিকার খেলবেন কী করে।····খড়্গা বাহাদুরের অবিশ্যি 'থারুস'দের সঙ্গে খুব দোস্তি ছিল। তাই শিকারের সময় ওদের খুঁজে পেতে আদৌ কষ্ট হল না তার। প্রায় আড়াই শো 'থারুস' বলতে গেলে রাতারাতি যোগাড় হয়ে গেল।··· বুঝতেই পারছেন, আড়াই শো 'থারুস' মানে আড়াই শো হাতি।···হ্যাঁ, বিরাট এক হাতির দঙ্গলকে নিয়ে খড়্গা বাহাদুর তো তৈরী হল। আর ওদিকে পঞ্চম জর্জও এসে পৌঁছুলেন সুখীভর-এ।···শিকার খেলা যথাসময়ে শুরু হল। পঞ্চম জর্জ জঙ্গলের মাঝখানে বিরাট উঁচু এক মাচার ওপর বসলেন; আর খড়্গা বাহাদুর ওই আড়াই শো হাতিকে সাজিয়ে দিল চক্রাকারে। অর্থাৎ কিনা, মাচাকে ঘিরে দু' তিন মাইল দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। এবং তারপরেই শুরু হয়ে গেল দারুণ হৈ-হট্টগোল।···ব্যাপার কী?···না, ওই হাতির চক্রটা ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে। জানোয়ারদের খেদান হচ্ছে কায়দা করে। ···'থারুস'রা চিৎকার করছে। ঢাক, ঢোল আর টিন পিটোচ্ছে প্রাণপণে। কিন্তু জানোয়াররা অত সহজে কী আর ধরা দেয়।··· খড়্গা বাহাদুর তাই নতুন এক ফন্দী আঁটল। 'থারুস'দের বলল, জঙ্গলের চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিতে।···শোনা যায়, আগুন সত্যি নাকি ধরানো হয়েছিল। অসংখ্য শাল, শিশু, শিমুল ও ভাবর-গাছ নাকি জ্বলে উঠেছিল দাউ দাউ করে।···আর খড়্গা বাহাদুর সেই আগুনের মাঝখানে ছোটাছুটি করতে করতে বার বার নাকি বাহবা দিয়েছিল 'থারুস'দের;···ওদিকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বন্দুক নিয়ে তখন

তৈরী। জানোয়ার চোখে পড়া মাত্রই মাচার ওপর থেকে গুলি করছেন তিনি।...ছোটখাটো জানোয়ারদের তিনি কিচ্ছু করছেন না; নাগালের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছেন। তিনি মারছেন শুধু বাঘ আর গণ্ডারদের।...আর সে কী মার! শোনা যায়, পঞ্চম জর্জ একাই একুশটি বাঘ, দশটি গণ্ডার আর দু'টি ভালুক মেরেছিলেন সে-যাত্রায়।...শিকার-পর্ব শেষ করে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখেছিলেন, "আপনি আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর খেলা খেলতে দিয়েছেন। বিশ্বাস করুন, খেলাটি আমি মনেপ্রাণে উপভোগ করেছি; এবং এ-অভিজ্ঞতা সবচেয়ে সুন্দর এক স্মৃতি হিসেবে চিরকাল আমার মনে থাকবে।"

—আচ্ছা, তা না হয় থাকল! এতক্ষণ বাদে কথা বললাম আমি, কিন্তু খড়্গ বাহাদুরের কী হল শেষ অবধি?

—সে আর ফিরে এলো না। জঙ্গলে ছোটাছুটি করবার সময় এক মেজাজী বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিল।...কিন্তু তার কথা কে আর মনে রাখে, বলুন?...সবাই তো পঞ্চম জর্জের খেলার তারিফ করতে ব্যস্ত। সবাই ব্যস্ত নেপালের জংলী তরাইকে বাহবা দিতে।...তবে হ্যাঁ, খড়্গ বাহাদুরের মৃত্যুতে 'থারুস'রা দমে গিয়েছিল খুব। বলেছিল, রাজা গেলে রাজা আসে; কিন্তু খড়্গ বাহাদুর আর আসবে না।...কারণ,...

সেদিন শিকারের গল্প আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু তা আর হল না। মাঝপথে বাধা পড়ল হঠাৎ। দুধ নিয়ে কালী বাহাদুর আর ওর বাবা এলো।

গল্প জমে উঠেছে দেখে কালীর বাবা খুব খুশি।

—এ তো জানা কথা! শরীফ আদমীদের দেখা হলে ভালো-মন্দ দু'চারটে কথা হবেই! বলল সে।

আমি আপত্তি জানালাম, শরীফ ওকে বরং বলতে পার; আমাকে নয়।

—কেন নয়! কেন নয়! বলে কালী বাহাদুরের বাবা কী যেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। এমন সময় বাধা দিল কালী। যা সে বলল, তার মানে দাঁড়ায়, এই যে ভদ্রলোকটিকে দেখছ, এর নাম মীন বাহাদুর। ইনি এক সময়ে নেপালের ডিফেন্স মিনিস্টার ছিলেন।

ডিফেন্স্ মিনিস্টার! কথা শুনে চমকে উঠি। মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নেবার চেষ্টা করি, সত্যি? সত্যিই কি পাঁচশো মাইল লম্বা, দেড়শো থেকে আড়াই শো মাইল চওড়া এবং প্রায় ১ কোটি লোক-অধ্যুষিত এক বিরাট দেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী আমার সামনে বসে?

কিন্তু মন্ত্রীটির এমন উদ্ভট খেয়াল হল কেন? কেন তিনি এত জায়গা থাকতে জল-জঙ্গলে ঘেরা পোখরার জীর্ণ-শীর্ণ এই চায়ের দোকানটিকে বেছে নিলেন?

—এদিকেই থাকেন বুঝি? ওঁকে শুধালাম একবার।

—হ্যাঁ, এদিকেই। উনি বললেন। এবং বলেই হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ফেওয়া তলাও-এর ওপারে ওই যে দেখছেন, সাদা রঙের বাড়িটা, ওখানে থাকি।

মীন বাহাদুরের কথা শুনে তাকালাম একবার। বাড়িটা খুঁজে পাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। ফেওয়া তলাও-এর ওপারে সাদা বিন্দুর মতো একটা যে বস্তু চোখে পড়ল, তাকে বাড়ি না বলে গাড়ি বা শাড়ি যা খুশি বলা যেতে পারে।...অতএব ওই বাড়ির প্রসঙ্গ এড়িয়ে অন্য কথা বলবার চেষ্টা করি।

—নেপালের ডিফেন্স মিনিস্টার এখন কে? সরাসরি শুধোই ওঁকে।

উনি কী যেন একটা নাম বলেন।

—আপনি মিনিস্টারশিপ্ ছেড়েছেন কতদিন? কেন ছেড়েছেন?

রাজনীতি করছেন এখনও ? আমি ততক্ষণে পাকা রিপোর্টার হয়ে উঠেছি যেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছি ওঁকে। আর উনিও হাসিমুখেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন উনি এড়িয়ে গেলেন। মিনিস্টারশিপ্ কেন ছেড়েছেন, তা কিছুতেই বললেন না।

অগত্যা এ-নিয়ে আমিও আর পীড়াপীড়ি করলাম না বিশেষ। কালী বাহাদুরদের দোকানে চা-পানে মেতে উঠলাম বরং।

নীরবতা শেষ অবধি অবিশ্যি কালী বাহাদুরই ভাঙল।

—উনি এখন হোটেল খোলার কথা ভাবছেন। মীন বাহাদুরকে লক্ষ্য করে বলল সে।

—সত্যি, খুলবেন নাকি হোটেল ? কোথায় খুলবেন ? নিজেকে রিপোর্টারের ভূমিকা থেকে তখনও গুটিয়ে আনতে পারি নি আমি। তখনও তাই এককালের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীকে তাক করে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ছি।

ওদিকে মন্ত্রী যেন আগের তুলনায় গম্ভীর হয়ে উঠলেন এতক্ষণে। মন্ত্রীসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখেই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, হ্যাঁ, হোটেল খোলার কথাই ভাবছি। এই ফেওয়া তলাও-এরই তীরে খুলব হোটেল।

বললাম, খুবই ভাল হয় তবে। ট্যুরিস্ট্রা এসে থাকতে পারে।

ট্যুরিস্ট্দের কথা শুনে কালী বাহাদুর উচ্ছ্বসিত।

—জানেন! আবার শুরু করে সে, ফেওয়ার দুই তীরে দু'টো হোটেল খুলবেন মীন বাহাদুর। কত লোক এখানে আসবে!

এদিকে লোকের কথা উঠতেই দেখি, একটি শিশু যোগ দিয়েছে আমাদের আড্ডায়। হামাগুড়ি দিতে দিতে খুব যেন সে ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

কালী বাহাদুরকে দেখতে পেয়েই হঠাৎ দারুণ খুশি হয়ে ওঠে

শিশুটি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে ওর পা ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কালী ধমক দেয়, থামস!

—ও কে? তোমার ভাই বুঝি? হ্যাফ্-প্যান্ট্-পরা আঠার-উনিশ বছরের ছেলে কালী বাহাদুরকে শুধোই। কালী কোন জবাব দেয় না; অতর্কিত প্রশ্নে ভীষণ লজ্জিত হয়ে উঠে অন্যদিকে তাকায়।

জবাবটা শেষ পর্যন্ত আসে ওর বাবার কাছ থেকে, না বাবুজী! ভাই নয় ও। ও হল কালী বাহাদুরের ছেলে।

—ছেলে! জবাব শুনে আকাশ থেকে পড়ি বুঝি। কিশোর কালী বাহাদুরও যে পিতা হতে পারে, তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

ওদিকে মীন বাহাদুর মুচকি মুচকি হেসে চলেছেন সেই থেকে। যেন বোঝাতে চাইছেন, এ আর এমন কি ঘটনা! এদিকে হামেশাই তো হয় এমন!

কিন্তু আসল ঘটনা বুঝতে তখনও বাকি ছিল। খানিক বাদেই যখন এগিয়ে এলো শিশুটির মা, এসে তাকে কোলে নিল, তখন বোঝা গেল, আরও কত কী হয় এদিকে!

মা-টিকে কালী বাহাদুরের মা ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু যখন শুনলাম, কালীর বাবা বলছে, ওই নাকি তার ছেলের বৌ, তখন বিস্ময়ের অবধি রইল না আমার।

বৌ বেশ রূপসী। সামনের ওই জলভরা ফেওয়া তলাও-এর মতোই সারা অঙ্গে যৌবন তার ভরো-ভরো।

কিন্তু কালী দেখলাম নির্বিকার। ছেলেকে তো বটেই, বৌকেও ওখান থেকে হটিয়ে দিতে পারলে সে যেন বাঁচে।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি আমাকেই হটতে হল। বেলা পড়ে আসছিল। সঙ্গীরা বিদায় নিয়েছিল অনেক আগেই। তাই কালী বাহাদুর ও মীন বাহাদুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরতে হল তাড়াতাড়ি।

ফিরবার আগে কালী বাহাদুরকে পয়সা দিতে গেলাম। বললাম, নৌকোর ভাড়াটা দেওয়া হয়নি এখনও। কত দিতে হবে, বলো।

কালী কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

—কী হল! বললে না? আবার তাড়া দিলাম ওকে।

ও সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, কী আবার বলব! তোমার যা খুশি দাও।

—আমি তো এদিককার 'রেট্' জানি না। তা ছাড়া নৌকোতে ওঠার সময় দরদস্তুরও করি নি তোমার সঙ্গে।

—করেন নি, ভালোই করেছেন। বললেন মীন বাহাদুর, দরদস্তুরের ও তোয়াক্কাও করে না। খুশি হয়ে যে যা দেয়, তাই নেয়।

অবাক লাগল। কেননা, এত সহজে খুশি হতে আর কোন মাঝিকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ল না।

ওদিকে কালী বাহাদুরের বাবা ব্যাখ্যা শুরু করেছে ততক্ষণে, কী জানেন! একবার স্বপ্ন দেখেছিল আমার কালী। দেখেছিল, স্বয়ং বরাহী ভগবতী ওকে বলছেন, দেখিস বাবা! কাউকে যেন চাপ দিস নি। লোক তো কতই আসবে এদিকে। আমার মন্দির দেখতে আসবে। ওদের কাউকে চাপ দিস নি যেন। খুশি হয়ে যে যা দেবে, তাই নিবি।

বললাম, বেশ তো! তাই নেবে। কিন্তু আমি তো আর বরাহী ভগবতীকে দেখতে আসি নি; এসেছি ফেওয়া তলাও দেখতে। অতএব আমার সঙ্গে দরদস্তুরে আর আপত্তি কী!

কালী বাহাদুর আপত্তি জানায় তবু, না, তা হয় না।

আমি অবাক হয়ে শুধোই, কেন হয় না?

কালী বাহাদুর চুপ করে যায় আবার। হ্যাঁ-না কিছুই বলে না।

ওদিকে মীন বাহাদুর বলেন, ওকে বুঝিয়ে লাভ নেই কিছু। আমরা অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

অগত্যা সামান্য কিছু টাকা কালী বাহাদুরের হাতে গুঁজে দিয়ে বিদায় নিলাম।

বিদায়ের সময় বার বার করে অনুরোধ করলাম ওকে, যেন ও অন্নপূর্ণা হোটেলে গিয়ে পরদিনই আমার সঙ্গে দেখা করে।

কিন্তু পরদিন পেরিয়ে গেল। তারও পরের দিন পেরোল। কালী বাহাদুর আর এলো না।

চৌদ্দ

এদিকে আরণ্যক পোখরার দিনগুলো রঙেরসে ভরে ওঠে। এয়ার-পোর্টে বসে যাত্রীদের আসা-যাওয়া দেখি কখনও। আবার কখনও দেখি জল-জঙ্গল। হ্রদ দেখি কখনও; রূপা বা বেগনাস-তালকে নিয়ে মেতে উঠি। আবার কখনও মাতি রহস্যময়ী শ্বেতি নদীকে নিয়ে।

শ্বেতি তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ব্যস্ত। এই আছে, এই নেই সে। এই দেখি, একশো-দেড়শো ফুট গভীর গিরিখাত ধরে দিব্যি তর তর করে সে এগোচ্ছে। আবার এই দেখি, চিহ্নমাত্রও নেই তার। বন-জঙ্গলের আড়ালে অথবা গিরিখাতের তলায় সে সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

শ্বেতির এই লুকোচুরি দেখতে বেশ লাগত আমার।

বেশ লাগত, যখন দেখতাম, মাত্র কয়েক ফুট প্রশস্ত একটা গিরিখাত ধরে রহস্যময়ী চলেছে। ঝকঝকে একটা ইস্পাতের ফলার মতো চলেছে।

তার চলার নেশা এক একদিন আমাকে পেয়ে বসত। গিরিখাত ধরে তার ধারে-কাছে এগিয়ে যেতাম আমি। খাড়া পাহাড়ের গা-ঘেঁষে নদীগর্ভের দিকে নামতাম অতি সন্তর্পণে।

আকাশটা দেখতে দেখতে ছোট হয়ে যেত। শ্বেতি নদীর শ্বেত জল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'ত ক্রমেই। আর ক্রমেই অদ্ভুত একটা কুহক আমাকে ঘিরে ধরত। বন-জঙ্গল থেকে ভেসে-আসা বিচিত্র এক সুবাস দেখতে দেখতে মাতাল করত আমাকে। মনে হ'ত আরও এগোই। আরও।

এগোতাম ঠিক। ঠিক মনে হ'ত, শ্বেতির গর্জন বাড়ছে ধীরে

ধীরে। আর পাহাড়ীয়া ঝিঁঝির আর্তনাদ ধীরে ধীরে যেন সেই গর্জনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

যত নামতাম নিচের দিকে, এই হারাবার খেলাটা ততই যেন জমত ভালো। ততই যেন মনে হ'ত, আকাশ হারাচ্ছে। পৃথিবী হারাচ্ছে। হারাচ্ছি আমিও। সব হারিয়ে কুহকিনী শ্বেতির মায়াজালে যেন জড়িয়ে পড়ছি।

কিন্তু কোথায় শ্বেতি? খানিকদূর এগিয়ে হঠাৎ দেখতাম, শ্বেতি নেই।

গেল কোথায় সে? কোন্ পথ দিয়ে অদৃশ্য হল? তাকে খোঁজ আবার।

খুঁজতাম। খুঁজতে খুঁজতে কতদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ত। বিকেল দেখতে দেখতে পৌঁছে যেত সন্ধ্যের দরজায়। কিন্তু শ্বেতির হদিস মিলত না আর।

হদিস কী করে মিলবে! শ্বেতি যে এই একই লুকোচুরি খেলছে আদ্যিকাল থেকে। এই ধরা দিচ্ছে সে। এই আবার অধরা হচ্ছে, নগাধিরাজের গোপন কোন সুড়ঙ্গ-পথ ধরে ছুটছে।

সুড়ঙ্গ-পথ কত যে জানা আছে শ্বেতির, কত যে গোপন পথ ধরে তার অভিসার, তা জানি নে। জানি শুধু শ্বেতির জনপ্রিয়তার কথা। জানি যে, পোখরায় কেউ এলে শ্বেতিকে দেখতে সে যাবেই।

শ্বেতিকে দেখতে যাবে; আর যাবে ফেওয়া, বেগনাস ও রূপা হ্রদকে দেখতে।

বেগনাস ও রূপা ভাই-ভাই যেন। পোখরার অনতিদূরে পঞ্চ্‌ভাইয়া পর্বতের দু'পাশে ঠিক যেন দু'টি ভাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে।

তবে ওদের মধ্যে আবার অগ্রজ বুঝি রূপা। আকারে-প্রকারে বেগনাস-এর চেয়ে অনেক বড় বলেই অগ্রজ। তাকে ঘিরে রূপদর্শী মোসাহেবদের ভিড়টা বেশি জমজমাট বলেই অগ্রজ সে।

মনে পড়ে, রূপদর্শীদের অনেককেই রূপায় দেখেছি। হ্রদের তীরে তাঁবু খাটিয়েছে কেউ, কেউ নৌকোতে করে হ্রদ পাড়ি দিচ্ছে, কেউ আবার ব্যস্ত মাছ ধরায়।

ওই মাছ-ধরিয়েদেরই দু'চারজন সবাইকে টেক্কা দিল যেন। ধরা মাছ নিয়ে সমারোহ সহকারে পিক্‌নিক্ শুরু করল রূপা হ্রদেরই তীরে।

কিন্তু হ্রদটা বড় বেশি নির্জন যেন। লোকজন কেউ যে ওখানে আছে, ওকে দেখে প্রথমটায় তা যেন ঠাওর হয় না।

ঠাওর বরং হয় উল্টোটাই। মনে হয়, কেউ নেই। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। হ্রদটা আদ্যিকাল থেকে আকাশ-উঁচু পাহাড় ও গাঢ়-সবুজ বনকে সাক্ষী রেখে মৌনী হয়ে আছে। তার জল নিথর, তীরভূমি নিস্তব্ধ।

কাছে গেলে স্তব্ধতার ঘোর কাটে অবিশ্যি। অনেক দূর থেকে তখন নৌকো চলার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে আসে ; অথবা ভেসে আসে রূপদর্শী নরনারীদের কল-কাকলী।

বেগনাস হ্রদে কল-কাকলী কম আরও। হ্রদটা রূপার তুলনায় আরও অনেক বেশি নিঝুম।

এছাড়া রূপার তুলনায় অনেক ছোট বেগনাস। অনেক ছোট এবং অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক।

হ্রদটা দারুণ আঁকাবাঁকা বলেই কৌতূহল উদ্রেক করল আমার ; প্রথম-দর্শনেই অভিভূত করল।

আঁকাবাঁকা—কী যে ভীষণ আঁকাবাঁকা বেগনাস! প্রথম-দর্শনে তাকে অতিকায় একটি মাকড়সার জলছাঁচ বলে মনে হয়। মনে হয়, নড়ে-চড়ে উঠবে মাকড়সাটা! পাহাড় বেয়ে চলতে শুরু করবে!

কিন্তু না, চলে না বেগনাস। নড়ে না এতটুকু। কেমন যেন থমথমে ও গম্ভীর হয়ে থাকে। আশেপাশের অনতিউচ্চ পাহাড়গুলো

প্রহরা দেয় তাকে। প্রতিবেশী অরণ্য থেকে ভেসে-আসা মর্মরধ্বনি তাকে ঘুম-পাড়ানীয়া গান শোনায়।

কিন্তু গান কি শুধু বেগনাস-এরই আনাচে-কানাচে? বেগনাস থেকে চার মাইল মাত্র দূরের পোখরাতে নেই গান?

কে বলে, নেই? পোখরাতে বসে কত গান আমি শুনলাম অরণ্যের কত বিচিত্র রাগ-রাগিনী কানে এলো আমার! মনে পড়ে, হঠাৎ যেদিন অতর্কিতে বর্ষণ শুরু হল, ঝড়-তুফানের সঙ্গে সঙ্গে ঢল নামল যেদিন, পোখরার অরণ্য-হাহাকারকে সেদিন লক্ষ সিংহের গর্জন বলে ভেবেছিলাম। আবার যে মুহূর্তে মেঘ সরে গেল, তুফান থেমে গেল, ধোয়া-মোছা অরণ্য আন্দোলিত হতে লাগল ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়ায়, সে মুহূর্তে বার বার ভেবেছিলাম, সিংহ ছুটি নিল বুঝি এবার। বিদ্রোহী অরণ্য এবার বুঝি প্রার্থনার সঙ্গীতে ভরপুর হল।

প্রার্থনাই বটে! আজ ভাবি, পোখরার অরণ্যে প্রার্থনার প্রশান্তি একদিকে। আর অপরদিকে বিদ্রোহ-বিপ্লবের জ্বালা। ঠিক মানুষেরই জ্বালার মতো যেন। মানুষেরই প্রশান্তির মতো

দেখি সেই মানুষকেও। পোখরার এয়ার-পোর্টে বসে কত সময় যাত্রীদের আসা-যাওয়া দেখি।

কাঠমাণ্ডু থেকে আসে প্লেন, গোর্খা বা ভরতপুর হয়ে আসে। আবার কখনও আসে ভাইরওয়া থেকে। কাঠমাণ্ডু-পোখরা-ভাইরওয়া পথে রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্‌স্‌-এর ফ্রেণ্ড্‌শিপ প্লেনগুলো নিয়মিত যাতায়াত করে।

করতেই হবে যাতায়াত। প্লেন ছাড়া আর কোন যানবাহন নেই এদিকে। দীন-দরিদ্রদেরও ভরসা ওই রয়্যাল নেপাল এয়ার-লাইন্‌স্‌।

শুনেছি, গাড়ি চলাচলের উপযোগী পথ নাকি হচ্ছে। কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা হয়ে ভাইরওয়া অবধি হচ্ছে পথ। কিন্তু সে-পথে গাড়ি চলতে কতদিন লাগবে আরও? আরও ক'বছর লাগবে?

ওদিকে গরীব-দুঃখীদের ফুটো পকেটগুলো দিয়ে সব পয়সা যে গড়িয়ে পড়ল। সব গিয়ে জড়ো হল রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্‌স্-এর তহবিলে!

মনে পড়ে, এয়ারলাইন্‌স্-এর যাত্রীদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি কত সময়। কত সময় দেখেছি, কাঠমাণ্ডুর প্লেন থেকে ট্যুরিস্ট্-সাহেবদের পেছনে পেছনে যারা নামছে, তাদের পোশাক-আশাক সাহেবের বাবুর্চী-খানসামার চেয়েও অনেক নিচুস্তরের।

দেখেছি, তাপ্পি-লাগানো শাড়ি ওদের। জামাগুলো ওদের ছেঁড়া। ভয়ে লজ্জায় একেবারে জবুথবু হয়ে প্লেন থেকে ওরা নামছে।

অথচ জবুথবু হবার তো কোন কারণ ছিল না। ওরা গরীব বলে রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্‌স্ কনসেসান তো কিছু দেয় নি। কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা আসা বাবদ নেপাল-কারেন্‌সির হিসেবে পুরো উনআশি টাকা ভাড়াই আদায় করে ছেড়েছে।

এই ভাড়া আদায় নিয়ে মর্মান্তিক একটা ঘটনা ঘটল একদিন।

একদিন দেখা গেল, এয়ার-অফিস্-এর বুকিং-কাউণ্টারে ঝগড়া শুরু হয়েছে। তুমুল ঝগড়া।

ব্যাপার কী?

না, স্থানীয় এক বুড়ী কাঠমাণ্ডু যাবে। তার ছেলের খুব অসুখ। তাকে দেখতে যাবে। কিন্তু যাবার জন্যে উনআশি টাকা ভাড়ার পুরোটা সে জোটাতে পারে নি। অথচ যেতেই হবে তাকে। যেমন করে হোক যেতে হবে। তাই সে এয়ার-অফিসের বাবুদের কাছে কিছু কনসেসন চাইছে।

শেষটায় বাবুদের একজন ভয় দেখাল, নড়ো যদি তো ভাল। আর না যদি নড়ো তো দরোয়ান ডেকে হটিয়ে দেব। ঘাড় ধরে দূর করে দেব।

বুড়ী বললে, ইস!···আর বলতে বলতেই···

বলতে বলতেই হাওয়া-অফিস-এর এক বাবুর গায়ে থুথু ছুঁড়ল সে।

বাবুটি অগ্নিমূর্তি হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো; সঙ্গে এলো তার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ। এসেই বুড়ীর ওপর যে পরিমাণ কিল চড় চাপড় বর্ষণ করল, সৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি সামনের ওই অন্নপূর্ণার ওপরে সে হারে বজ্রবর্ষণ হয় নি।

বুড়ী পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগল। আর উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে দু'চারজন ক্ষীণ প্রতিবাদ করল যেন। একজন বলল, বুড়ীটা কাঠমাণ্ডু যাবে বলে থালা, ঘটি, বাটি বিক্রী করেছে; কিন্তু চল্লিশ টাকার বেশি জোটাতে পারে নি বেচারী।

আর বেচারী! ব্যাপার দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। কী করব, ভাবছিলাম। এমন সময় সেই বিদঘুটে শব্দটা কানে এলো আবার। সেই মচ্ মচ্ করে গাছ-ভাঙার শব্দটা আবার কানে এলো।

কে করে এই শব্দ? কে? কে?

কিন্তু না; এবারও খুঁজে পাই নে কিছু। খুঁজতে গিয়ে অন্য এক রহস্যকে আবিষ্কার করি বরং। দেখি, 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' হাতে নিয়ে মূর্তিমান এক রসিক; আমার থেকে খানিকটা দূরেই পায়চারি করছেন।

রসিকটি যে বাঙালী, প্রথম-দর্শনেই সে ধারণা বদ্ধমূল হল।

কিন্তু বাঙালী একজন অতি সুন্দর একটি কবিতার বইকে সঙ্গী করে এখানে কেন? উনিও কি তাহলে আমার মতো যাযাবর? প্রাণ চাইলেই হিমালয়ের এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান? ভাবি আকাশ-পাতাল।

ভদ্রলোকটি এতক্ষণে আমার খুব কাছে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর লম্বা চেহারা, দোহারা গড়ন, ময়লা জামাকাপড়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি

স্পষ্ট চোখে পড়ছে আমার। মনে হচ্ছে, বয়স এখনও ওঁর তিরিশ পেরোয় নি।

ওদিকে আলাপটা পূর্ব-তিরিশের দিক থেকেই প্রথম শুরু হয়। আমার একেবারে সামনে এসে শুধোন উনি, আপনি তো বাঙালী?

বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।

—আসছেন কোত্থেকে?

—কলকাতা। আপনি?

—আমিও কলকাতা।

—উঠেছেন কোথায়?

—হোটেল হিমল। আপনি?

—অন্নপূর্ণা।

—থাকবেন কিছু দিন?

—ঠিক নেই।

সেদিন ঠিক সে-মুহূর্তেই আলাপটা হয়তো আরও এগোত, যদি না এয়ার-পোর্টের এক কর্মী এসে বলতেন, শীগ্‌গির সরে পড়ুন। ভিড় বাড়াবেন না। গোলমাল হতে পারে।

—গোলমালের কী আর বাকি আছে মশাই! বলেই বাঙালী ভদ্রলোকটি তাকালেন ওই কর্মীর দিকে।

কর্মী কী যেন একটা কড়া জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু আমি বাধা দিলাম। হঠাৎ বলে বসলাম, বুড়ীটা বেঁচে আছে তো এখনও?

কর্মীটি বীরদর্পে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ! খুব আছে; এত অল্পে ওদের কিছু হয় না।·· ওই তো! দেখুন না ওকে!

দেখলাম। জনকয়েক লোক বুড়ীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কে যেন একটি পাত্রে করে জল নিয়ে এসেছে। চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে ওকে।

আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়ী চাঙ্গা হয়ে উঠে বসল। পিট-

পিট করে তাকাল আমাদের দিকে। বাঙালী ভদ্রলোক বললেন, দেখেছেন মজা! এত বড় একটা অন্যায় হয়ে গেল; কিন্তু কেউ একটু প্রতিবাদ করল না!

বললাম, কে করবে প্রতিবাদ? কী করে করবে? এসব ব্যাপার ওদের গা-সহা যে!

—তবু বলা যায় না কিছু! প্রতিবাদ হলেও হতে পারে। এয়ার-পোর্টের কর্মীরা খুব যেন উদ্বিগ্ন।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। খানিকক্ষণ বাদে বুড়ী একটি ছেলের হাত ধরে টলতে টলতে চলে গেল। এয়ার-পোর্টের কর্মীরা অফিস বন্ধ করল। এবং আমাদের সামনেকার 'রান-ওয়ে' তার প্রকাণ্ড শূন্যতা নিয়ে খাঁ খাঁ করতে লাগল।

এতক্ষণে আলাপ জমে উঠেছে বাঙালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে। জেনেছি, তাঁর নাম কল্লোল নন্দী। কলকাতায় ক্যাড্‌বেরী-অফিসে কাজ করেন। নেপাল ঘুরতে বেরিয়েছেন সম্প্রতি।

সেদিন শেষ পর্যন্ত ওঁকে আমাদের হোটেলে আসবার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

উনি এলেন ঠিক। পরদিন সকালেই এলেন। এসেই বললেন, চলুন, পোখরা বাজার থেকে ঘুরে আসি।

বললাম, হঠাৎ বাজার?

—কিছু না। এই এমনি। 'লোক্যাল গুড্‌স্' কিছু কিনব।

—বেশ তো! কিনবেন। আমিও কিছু কিনব না হয়! বলেই তাড়াহুড়ো করে চা খেয়ে কল্লোল নন্দীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।

হাঁটা-পথ ধরে এগোচ্ছি আমরা। পোখরার আরণ্যক স্তব্ধতা আমাদের পদশব্দে থেকে থেকে যেন আহত হচ্ছে। যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না, এমন একটা নির্জন-নিস্তব্ধ পাহাড়পুরীতে আদৌ কোন বাজার থাকতে পারে।

এদিকে বাজারে পৌঁছে মনে হল, সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ

এখানে। মনে হল, এত এখানে লোকজন আর কেনাকাটার ধুম যে, এর ঠিক পাশেই যে নিরিবিলি কোন জায়গা থাকতে পারে, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না।

এয়ার-পোর্ট থেকে খুব একটা দূরে নয় পোখরা বাজার। বড় জোর মাইল দু'-আড়াই হবে। কিন্তু এই সামান্য দূরত্বের অবকাশেই পোখরার চেহারায় আসমান-জমিন ফারাক।

বাজার এলাকা সরগরম মনে হল বেশ। বহুলোকের আনা-গোনা ওখানে চোখে পড়ল। আর চোখে পড়ল মিসেস জেইন টমাসকে।

হঠাৎ ওঁকে দেখে চমকে উঠেছিলাম খুব। শুধিয়েছিলাম, আপনি? আপনি এখানে?

—আমি এদিকেই উঠেছি। সামনেই পদম বাহাদুরের বাড়ি। ওখানে উঠেছি।

—পদম বাহাদুর? কে সে?

—গাইড একজন।

—গাইড?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, গাইড। ধবলগিরি এক্স্পিডিশনে টমাসদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ও। আমি এলে ওর বাড়িতেই উঠি।

—বাড়িটা কোথায়?

—ওই তো, সামনেই। ওই যে দেখছেন শাল-মহুয়ার ঝোপ, ঠিক ওর পেছনেই। মিসেস টমাস সযত্নে চেনাবার চেষ্টা করেন বাড়িটা। অনুরোধ জানান বিশেষ করে, আসুন না একবার!

বললাম, আসব।

—কালকের মধ্যে আসবেন কিন্তু! পরশু চলে যাব।

—বেশ! কাল সকালেই আসব।

—হ্যাঁ, মনে থাকে যেন! কাল সকালে। বলেই মিসেস জেইন টমাস তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কল্লোলবাবু কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলেন এতক্ষণ। সামনেই এক দোকানে দাঁড়িয়ে বাঁশের চিরুনি দর করছিলেন। এইবার চিরুনি কিনে ফিরে এলেন তিনি। শুধোলেন, মহিলাটি কে?

বললাম ওঁকে সব। আর বললাম, ওঁর একটা বই আমার কাছে রয়েছে। ওটা ফেরত দিতেও একবার অন্তত যেতে হবে।

সব শুনে কল্লোলবাবু স্তম্ভিত। মিসেস জেইন টমাস-এর কাহিনী শুনে হতবাক একেবারে।

ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি, কেন? এমন কি হয় না? সত্যি কি গল্পকেও ছাড়িয়ে যায় না এক এক সময়?

উনি জবাব দেন না কিছু। ব্যস্ত হয়ে কেনাকাটা শুরু করেন।

উপায় নেই। কিনতেই হবে কিছু। কলকাতায় থাকেন বিধবা মা। তাঁর জন্যে পোখরার কিছু স্মৃতি নিয়ে যেতেই হবে।

স্মৃতি-সংগ্রহে সময় লাগে না; সামান্য কিছু কেনাকাটা কয়েক মিনিটেই হয়ে যায়। সময় লাগে হোটেলে পৌঁছুতে; পোখরা বাজার থেকে এয়ার-পোর্ট এলাকায় আসতে।

মনে পড়ে, ফিরে আসছি।

ধীরে, খুব ধীরে পথ চলছি। কল্লোল নন্দী আবৃত্তি করছেন জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতা—

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিলো ইতিহাসে;
বিস্তৃত প্রাসাদে তা'রা দেয়ালের অব্‌লঙ ছবি;
নানারূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে মরে গেছি—মনে পড়ে বটে
এই সব ছবি দেখে; বন্দীর মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোন দেবদত্ত, উদয়ন, চিত্রসেনী স্থাণু।
এক দরজায় ঢুকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে অন্য এক দুয়ারের দিকে
অমেয় আলোয় হেঁটে তা'রা সব।

সেদিন হোটেলে ফিরতে ফিরতে সকাল গড়িয়ে গেল।

ফিরেই সেই পুরনো সংবর্ধনাটা নতুন করে লাভ করলাম আবার। মচ্ মচ্ করে গাছ-ভাঙার শব্দটা আবার শুনলাম।

কিন্তু শব্দটা এতদিনে গা-সহা হয়ে গেছে। তাই এ নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়েই দিয়েছি একরকম।

মাথায় বরং অন্য চিন্তা ভিড় করছে। মিসেস জেইন টমাস, কল্লোল নন্দী, কালী বাহাদুর ও মীন বাহাদুরের কথা মনে পড়ছে বার বার।

কল্লোল নন্দী আগামীকাল সকালে ভাইরওয়া যাবেন। টিকিট 'বুক' করা হয়ে গেছে।

ভাবলাম, ওঁকে প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে পোখরা-বাজারে মিসেস জেইন টমাস-এর কাছে যাব।

তাই গেলাম শেষ অবধি। কল্লোল নন্দীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরদিন সকালে পোখরা-বাজারের পথ ধরলাম।

বিদায়ের মুহূর্তে কল্লোলবাবু 'ফেওয়া তাল'কে নিয়ে লেখা একটি কবিতা উপহার দিয়ে গেলেন।

ওতে ছিল—

হেথা শূন্য, পূর্ণ প্রকৃতির বুকে
প্রকাশের সুখে,
সৃষ্ট হয়ে দেবতার প্রতি
জানায় প্রণতি।
তরুময় গিরি লহরী
একান্তে রহিছে প্রহরী
বেড়িয়া বিরাট ঝিল,
নিসর্গের পরম দলিল।

সেদিন পোখরা-বাজার যাবার পথে কবিতাটি পড়লাম

কয়েকবার। মনে হল, খুব উঁচু দরের শিল্প এ না-হলেও এর মধ্যে যেন জীবনানন্দেরই ছায়া

আচ্ছা, জীবনানন্দ হলে এই পোখরাকে নিয়ে কী লিখতেন? সেদিন পথ চলতে চলতে ভাবি।...যাই লিখুন না কেন, 'ডিটেল্‌স্‌'-এর ওপর জোর দিতেন নিশ্চয়।

নিশ্চয় পথের ধারে ওই যে শিশুটি ভুট্টার খই আর ধুলোর ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, এ তাঁর নজর এড়াত না। এছাড়া, নিশ্চয় তিনি ওই শালিকগুলোর কথাও লিখতেন, খইয়ের লোভে শিশুটির আশেপাশেই যারা জড়ো হয়েছে।

এদিকে খেয়ালই করিনি এতক্ষণ, দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে আকাশ-পাতাল, কখন যে পোখরা-বাজারে পৌঁছে গেছি।

বাজারে পৌঁছে পদম বাহাদুরের বাড়ি খুঁজে পেতে সময় লাগল না বিশেষ। কারণ, শাল-মহুয়ার ঝোপটির কথা আগে থেকেই মনে ছিল।

পদম-এর বাড়িটি দেখলাম দারিদ্র্যের ভারে-নুয়ে-পড়া।

অবাক হলাম দেখে। মিসেস জেইন টমাস আর জায়গা পেলেন না! এত জায়গা থাকতে শেষকালে এখানে!

সেদিন পদম-এর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এসব। এমন সময় কুলিগোছের একজন লোক অভ্যর্থনা করে, ওয়েল্‌কাম্‌ হিয়ার, স্যার! ওয়েলকাম্‌!

লোকটির অভ্যর্থনার বহর দেখে বীরগঞ্জের চুপ বাহাদুরের কথা মনে পড়ে যায় আমার। মনে হয়, পোশাক-আশাকে এদের মিল নেই বটে; কিন্তু অভ্যর্থনার ধরনটা হুবহু একই রকমের যেন।

ততক্ষণে নিজের পরিচয় নিজেই দিয়ে ফেলেছে লোকটি। ইংরেজী, হিন্দী এবং নেপালী মিলিয়ে যা বলেছে, তার বাংলা করলে মানে দাঁড়ায়, আমার নাম পদম বাহাদুর। মিসেস জেইন

টমাস এখানে দাঁড়াতে বলেছেন আমাকে ; তোমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে বলেছেন।

বললাম, আমাকে চিনলে কী করে ?

—চেহারায় আর পোশাকে। মিসেস টমাস আগেই বলে রেখেছিলেন সব।

—উনি আছেন বাড়িতে ?

—হ্যাঁ, আছেন। তোমার জন্মে অপেক্ষা করছেন।

—চলো। যাওয়া যাক তবে।

গেলাম। গিয়ে দেখি, অপরিচ্ছন্ন ও স্যাঁতসেঁতে এক ঘরে বসে মিসেস টমাস কী যেন লেখালেখি করছেন।

আমাকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, এই যে! এসে গেছেন দেখছি! ভালোই হল। আপনার সঙ্গে পরামর্শ আছে কিছু।

—পরামর্শ? কিসের পরামর্শ ?

ততক্ষণে একটি প্যাকিং বাক্সের ওপর বসেছি। আর মিসেস টমাসও কাগজ-কলম সরিয়ে রেখে আর একটি বাক্সের ওপর বসবার উদ্যোগ করছেন।

—বলছিলাম কী! মিসেস টমাস শুরু করেন আবার, মেয়েদের নিয়ে একটা অভিযান করলে কেমন হয় ? ধবলগিরি অভিযান ?

বললাম, ভালোই হয়। কিন্তু নেপাল-সরকার অনুমতি দেবেন কি ?

—দেবেন। শুনছি, এ-বছর থেকে অভিযাত্রীদের প্রতি আবার সদয় হচ্ছেন ওঁরা। এক্‌স্‌পিডিশন করতে দিচ্ছেন।

—কিন্তু দিলেও এ-এক্‌স্‌পিডিশনটা অন্যদের থেকে একটু আলাদা নয় কি? শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে ধবলগিরি জয় করা কঠিন নয় কি খুব ?

—কঠিন তো বটেই।… কিন্তু মেয়েরা তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? দূরের ডাকে সাড়া দেবে না?

—সাড়া দেবার ইচ্ছে সকলের মধ্যে কী আর থাকে। আর তাছাড়া, মিঃ টমাসের মতো দুর্ভাগ্যও তো সকলের হয় না।

দুর্বল জায়গায় ঘা পড়তেই মিসেস জেইন টমাস-এর চোখ-মুখ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। হঠাৎ কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি।

এদিকে জবাব ওঁর হয়ে পদম বাহাদুর যুগিয়ে দিল শেষ অবধি। বলল, কী জানেন! মিঃ টমাস জখম হয়েছিলেন যেখানটায়, ঠিক সে-জায়গাটার প্রতিই লোভ ওঁর। ধবলগিরির পথ ধরে যেতে যেতে উনি ওটা দেখতে চান।

—কিন্তু ও তো ভয়ানক দুর্গম জায়গা। শুধুমাত্র ওটা দেখার জন্যে এত বড় এক অভিযান।

মিসেস জেইন টমাস বাধা দেন এইখানে, না না; ঠিক তা নয়। ধবলগিরিকেও জয় করতে চাই আমি। দু'চার বছরের মধ্যেই এক্স্‌পিডিশন করতে চাই।

এবার মনে হল, মিসেস টমাস আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছেন সব। যেমন করে হোক, এক্স্‌পিডিশন উনি করবেনই। অতএব এ নিয়ে ওঁর সঙ্গে তর্ক চলে না।

তর্ক করলামও না শেষ অবধি। পদম বাহাদুরের কাছ থেকে শুনলাম, এই একটু আগেই হিসেব কষছিলেন উনি; এক্স্‌পিডিশনে কত খরচ পড়বে, কত লোক লাগবে, সেই সব হিসেব।

সেদিন আরও অনেক কথা হল মিসেস টমাস-এর সঙ্গে। কিন্তু এক্স্‌পিডিশন নিয়ে কেউ আর কিছু বললাম না।

মিঃ টমাস-এর সমাধি নিয়ে কথা উঠল একবার। শুনলাম, পদম বাহাদুরই নাকি ওটা দেখাশুনো করে।

ওদিকে সমাধির প্রসঙ্গে আসতেই মিসেস টমাস হঠাৎ অপ্রস্তুতে

ফেললেন আমায়। বললেন, দেখবেন নাকি? আজ বিকেলেও ওখানে যাবার কথা। বেশি দূরে নয় এখান থেকে; মাইল দু'য়েক মাত্র।

বললাম, আজ থাক।

—থাকবে কেন? আজ থাকলে কবে আর দেখবেন?

—কাল সকালে আমারও পোখরা ছাড়ার কথা। জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে হবে।

—ওঃ! ভারী তো গোছগাছ! কতক্ষণ আর সময় লাগবে ওতে!

—আমার অনেকক্ষণ লাগবে। কারণ, এখনও টিকিট কাটা হয়নি।

—বলেন কী! টিকিট কাটেন নি এখনও?

—না, কাটি নি। আপনার এখান থেকে ফিরে গিয়ে এজন্যে লাইন দেব।

—দিলেও পাবেন কী? যা ভিড়!

—পেয়ে যাব। হোটেলের একটি 'বয়'কে লাইনে দাঁড় করিয়ে এসেছি।

—দেখুন, যদি পান।

যাবার মুহূর্তে মেরী রুবেল-এর লেখা 'দি গড্স্ অব্ নেপাল' মিসেস জেইন টমাসকে দিতে গেলাম। বললাম, বইটা এ ক'দিন আমার কাছে ছিল। আপনারই বই। পোখরা আসার পথে এটা নিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখিত খুবই, নামবার সময় খেয়াল ছিল না দিতে।

মিসেস টমাস বললেন, খেয়াল না থাকায় ভালোই হয়েছে।... আপনাকে প্রেজেন্ট্ করা সম্ভব হয়েছে বইটা।

বললাম, প্রেজেন্ট্?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেজেন্ট্। এ-বই আপনার কাছেই থাক।

—কিন্তু কেন ?

—এটা পড়ে নেপালের গড এবং গডেসদের কাছে মিঃ টমাস-এর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করবেন। আর প্রার্থনা করবেন, আমার ধবলগিরি এক্‌স্‌পিডিশন যেন সাক্‌সেস্‌ফুল হয়।

এরপর আর কথা চলে না। বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসি মিসেস জেইন টমাস-এর ঘর থেকে। এয়ার-পোর্ট হয়ে, টিকিট কেটে অন্নপূর্ণা হোটেলে যখন ফিরি, সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে মহামৌনীর মতো দাঁড়িয়ে-থাকা ধবলগিরিকে ছুঁই ছুঁই করছে।

কিন্তু ছুঁলেও উপায় নেই কিছু। বেরোতেই হবে। অন্নপূর্ণা হোটেলের ম্যানেজার হঠাৎ এসে তাড়া দিলেন, জীপ রেডি। মহেন্দ্র গুম্ফা দেখবেন তো চলুন।

মহেন্দ্র গুম্ফা ? হঠাৎ মনে পড়ল আমার। হ্যাঁ, ঠিক। আজ বিকেলেই মহেন্দ্র-গুম্ফা দেখার কথা ছিল বটে। কয়েকজন ট্যুরিস্ট্‌এর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে গুম্ফা-দেখাবার ভারটা আমি ম্যানেজারের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

অগত্যা শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়েই ছুটতে হল আবার।

সেদিন মহেন্দ্র-গুম্ফা দেখে ঘরে ফিরেছি। সবে পোখরা এয়ার-পোর্ট থেকে সাত-সাত চৌদ্দ মাইলের 'রীতিমত একটি অভিযান' সেরে হোটেলে এসে বসেছি, এমন সময় আবার ওই শব্দটা শুনলাম। ওই মচ্‌ মচ্‌ করে গাছ-ভাঙার শব্দটা।

অথচ শুনবার কথা ছিল না। কারণ, আমি তন্ময় ছিলাম তখন। খানিক আগে দেখা মহেন্দ্র-গুম্ফার কথা একমনে ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম, গুম্ফার চারিপাশে ছড়ান অদ্ভুত ও বিচিত্র পাথর-গুলোর কথা ; ওই গুম্ফাকেই যে লোকে 'বাদুড়-বাড়ি' বলে, সে-কথা। আর গুম্ফার প্রতিবেশী কমলালেবুর বাগানগুলোর কথা।

কিন্তু সেই ভাবনার মাঝখানে হঠাৎ—

হঠাৎ সেই মচ্ মচ্ করে গাছ-ভাঙার শব্দটা কানে এলো।

কে? কে ওখানে? ধড়মড় করে উঠে বসি। নিজের অজান্তেই যেন ওই শব্দ তাক করে প্রশ্নটাকে ছুঁড়ে মারি।

এই কয়েকদিনে স্থির বিশ্বাস হয়েছিল আমার, কেউ ইচ্ছে করে ওই শব্দটা করছে। কিন্তু কে সে?

—কে? কে? বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসি।

বেরিয়ে দেখি, জ্যোৎস্নার বন্যা চারিদিকে; আর পোখরা ভাসছে সেই বন্যায়।

খানিকটা দূরেই মাচ্ছাপুছ্রেকে মনে হচ্ছে বিরাট এক মুকুটের মতো। মুকুটটা কয়েক লক্ষ টন রুপো নিলাম করে সবাইকে যেন টেক্কা দিচ্ছে।

কিন্তু আমাকে টেক্কা-দেনেওয়ালাটি কোথায়? থেকে থেকে ওই গাছ-ভাঙার শব্দটা কে করে?

অগত্যা অন্নপূর্ণা হোটেলের ম্যানেজারকেই ধরে বসলাম সেদিন।

ম্যানেজার ভদ্রলোক তিব্বতী। একমুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে চোখ পিট পিট করতে করতে এমন সুরে কথা বলেন, যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে, পামির মালভূমির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি; আর তাঁকে যিনি দেখছেন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন মালভূমি থেকে নিচে,—অনেক নিচে সমতল কোন ভূখণ্ডে। ম্যানেজারের কথাগুলো অনেক দূর থেকে ভেসে-আসা উত্তুরে হাওয়ার আর্তনাদ বলে মনে হবে তার।

আমার অন্তত সে-রকমই মনে হল। নেপালী, ইংরেজী ও হিন্দীর জগাখিচুরী ভাষায় সেদিন তিনি যখন কথা শুরু করলেন, তখন স্পষ্টই মনে হল আমার, পামির মালভূমি থেকে ভেসে-আসা উত্তুরে হাওয়ার আর্তনাদ শুনছি।

ম্যানেজার বললেন, শব্দ যে করে, তাকে আপনি চেনেন।

—চিনি ?

—হ্যাঁ, চেনেন।

—কে সে ?

—এই হোটেলেরই একটা 'বয়'।

—'বয়' ? কোন্ 'বয়' ? শের বাহাদুর ? যে আমাদের চা-জলখাবার দেয় ?

—হ্যাঁ, সে-ই বটে।

—কিন্তু তাকে তো এ নিয়ে একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ! সে বললে, 'ধাণ্ডা নামানা'।

—সবাইকে এইরকমই বলে সে। তবে শব্দটা আসলে তারই।

—কিন্তু এই শব্দ কেন করে সে ?

—করে খেয়ালবশে। যখন-তখন করে।

—আপনারা কেউ কিছু বলেন না ওকে ?

—বলি বৈকি ! খুব বলি। কিন্তু বললেই শুনছে কে ! ছেলেবেলা থেকে এই শব্দ যে ওকে পেয়ে বসেছে।···এইখানে একটু থামলেন ম্যানেজার। এবং তারপর পামির মালভূমিরই রহস্যময় কোন গুহায় বসে গল্প শুরু করলেন যেন, কী জানেন, একবার ঠিক এইরকম একটা শব্দ ওর জীবনটাকে একেবারে তছ্‌নছ্‌ করে দিল।

—তছ্‌নছ্‌ করে দিল ? ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনে আমি থ। বলেন কী ! শব্দ আবার জীবনকে তছ্‌নছ্‌ করে নাকি ? খানিকটা যেন বিদ্রূপের সুরেই বললাম কথাগুলো।

কিন্তু ম্যানেজার সেই বিদ্রূপ গায়ে মাখলেন বলে মনে হল না। বরং মনে হল, আগের কথারই রেশ টানলেন যেন। বললেন, হ্যাঁ, করে বৈকি ! শব্দের ক্ষমতাই কি কম ! এবং বিশেষ করে প্রলয়-সাক্ষী শব্দ !

ম্যানেজারের কথাগুলো আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। আমি তাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে। বিস্মিত

চাউনি দিয়েই যেন ওঁকে বোঝাতে চাইলাম, কী বলছেন এসব? কিছুই বুঝছি না তো?

ম্যানেজার শুরু করলেন আবার, প্রলয়—কত মহাপ্রলয় যে এই পাহাড়ীয়া হিমালয়ে হয়, আপনারা সমতলের লোকেরা তা কী করে বুঝবেন? প্রলয়-সাক্ষী বুনো শব্দকেই বা আপনারা চিনবেন কী করে?···শুনলে অবাক হবেন, এমন কি শের বাহাদুররা পর্যন্ত চিনতে পারে নি। এইখানে একটু থেমে আবার শুরু করলেন ম্যানেজার, হ্যাঁ, যা বলছিলাম; শের বাহাদুর। সে তার মা বাবা আর ভাইবোনকে নিয়ে সুখেই থাকত। তুকুছে নামে একটা জায়গায় থাকত। এই তুকুছে চুয়ান্ন মাইল এখান থেকে। আর মুক্তিনাথ থেকে মাত্র আঠার মাইল। দুর্গম পাহাড়ীয়া এলাকা ওই তুকুছে। তার আশেপাশেই উঠে গেল খাড়া পাহাড়।···একবার··· শীতের ঠিক শুরুতেই একবার—শের বাহাদুর যখন আট বছরের মাত্র, তখন একবার তুকুছেতে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল। দু' দিন দু' রাত্রি পেরিয়ে যায়। বৃষ্টি আর থামে না। ওদিকে তুকুছের ঠিক পাশেই জমোসোম-এ জমছে তুষার। প্রায় ন' দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়পুরীটা জমাট তুষারে ছেয়ে যাচ্ছে।···তৃতীয় দিনে জমোসোম-এর গা বেয়ে হিমানী-সম্প্রপাত নামতে শুরু করল। প্রচণ্ড গর্জনে থেকে থেকে কেঁপে উঠল তুকুছে।···কাঁপছিল তখন শের বাহাদুরও। ওর বাবাকে বলছিল, কী হবে!··বাবা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, হবে আবার কী! এমন তো প্রায় বছরই হয়! কিন্তু তুকুছের কিছু হয় কি ওতে?······ঠিক কথা, হয় না। কিন্তু সেবার হল। হঠাৎ মচ্ মচ্ শব্দ উঠল একটা। গাছপালা ভেঙে পড়বার সময় যেমন শব্দ ওঠে, ঠিক তেমন।···শের বাহাদুরের বাবা তখনও নিশ্চিন্ত। ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ও কিছু নয়। জমোসোম-এর গা বেয়ে ধস নামছে।···কিন্তু কথা শেষ হল না বেচারীর। তার আগেই শব্দটা আরও বেড়ে চলল। এবং বাড়বার মুখেই হঠাৎ···হঠাৎ

হুড়মুড় করে কয়েকটা গাছ এসে পড়ল শের বাহাদুরের মহল্লায়।··· আর পড়ল তো পড়লই। গোটা মহল্লাটাকে এক মুহূর্তে সমাধি দিয়ে দিল যেন।···সেই সমাধিভূমি থেকে শের বাহাদুর আর তার দাদা কী করে প্রাণ নিয়ে ফিরল, সে কাহিনী আমার কাছ থেকে আর না-ই বা শুনলেন।···শের বাহাদুরের দাদা অর্জুন বাহাদুর থাকে এখান থেকে ছত্রিশ মাইল মাত্র দূরে 'তাতোপানি'তে, অর্থাৎ, ওখানকার গরম জলের ঝরনার খুব কাছেই থাকে সে। যদি কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হয় তো জেনে নেবেন সে কাহিনীটা। ···কাহিনীর কিছু কিছু অবিশ্যি শের বাহাদুরের কাছ থেকেও জানতে পারেন। তবে অনেক কিছুই ওর আর মনে নেই এখন।

—কিন্তু আপনার তো দেখছি অনেক কিছুই মনে আছে! এত সব আপনি জানলেন কোত্থেকে? এতক্ষণে কথা বললাম আমি।

ম্যানেজার বললেন, আমি জানলাম অর্জুন-এর কাছ থেকে। অর্জুন আগে আমার কাছেই থাকত কিনা। থাকত আর মাঝে মাঝে দুঃখ করত, ভাইটা আমার কেমনতরো হয়ে গেল যেন। গাছ ভেঙে-পড়ার শব্দটা কিছুতেই আর ভুলতে পারল না।

ভুলতে যে পারল না শের বাহাদুর, পরদিনই সে-প্রমাণ আবার পেলাম।

পরদিন পোখরা ছেড়ে চলে আসার মুহূর্তে পেলাম প্রমাণ।

রয়্যাল নেপাল এয়ার-লাইন্‌স্‌-এর বিমানে উঠতে যাব; পদম বাহাদুরকে একটু আগে বিদায় দিয়েছি; বিশেষ কারণে মিসেস জেইন টমাস আজ যাচ্ছেন না, এই খবরটি পেয়েছি ওর কাছ থেকে; আর ওদিকে এয়ার-পোর্টের কুলিরা আমার মালপত্তরগুলো বিমানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে;···এমন সময় এগিয়ে গেলাম শের বাহাদুরের দিকে।··এ ক'দিন আমার জন্যে অনেক করেছে ও,

আজকেও এয়ার-পোর্ট অবধি আমাকে পৌঁছে দিয়েছে, এই ভেবে সামান্য কিছু বকশিশ্ ওর হাতে গুঁজে দিলাম।

বকশিশ্ পেয়ে ও এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। সেই মচ্ মচ্ করে গাছ-ভাঙার শব্দটা তুলে দ্রুত পালিয়ে গেল।

আমি স্পষ্ট শুনলাম, শব্দটা যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল ক্রমশ। এবং তারপর ক্রমেই যেন অদূরবর্তী গাঁয়ে মিশে গেল।

ওদিকে রয়্যাল নেপাল এয়ার-লাইন্স্ থেকে তাড়া আসছে, প্লেন ছাড়তে আর দেরি নেই। উঠে পড়।

উঠলাম। ধবলগিরি আর অন্নপূর্ণার দেশ, কালী বাহাদুর, মীন বাহাদুর আর শের বাহাদুরের দেশ পোখরা ছেড়ে এবার এগোলাম বুদ্ধ-জন্মতীর্থ লুম্বিনীর দিকে।

পনের

লুম্বিনীর পথে আনন্দনগর জংসনের স্টেশন-মাস্টার বললেন, ভালোই হল। এক বুদ্ধ চলল আর এক বুদ্ধ-দর্শনে।

বললাম, বুদ্ধ-দর্শন নয় ঠিক। বলুন যে, বুদ্ধ-জন্মতীর্থ-দর্শন।

—ওই হল! বললেন স্টেশন-মাস্টার, পাত্রাধার তৈল না হয়ে হল তৈলাধার পাত্র। আর তাছাড়া, জন্মতীর্থই কি সর্বতীর্থ-সার নয়?

কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম এই কথার জবাবে। হঠাৎ বাধা পড়ে। পয়েন্টস্‌ম্যান বা কুলি-গোছের একজন এসে সেলাম দেয় স্টেশন-মাস্টারকে, হুজৌর! তেরা নম্বর ডৌন গোর্খপুর পাসিন্‌জার আ রহা হৈ!

ডাউন গোরখপুর প্যাসেঞ্জার আসছে শুনে স্টেশন-মাস্টার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি এখুনি আসছি। আপনি দয়া করে একটু বসুন।

বসেই ছিলাম; এবং কারও প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া না দেখিয়েই আমাকে আরও বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে। কারণ, আনন্দনগর থেকে নৌগড় যাব আমি। আমার ট্রেন আসতে দেরি আছে। অতএব স্টেশন-মাস্টারের কথায় সায় দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, বসছি। আপনি বরং কাজ সেরে আসুন।

মাস্টারমশাই চলে গেলেন। আর আমি আনন্দনগর স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

আকাশ-পাতাল ছাড়া আর কী! বর্তমানকে ভুলে কেউ যদি অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে পড়ে তো তাকে এ ছাড়া কী আর বলব!

ঠিক সেই মুহূর্তে অতীতই ভিড় করছিল আমার সামনে। এবং

বিশেষ করে ভিড় করছিল নেপালের পোখরা থেকে উত্তর প্রদেশের এই সীমান্ত-শহর আনন্দনগরে আসার কিছু ছেঁড়া টুকরো কাহিনী।

পোখরা থেকে বেরিয়েছি গতকাল। সকাল আটটায় বেরিয়েছি।

ঠিক ছিল, সাড়ে আটটা নাগাদ পোখরা থেকে ষাট মাইল দূরে ভাইরওয়া বিমান-বন্দরে পৌঁছুব; এবং তারপর ভাইরওয়া থেকে যাব গৌতম-বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী-উদ্যানে। লুম্বিনী দেখে উত্তর প্রদেশের এক সীমান্ত-স্টেশন 'নৌতনুয়া' দিয়ে ভারতে ফিরবার কথা আমাদের।

লুম্বিনী জায়গাটা ভাইরওয়া থেকে বেশি দূরে নয়। সাত-আট মাইল মাত্র। রিকৃশা বা গোরুর-গাড়িতে নেপালের তরাই অঞ্চল ধরে ওখানে যেতে হয়।

কিন্তু ভাইরওয়া এসে শুনলাম, লুম্বিনীর পথ রুদ্ধ। রাস্তা জায়গায় জায়গায় ভাঙা। কিছুতেই ওখানে যাওয়া যাবে না।

যাবে না? এত কষ্ট করে এলাম এখানে! এত আশা নিয়ে এলাম! আর লুম্বিনী যাওয়া যাবে না? মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল।

অগত্যা ভাইরওয়া বিমান-বন্দরের টিকিট-কাউন্টারে বসে-থাকা এক নেপালী ভদ্রলোককে আমার সমস্যার কথাটা খুলে বললাম।

ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন, যেতে পারেন লুম্বিনী; তবে অনেকটা ঘুরে।

শুধালাম, ঘুরে কী রকম?

—প্রথমে এখান থেকে রিকৃসায় নৌতনুয়া যেতে হবে আপনাকে। তারপর নৌতনুয়া থেকে ট্রেনে যেতে হবে আনন্দ-নগর। আনন্দনগর থেকে নৌগড়-এর ট্রেন পাবেন আপনি। এবং নৌগড় থেকে পাবেন লুম্বিনীর বাস।

এতগুলো নাম একসঙ্গে শুনে বেশ একটু হকচকিয়ে গেলাম।

পকেট থেকে তাড়াতাড়ি নোট বইটা বের করে কলম হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোকটিকে বললাম, যদি কিছু মনে না করেন তো নামগুলো আর একবার···

ভদ্রলোক বলে গেলেন। আর আমি নোট নিয়ে নিলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু এত করে নোট নিয়েও আসল সমস্যার যদি সমাধান হ'ত!

ভাইরওয়া বিমান-বন্দরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটা রিক্সা যদি পাওয়া যেত!

এদিকে বেলা বাড়ছে ক্রমেই। রোদের তেজ বাড়ছে। বার বার মনে হচ্ছে; ঠিক একটি তেপান্তরের মাঠ যেন; এবং মাঠের ঠিক মাঝখানে যেন এই ভাইরওয়া বিমান-বন্দর।

ভাবছিলাম, যানবাহন যদি না পাই তো মালপত্তর ঘাড়ে করে এখান থেকে নড়াচড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এমন সময় ভাবনায় ছেদ পড়ে হঠাৎ। অনেকটা দূরে রিক্সার মতো কী যেন একটা চোখে পড়ে।

হ্যাঁ, রিক্সাই। আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে ওটা।

এগোলাম আমিও। বলতে গেলে, রিক্সাটিকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসব বলে ছুটলাম। কিন্তু ছোটাছুটিতে ফল দাঁড়াল উল্টো। রিক্সাওয়ালা এমন একটা ভাব দেখাল, যেন সে বহু পূর্বেই নির্বাণের স্তরে পৌঁছে গেছে এবং তার রিক্সা নামক ক্ষুদ্র বাহনটিও পৌঁছে গেছে সেই বিশেষ স্তরে, যেখানে কোন কিছু পৌঁছুলে মর্ত্যের ধূলিধূসরিত তুচ্ছ ও নগণ্য মানুষ তার নাগাল পায় না।

বুঝলাম, নাগাল পেতে হলে প্রণামীটা বড় রকমের দিতে হবে। আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝে ফেলেছে রিক্সাওয়ালা।

অগত্যা খুশি করতে হল তাকে। তারই চাহিদামাফিক ভাড়ায় নৌতন্থয়া যাবার ব্যবস্থা করতে হল।

চলেছি নৌতন্নুয়া। ভাইরওয়া বিমান-বন্দরকে পেছনে ফেলে এবড়ো-খেবড়ো একটা পথ ধরে চলেছি।

পথের দু'ধারে ধু ধু করছে মাঠ। শরৎ-সূর্য সে-মাঠে রাশি রাশি রূপো ঢালছে। থেকে থেকে ঝিকমিক করছে মাঠগুলো।

এদিকে খানিকদূর এগিয়েই রিক্সাওয়ালা গান ধরল,

ম্য ভুখেকো ছু
ম্য ঠাকেকো ছু।
ম্য খানা ছাহান্‌ছু
ম্য নেপালী রূপয়ে ছাহান্‌ছু।

বুঝলাম, আমার চালকটি বলতে চাইছে, আমি ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। খেতে চাইছি আমি। নেপালী টাকা চাইছি।

ভাবলাম, টাকা দেব বৈকি! নিশ্চয়ই দেব! এই দারুণ রোদ্দুরে খানাখন্দে-ভরা পথ ধরে রিক্সা চালাতে গিয়ে গান গাইবার শক্তি যে পায়, টাকা পাবার শক্তিও তার আছে বৈকি!

কিন্তু রিক্সাওয়ালার দেখলাম, নিজের শক্তির ওপর অবিচলিত আস্থা। সেই থেকে সে দরদর করে ঘামছে আর গাইছে,

ম্য ভুখেকো ছু
ম্য ঠাকেকো ছু।

এতক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি আমরা। দেখতে দেখতে ভাইরওয়া বিমান-বন্দরটিকে অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছি।

এইবার আমাদের পথের ডান-পাশে গোরুর-গাড়ি চোখে পড়ে মাঝে মাঝে। পণ্য-বোঝাই সব গাড়ি। রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওরা আসছে নৌতন্নুয়ার দিক থেকে।

—তা আসুক, বললাম আমি। কিন্তু ওরা পথ ছেড়ে পথের ধার দিয়ে ঝোপ-ঝাড় দলাই-মলাই করতে করতে আসছে কেন?

—ওরা আসছে, রিক্সাওয়ালা বুঝিয়ে দিল, ওতেই ওদের সুবিধে বলে।

—সুবিধে? রিক্সাওয়ালার ব্যাখ্যা শুনে আমি থ।

এদিকে তখনও নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে সে। বলছে, কী জানেন! বে-আইনীভাবে মাল পাচার করে ওরা। তাই ওরা এই সোজা রাস্তায় না গিয়ে বাঁকা পথ ধরে। রাস্তার গা-ঘেঁষে ঝোপ-ঝাড় আর ক্ষেত-খামারের ওপর দিয়ে এগোয়।

এতক্ষণে বুঝলাম। 'নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড্' ধরে এগোয় সব। নেপাল বা ভারত-সরকারের কেউ যাতে ওদের নাগাল না পায়, সুন্দরভাবে ওরা সে ব্যবস্থাটা করে।

অবিশ্যি ব্যবস্থায়ও গলদ দেখা দেয় এক এক সময়। ধরা পড়ে মাল-পাচারকারীরা মোটারকম ঘুষ বা জরিমানা দেয়।

আমরাই তো কতজনকে জরিমানা দিতে দেখলাম। নেপাল-সীমান্ত সগৌলীতে এসে দেখলাম, কাস্টম্‌স্ ডিপার্টমেন্ট্-এর লোকেরা বেশ কর্মতৎপর।

আমাদের দেখে অবিশ্যি তৎপর হল না কেউ। চেকিং-এর ব্যাপারে কেউ কোন আগ্রহও দেখাল না। রিক্সাওয়ালা তার বাহনটি থেকে নেমে ধুঁকতে লাগল শুধু।

ওর এই ধুঁকুনি, আমাদের এই প্রতীক্ষা কতক্ষণ চলেছিল, আজ আর তা মনে নেই। আজ মনে আছে শুধু অতি বিনয়ী এক পুলিশের কথা। সে আমাদের জিনিসপত্তর ভালো করে না দেখেই বলল, ঠিক হ্যায়! যাও!

গেলাম আমরা। নেপাল পেরিয়ে ভারতে ঢুকলাম।

ভারত-সীমান্তেও চেকিং প্রায় কিছুই হল না।

রিক্সাওয়ালা এতে খুব খুশি। সে বলল, বেশি চেকিং হলেই হ্যাঙ্গাম। সময় নষ্ট, আর পয়সা বরবাদ।

—কিন্তু পয়সা কিছু তো বরবাদ হলই। সগৌলীর পথ ধরে যেতে যেতে ভাবি, ভাইরওয়া থেকে লুম্বিনী সরাসরি যদি যেতে পারতাম তো শুধু পয়সা কেন, সময়ও বাঁচত অনেক। কষ্টও লাঘব হ'ত।

এদিকে রিক্‌সাওয়ালা ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ওর দিকে তাকাতে পারছি না আর। তাকাচ্ছি আশেপাশে, সগৌলীর দোকান-বাজারের দিকে।

বাজার-এলাকা সরগরম মনে হল বেশ। সগৌলী ছাড়িয়ে ভারতীয় এলাকা সনৌলীর যত ভেতরে ঢুকলাম, ততই যেন লোকজনের ভিড় বাড়তে লাগল।

ভিড় অবিশ্যি পথচারীদেরই নয় শুধু; গাড়ি-ঘোড়ারও বটে। রিক্‌সা, টাঙ্গা, বাস, ট্যাক্‌সি, সব কিছুরই ভিড়।

এই ভিড় ঠেলে নৌতন্থুয়া স্টেশনে পৌঁছুতে বেলা ১টা গড়িয়ে গেল।

নৌতন্থুয়া পৌঁছে শুনলাম, আনন্দনগরের ট্রেন আসতে দেরি আছে; বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

আবার অপেক্ষা! অপরিসীম ক্লান্তি আর বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল মনটা।

অগত্যা রেলওয়ে টাইম্ টেব্‌ল্ খুলে বসলাম।

টেব্‌ল্ খুলে দেখি, বিকেলের দিকে আনন্দনগরের একটা ট্রেন আছে; কিন্তু ওতে গিয়ে লাভ হবে না কিছু, নৌগড়ে যাবার 'করেস্‌পণ্ডিং' ট্রেন পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে নৌতন্থুয়া থেকে শেষ রাত্তিরে রওনা হওয়াই সুবিধে; ভোর হবার আগে আনন্দনগরে পৌঁছুন যাবে এবং ওখান থেকে নৌগড়ের ট্রেনও পাওয়া যাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর শেষের সময়-সূচীটাই সুবিধেজনক মনে হল আমাদের; এবং আমরা ওই শেষ রাত্তিরেই আনন্দনগর রওনা হলাম।

আনন্দনগর পৌঁছে দেখি, বিরাট জংসন-স্টেশনটা খাঁ খাঁ করছে। ট্রেন আসবার কথা ভুলে গিয়ে এই সাত-সকালে মধুর-মিষ্টি কোন স্বপ্ন দেখছে যেন সে।

ওদিকে আমাদের স্বপ্ন তখন উড়ে যাবার দাখিল। রাত-জাগার ধকলে তখন রীতিমত ক্লান্ত আমরা। তাই ঠিক হল, আনন্দনগরের ওয়েটিং-রুমে জিরিয়ে নেব খানিকক্ষণ এবং তারপর নতুন উদ্যমে আবার শুরু করব লুম্বিনী-যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন।

কিন্তু আয়োজন শুরু করার আগেই অযাচিতভাবে অভ্যর্থনা মিলল। রেল-অফিসারের পোশাক-পরা এক ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের ওপরেই নমস্কার জানালেন আমাদের। বললেন, মশাই বাঙালী না?

বললাম, হ্যাঁ।

—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—কলকাতা।

—যাবেন কোথায়?

—লুম্বিনী।

—খুব ভালো। আমার তো এ-মুল্লুকে সাত বছর থেকেও লুম্বিনী দেখা হল না!

—আপনি এখানে কাজ করেন বুঝি? রেলে কাজ করেন?

—হ্যাঁ মশাই, করি। আমি এখানকার স্টেশন-মাস্টার।

—তবে তো ভালোই হল। আপনার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া যাবে।

—তা নিতে পারেন। যত খুশি নিতে পারেন। পরামর্শ দিতেই তো আছি। তবে কি জানেন? একটু থেমে ভদ্রলোক শুরু করলেন আবার, বাঙালী দেখলে শুধু পরামর্শ দিতেই ইচ্ছে করে না; নিতেও ইচ্ছে করে।

বললাম, বেশ তো! নেবেন পরামর্শ।

এইভাবে দেখতে দেখতে আলাপ জমে উঠল ভদ্রলোকের সঙ্গে। শুনলাম, তাঁর দেশ চব্বিশ পরগণায়; নাম সুবীর মুখোপাধ্যায়। রেলের কাজে দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাংলাদেশের বাইরে আছেন।

আমাদের দেখে সুবীরবাবু আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন যেন। বার বার করে বললেন, বাঁচা গেল মশাই! বাঁচা গেল! এ মুল্লুকে ভূপিস্তে করেও একটা বাঙালী খুঁজে পাই না, যে, প্রাণ খুলে একটু সুখ-দুঃখের কথা কইব।

এদিকে খেয়ালই করিনি এতক্ষণ; কথা কইতে কইতে ওয়েটিং-রুমের একেবারে সামনে এসে পড়েছি।

খেয়াল হল সুবীরবাবুর কথায়। হঠাৎ উনি আমাদের আশ্বস্ত করে দিয়ে বললেন, এই যে, ওয়েটিং-রুম। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন এখানে। আমি একটু বাদেই আসছি।

মনে পড়ে, ঠিক এলেন তিনি। এসে আবার গল্প জুড়লেন।

অনেক অনেক সব গল্প······। আনন্দনগরে বাঙালী থাকে মাত্র তিন ঘর। মাছ পাওয়া যায় না। বড় কষ্ট।

কষ্টের কথা শুনে বললাম, মাঝে মাঝে দেশে এলেই পারেন!

—আসব কী মশাই! সুবীরবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন, দেশে তো শুনি আরও কষ্ট! এখানে তবু ছেলেপিলেরা দুধ-ঘিটুকু পায়।

শুধালাম, ছেলেরা পড়ে বুঝি?

—হ্যাঁ, পড়ে। এখানকার আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজে আমার দুই ছেলে পড়ে।···কী জানেন, এই স্টেসনের নামটাও ওই আনন্দরামেরই নামে। আগে এ স্টেশনের অন্য নাম ছিল।

মনে পড়ে, সেদিন এইরকম আরও অনেক কথা হয়েছিল স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে। কিন্তু সে-সব আজ আর মনে নেই।

আজ স্টেশন-মাস্টারের একটা কথা মনে পড়ে শুধু। মনে পড়ে, ডাউন গোরখপুর প্যাসেঞ্জার চলে যাবার খানিক বাদেই যখন তিনি ওয়েটিং-রুমে ফিরে এলেন, তখন আবার তাঁকে বলতে শুনেছিলাম, ভালোই হল। এক বুদ্ধ চলল আর এক বুদ্ধ-দর্শনে।

এই স্টেশন-মাস্টারটির আদর-আপ্যায়ণের কথা জীবনে ভুলব না।

নৌগড়ের ট্রেনে উঠিয়ে দেয়া অবধি উনি ছিলেন আমাদের সঙ্গে। এবং তারপর ট্রেন যখন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছিল, তখন ওঁর বিষণ্ণ ও পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার মনে হয়েছিল আমার, ওঁর সঙ্গে আলাপটা যেন তিন ঘণ্টার নয়, তিন বছরের।

কিন্তু বছর কেমন করে যে গড়িয়ে যায়! একজনের স্মৃতি কেমন করে যে চাপা পড়ে যায় অন্য একজনের স্মৃতির পলিমাটিতে।

নৌগড় যেতে না-যেতেই তো আনন্দনগরের স্টেশন-মাস্টারকে একরকম ভুলে গেলাম। নতুন এক সঙ্গী সুব্বা নগেন্দ্র মান শের চাঁদকে নিয়ে মেতে উঠলাম বলতে গেলে।

শের চাঁদ অবিশ্যি নিজের থেকেই আলাপ করেছিলেন আমাদের সঙ্গে। ট্রেনে আমাদের ঠিক উল্টোদিকের আসনটিতে বসে প্রশ্ন করেছিলেন, মালুম হোতে কি পোখরে সে আয়া আপলোক?

বললাম, হ্যাঁ; পোখরা থেকেই আসছি।

—ম্যয় ভি উধার সে আ রহা হুঁ। উধার এয়ার-পোর্ট মে আপকো দেখা হামলোক।

বললাম, তা দেখতে পারেন।

শের চাঁদ আবার শুধোলেন, কিধার যাওগী আপ? লুম্বিনী?

মাথা নেড়ে সংক্ষেপে সায় দিলাম, হুঁ।

—ম্যয় ভি উধার যা রহা হুঁ। মেরা ঘর হ্যায় লুম্বিনী কা নজদিক।

আবার মাথা নাড়ার পালা আমার। সংক্ষেপে জানিয়ে দেবার পালা, হুঁ!

কিন্তু শের চাঁদ অত সহজে ছাড়লেন না। নানান সব প্রশ্নে জর্জরিত করে তুললেন আমাকে, লুম্বিনীতে কেন যাবেন? কোথায়

উঠবেন? কতদিন থাকবেন?···ইত্যাদি ইত্যাদি। বললাম, যাব দেখতে। উঠব না কোথাও। থাকবও না। যেদিন যাব, সেদিনই ফিরে আসব।

—তা কী করে হয়! শের চাঁদ যা বললেন, তার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়, তা কী করে হয়! এত দূর থেকে এত কষ্ট করে আসছেন; আর দু' একদিন থাকবেন না?

বললাম, থাকবটা কোথায়? লুম্বিনীতে থাকবার তো ভালো জায়গা নেই!

শের চাঁদ বললেন, জায়গার ভারটা দয়া করে আমার ওপর ছেড়ে দিন। সব ঠিক করে দিচ্ছি।

অবাক হয়ে বললাম, আপনি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি; জানালেন শের চাঁদ, আমার বন্ধু থাকেন লুম্বিনীতে। এক ডাক্তার-বন্ধু। ওঁর ওখানে উঠবেন।

—কিন্তু ওঁকে যে চিনি না!

—চিনতে কতক্ষণ! আমি দেব চিনিয়ে।

রীতিমত সংকুচিত হলাম এবার। বললাম, কিন্তু আপনি কেন কষ্ট করবেন এত?

শের চাঁদ বললেন, কষ্ট আর কি! আজ বাড়ি না গিয়ে কাল যাব, এই তো!···তা একদিন না হয় লুম্বিনীতে থেকেই গেলাম আপনাদের জন্যে।

শের চাঁদের অভ্যর্থনায় বিস্মিত হলাম এইবার। কিছুতেই ভেবে পেলাম না, তাঁর এই অযাচিত প্রীতির কারণ কী?

এদিকে দেখতে দেখতে আরও একটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। ব্রিজমনগঞ্জ নামে ছোট্ট একটা স্টেশনে মিনিট খানেকের জন্যে দম নিয়ে আবার ছুটল গাড়ি।

শের চাঁদ খানিকক্ষণ কোন কথা বললেন না। সুটকেস খুলে জিনিসপত্র গোছগাছে মন দিলেন।

কিন্তু আমার মনটা কৌতূহলী হয়ে উঠল ভীষণ। শের চাঁদকে ঘিরে অসংখ্য প্রশ্নের বেড়াজাল বুনতে লাগল।

সহযাত্রীটি আমার মনের অবস্থা টের পেয়েছিলেন কিনা জানি না। হঠাৎ বলে বসলেন, কই! কিছু বললেন না তো? লুম্বিনীতে আমার ডাক্তার-বন্ধুর বাড়িতেই উঠছেন তাহলে?

ফস করে বলে ফেললাম, হ্যাঁ, উঠছি।

জবাব শুনে দারুণ খুশি ভদ্রলোক। বার বার করে উনি কথা দিলেন, লুম্বিনীতে সব কিছু নিজে সঙ্গে করে নিয়ে দেখাবেন।

আমি বিনয়ে গদগদ হয়ে বললাম, সে তো পরম সৌভাগ্য! আপনার মতো একজনের সাহায্য পেলে—

আমার কথা শেষ করতে দিলেন না শের চাঁদ। তার আগেই অন্য এক প্রশ্ন তুললেন, মুক্তিনাথ গিয়েছেন?

বললাম, না; যাইনি।

—সে কী! পোখরা গেলেন, সারা নেপাল ঘুরে বেড়ালেন, আর মুক্তিনাথ গেলেন না?

বললাম, যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হঠাৎ ধস নামায় যাওয়া হল না আর। পোখরার কুলি-কামিনদেরও কেউ সঙ্গে যেতে রাজী হল না।

শের চাঁদ সায় দিলেন আমার কথায়। বললেন, তা বটে! ধস নামলে ওদের রাজী করানো ভারী শক্ত। আর তাছাড়া, ধস কিছুদিন আগেই তো নেমেছিল। তখন আপনাদের বঙ্গাল দেশের দার্জিলিঙ্-জলপাইগুড়িরও ক্ষতি হয়েছিল খুব।

বললাম, আমাদের বাংলাদেশের কথা ছেড়ে দিন। দেশ-বিভাগের পর থেকে এই ১৯৬৮ সাল অবধি কোন দিক দিয়েই ক্ষতি ছাড়া লাভের সে মুখ দেখেনি।

শের চাঁদ বললেন, লাভ-ক্ষতি সব মায়া বাবুজী! সব মায়া! মুক্তিনাথ দেখলে বুঝতেন, সবই মায়া।

শুধালাম, আপনি দেখেছেন মুক্তিনাথ?

শের চাঁদ হো হো করে হেসে উঠলেন, দেখেছি মানে? ওই মুক্তিনাথেই আমার জন্ম। আমার বাবা মুক্তিনাথের শালগ্রাম-শিলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।... আর তাছাড়া, আমার ছেলেবেলাটা ওই শালগ্রাম কুড়িয়েই কাটে।

শুধালাম, শালগ্রাম কুড়িয়ে মানে?

—মানেটা মুক্তিনাথ গেলে বুঝতেন। যদি দেখতেন কালী-গণ্ডকীকে, তো সব কিছু মালুম হ'ত আপনার। এই অবধি বলে একটু থামলেন শের চাঁদ এবং তারপর আবার শুরু করলেন, কালী-গণ্ডকী এক অদ্ভুত নদী বাবুজী। মুক্তিনাথের গা-ঘেঁষে নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে সে এগিয়ে গেল।...তাঁর এগোবার পথটুকুর দু'পাশেই শালগ্রাম।...তবে হ্যাঁ, শালগ্রাম সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে দামোদর-কুণ্ডে।

—দামোদর-কুণ্ড কোথায় আবার? মুক্তিনাথের পথে? ক্রমশ রহস্যময় হয়ে-ওঠা শের চাঁদের দিকে তাকিয়ে শুধোই আমি।

শের চাঁদ বুঝিয়ে দেন, না না, পথে নয়। মুক্তিনাথ ছাড়িয়ে। মুক্তিনাথ থেকে দামোদর-কুণ্ডে যেতে চার দিন লাগে। হাঁটা-পথে দুর্গম পথ ধরে অনেকেই যায় ওখানে। যাবার সময় বিপজ্জনক দু'টি পাহাড়ীয়া নদী নরসিং-খোলা আর টঙ্‌খিয়া-খোলা অনেকেই পাড়ি দেয়।......দামোদর-কুণ্ড বড় পবিত্র জায়গা বাবুজী। বড় পবিত্র। চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে ঠিক এক স্বর্গ যেন।

—কিন্তু সেই স্বর্গে ছোটবেলায় যাননি নিশ্চয়? আমি রহস্য করে বলি।

—ঠিক ছোটবেলায় না গেলেও, জবাব দেন শের চাঁদ, খানিকটা বড় হয়ে গিয়েছি। একবার নয়, বহুবার গিয়েছি। বহুবার আমি দেখেছি, তুষারাচ্ছন্ন পর্বতে-ঘেরা আশ্চর্য সেই হ্রদটাকে। আর তাছাড়া, সে-হ্রদের তীর থেকে শালগ্রামও কুড়িয়েছি কত।

বললাম, শালগ্রাম মানে তো কালো-কুচকুচে অ্যামোনাইট্-ফসিল ?

—সে আপনারা যা খুশি তাই বলুন। আমাদের কাছে কিন্তু ওঁরা সাক্ষাৎ দেবতা। দেবাদিদেব মুক্তিনাথের অংশ ওঁরা।

—মুক্তিনাথে এখনও যান আপনি ?

—যাই বৈকি! এখনও বছরে অন্তত একবার ওখানকার বিষ্ণু-মন্দিরের সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে কিছুতেই আমার মন ভরে না।

—তবে হ্যাঁ, একটু থেমে আবার শুরু করলেন শের চাঁদ, এখন যেতে কষ্ট হয়। বয়স হল। আর পথটাও বড় দুর্গম। কী জানেন, পোখরা থেকে পায়ে হেঁটে মুক্তিনাথ যেতে আমাদেরও প্রায় পাঁচ-সাত দিন লাগে।

শুধালাম, পাঁচ-সাত দিন ? বলেন কী ?

—ঠিকই বলি ; জানালেন শের চাঁদ, জায়গাটা পোখরা থেকে প্রায় বাহাত্তর মাইল দূরে যে! আর তাছাড়া, অনেকটাই যে উঁচুতে! সাড়ে বারো হাজার ফুট প্রায়।

—শুধু উঁচু হলেও বা কথা ছিল। একটু দম নিয়ে আবার শুরু করেন শের চাঁদ, পথটার আগাগোড়াই চড়াই-উৎরাই। চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে এক একবার মনে হবে, ধবলগিরিকে ছাড়িয়ে গেলাম। আবার উৎরাই বেয়ে নামতে গিয়ে মনে হবে, পাতালে চললাম।···পথের শুরু অবিশ্যি চড়াই দিয়ে। পোখরা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই রদনগালা পর্বতশ্রেণীকে ডিঙোতে হবে আপনার। ডিঙিয়ে দেখবেন, সামনেই একেবারে ধবলগিরি ও দেওরালি ভঞ্জইয়াং পর্বত। এবার ধীরে ধীরে নেমে আসবেন আপনি ; কালী-গণ্ডকীর খাত অবধি আসবেন। এবং তারপর খুব সাবধানে এগোবেন বাগলুঙ্-এর দিকে। এই বাগলুঙ্ অঞ্চলটা ষোল মাইল মাত্র দূরে এখান থেকে। কিন্তু এই ষোল মাইল যেতেই দম আপনার ফুরিয়ে আসবে।···বাগলুঙ্ পৌঁছে অবিশ্যি

নিশ্চিন্তি। পথ চলে গেল নদীখাত বরাবর। ধবলগিরির গা-ঘেঁষে একেবেঁকে গেল সে। এবং শেষ অবধি সে আপনাকে পৌঁছে দিল কাগবেনী নদীর গিরিখাতে। এই গিরিখাত থেকে মুক্তিনাথ ছ' মাইল মাত্র।

শের চাঁদের কথার বহু অংশ এতক্ষণ ধরে 'নোট' করছিলাম। এইবার 'নোট' করার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। ওঁকে অনুরোধ করলাম, মুক্তিনাথের কথা কিছু বলুন।

—কথা দিয়ে কি তাঁকে বোঝানো যায় বাবুজী? শের চাঁদ শুরু করলেন, যে সাক্ষাৎ স্বর্গ, সে কি পৃথিবীর ভাষায় ধরা দেয়?

বললাম, ধরা হয়তো দেয় না; কিন্তু আভাসটুকু তো দেয়।

—না, দেয় না মালিক! শের চাঁদ প্রতিবাদ করেন, যদি বলি, রহস্যময় ওই হিমালয়ের তুষার-ঘেরা এক অলকাপুরী ওই মুক্তিনাথ, তো কতটুকু বুঝবেন আপনি? যদি বলি, মুক্তিনাথের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মুক্তিকামী বিশ্বলোকের দীর্ঘশ্বাস আমি শুনেছি, তবে আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন?

বললাম, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা নেহাৎই ব্যক্তিগত। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

শের চাঁদ সায় দিলেন, ঠিক! ঠিক বলেছেন। লাভ নেই। তার চেয়ে বরং মুক্তিনাথের মন্দির এবং বিগ্রহের কথা শুনুন।...... ওখানকার প্রধান মন্দিরটি আসলে ছোট এক প্যাগোডা; নেপালীরা সচরাচর যেমন মন্দির গড়ে, অনেকটা তেমন আর কি।...আর বিগ্রহ বলতে ওখানে বিষ্ণু ও 'জ্বাওলা মায়ী'।...মা জ্বলছেন কিনা অবিরাম; তাই 'জ্বাওলা'। তাঁর মন্দিরটির ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালে জলের ঠিক ওপরেই জ্বলতে দেখবেন তাঁকে।

• বললাম, জ্বলাটা আসলে ভূতাত্ত্বিক কোন কারণে। কোন গ্যাস-ট্যাস—

—না বাবুজী, না; আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন শের

চাঁদ, স্বয়ং মা জ্বলছেন ওখানে। জ্বলছেন ভক্তরাও। তাই না অত স্নানের ব্যবস্থা! ··কী জানেন, পুবদিকের পাহাড় বেয়ে নেমে এলো যে পবিত্র ঝরনাটা, তাকে খাল কেটে অতি যত্নে নিয়ে আসা হল মুক্তিনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে।···ঝরনার জল ওখানে ১০৮টা মুখ দিয়ে পড়ছে।···ভক্তরা গিয়ে স্নান করছে সেই জলে। আবার কখনও তা পান করে ধন্য হচ্ছে। ···মনে রাখবেন, মুক্তিনাথ হিন্দুদের কাছে যেমন, নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধদের কাছেও তেমনি বড় পবিত্র।······তিব্বতীরা একে বলে 'ছুমিক গ্যাসা'। ওরা মুক্তিনাথের খুব কাছেই দু'-দু'টি গুম্ফা গড়েছে এরই মধ্যে।

এদিকে কথা বলতে বলতে খেয়ালই করিনি এতক্ষণ; গাড়ি এসে উসকা-বাজার নামে এক স্টেশনে দাঁড়িয়েছে।

মুক্তিনাথের গল্পে ছেদ পড়ে এইবার। শের চাঁদ বলেন, আর কী! এসে গেলেন। এর পরের স্টেশনই নৌগড়।

দেখতে দেখতে নৌগড় পৌঁছুই আমরা। আনন্দনগর থেকে একত্রিশ কিলোমিটার মাত্র পথ। কিন্তু গাড়ি দিতে এক ঘন্টারও বেশি সময় লাগে।

নৌগড় স্টেশনকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল; বুদ্ধ-জন্মতীর্থে চলেছি, এই কথাটা মনে এলো প্রতি মুহূর্তে।

দেখলাম, স্টেশনটিকে বৌদ্ধ-বিহারের রূপ দেবার সাধু প্রয়াস। এছাড়া বুদ্ধমূর্তিও চোখে পড়ল ওখানে।

কিন্তু মূর্তি দেখবার সময় কই তখন! শের চাঁদ তখন ঘন ঘন তাড়া দিচ্ছেন, চলুন শীগ্‌গির! দেরি হলে লুম্বিনীর বাস মিলবে না। এই নৌগড়েই পড়ে থাকতে হবে আজকের মতো।

অগত্যা দ্রুত এগোলাম। শের চাঁদ সবাইকে পেছনে ফেলে ছুটলেন একরকম।

বাস-স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেখি, টিকিট কাটা হয়ে গেছে; আর শের চাঁদ দিগ্বিজয়ী বীরের মতো টিকিট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

আমার কাছ থেকে টিকিটের দামটা কিছুতেই নিলেন না উনি। বার বার বললেন, তা কী করে হয়!

এদিকে সন্দেহ ক্রমশই ঘিরে ধরছে। কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, সম্পূর্ণ অপরিচিতের প্রতি এ-লোকটির এত দরদের কারণ কী!

ওই কারণ নিয়েই কত কী যেন ভেবেছিলাম সেদিন। ভাবতে ভাবতে হয়তো বা অন্যমনস্কও হয়েছিলাম একটু।

চমক ভাঙে লোকটির কথায়, মালপত্তর খুব সাবধানে রাখবেন। সঙ্গে টাকা-পয়সা বেশি নেই তো!

এবার অবাক হয়ে তাকাই ওর দিকে। হ্যাঁ-না কিছুই বলি না। কিন্তু যত সময় যেতে থাকে, ততই সন্দেহের তুষার-গোলকটা মনের আনাচে-কানাচে গড়িয়ে গড়িয়ে স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। একবার মনে হয়, লোকটা চোর-ডাকাত নয় তো? ছলে-বলে-কৌশলে ভুলিয়ে সর্বস্ব ছিনিয়ে নেবার ফিকির খুঁজছে না তো?

—কে জানে, খুঁজলেও খুঁজতে পারে! চোর-ডাকাত হলেও হতে পারে! শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করি।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কিছু সিদ্ধান্ত, তিনি দেখলাম বেশ খোশ-মেজাজেই আছেন। বাস ছাড়তে দেরি দেখে কখনও বা স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন; আবার কখনও বা আমার কাছে এগিয়ে এসে গল্প জুড়ছেন।

একবার একটি বছর ষোল-সতেরোর ছেলেকে ডেকে নিয়ে বিড় বিড় করে কী যেন তিনি বললেন; এবং তারপর ছেলেটির হাতে একটা থলে গুঁজে দিলেন।

শুধালাম, কে ও?

—আমাদের গ্রামেরই একজন।

—কী বললেন ওকে?

—তেমন কিছু নয়। ওকে আমার বাড়িতে গিয়ে একটা

খবর দিতে বললাম আর কি! বলে দিলাম বলতে যে, আজ বাড়ি যাচ্ছি না। যেতে যেতে কাল বিকেল বা পরশু সকাল হবে।

—তা তো হবেই! আমি ভাবলাম, ডাকাতির বখরাটা সেরে ঘরে ফিরতে দেরি তো হবেই!

বলা বাহুল্য, সন্দেহের তুষার-গোলকটা এতক্ষণে অতিকায় হয়ে উঠেছে; এবং এতক্ষণে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, এই শের চাঁদের সঙ্গে কোনমতেই যাওয়া চলে না।

গেলামও না শেষ অবধি। শের চাঁদকে বললাম, দেখুন, ওই লুম্বিনীর বাড়িটা হাজার হোক আপনার বন্ধুর।

—বন্ধুর তো হয়েছে কী? অবাক হয়ে বললেন শের চাঁদ।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, উঠতে একটু অসুবিধে আর কি! আপনার নিজের বাড়ি হলেও বা কথা ছিল।

—বেশ। আমার বাড়িতেই চলুন তাহলে! শের চাঁদ নাছোড়-বান্দা।

—আপনার বাড়িতে? আমার সন্দিগ্ধ ভাবটা আর বোধ করি গোপন করা গেল না। ওদিকে শের চাঁদ শেষ চেষ্টা করছেন তখনও। অভয় দিয়ে বলছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ; আমার। লুম্বিনী থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে আমার বাড়ি। ওখানেই চলুন।

কিন্তু ততক্ষণে উল্টোদিকে চলতে শুরু করেছি। টিকিট-কাউন্টারে গিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি, কাল সকালের দিকে লুম্বিনী গেলে দুপুর দু'টো-তিনটে নাগাদ ফিরে আসা যাবে। আর আজ যদি যাই তো ফেরা যাবে না কিছুতেই। রাতটা লুম্বিনীতেই কাটাতে হবে।

অগত্যা সেদিন লুম্বিনী যাওয়া স্থগিত রেখে নৌগড় স্টেশনে ফিরে আসা ঠিক করলাম। কুলি ডেকে মালপত্তর উঠিয়ে দিলাম তার মাথায়।

শের চাঁদ পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। বার বার বললেন, এ কী করছেন? কী করছেন?···চলুন আমার সঙ্গে।

আমি এতক্ষণে প্রাথমিক জড়তার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছি। অতএব, বেশ জোর দিয়েই বলতে পারলাম এবার, না, তা হয় না।

—কিন্তু কেন হয় না? শের চাঁদ আমার মতিগতি দেখে স্তম্ভিত।

এবার আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরেন তিনি। বলেন, কেন যাবেন না আমার সঙ্গে? কেন? কেন?

আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দি, অসুবিধে আছে।

—আপনার দিক থেকে অসুবিধে? শের চাঁদের গলার স্বর রীতিমত থমথমে এবার। আমি বলি, হ্যাঁ, আমার দিক থেকেও।

এরপর আর কোন কথা চলে না; এবং বলা বাহুল্য, শের চাঁদও আর কোন অনুরোধ করেননি এরপর। আমার দিক থেকে অসুবিধে আছে শুনে শুধু বলেছিলেন, ওঃ!

শের চাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোলাম নৌগড় স্টেশনের দিকে। স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, 'রিটায়ারিং রুম্'-এ জায়গা আছে।

—তবু ভালো; মন্দের ভালো! নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দি। এবং শের চাঁদের মতো একটা ডাকাতের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছি ভেবে অদ্ভুত এক আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

কিন্তু তবু, বলতে কী, সে-রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়নি আমার। শের চাঁদ নামক একটি হিংস্র ডাকাতের দুঃস্বপ্ন বার বার আমার ঘুমকে তাড়া করেছে।

॥ ষোল ॥

পরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি, নতুন এক সুরে আকাশ-বাতাস ভরো ভরো। দেখি, আগের দিনের ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই দেহে। মনে নেই আগেকার বিক্ষোভ-বেদনার ভগ্নাংশ।

কিন্তু তবু মন জিনিসটা শরৎ-আকাশের মতো বুঝি। যত পরিচ্ছন্নই থাক, ভাবনার টুকরো মেঘেরা যখন-তখন ওখানে ঘুরে বেড়াবেই।

বুদ্ধ-জন্মতীর্থ লুম্বিনী যাবার মুহূর্তেও বিচিত্র সব ভাবনা ঘিরে ধরল আমাকে। ভোরবেলা নৌগড় রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে লুম্বিনীর গাড়িতে যখন গিয়ে বসলাম, তখন মন আমার আড়াই হাজার বছর আগেকার অদ্ভুত ও বিচিত্র এক জগতের শরিক। তখন বুদ্ধের সমসাময়িক যুগের কপিলাবস্তু আমার মনের আকাশে শরৎ-মেঘের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভাসমান।

হ্যাঁ, কপিলাবস্তু ছায়া ফেলে মনে। মহর্ষি কপিলের আবাস-ভূমির কথা মনে আসে। বড় সুন্দর সেই ভূমি। পাহাড় তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তার উন্নত প্রাসাদগুলো সেই সব পাহাড়কেও ছাড়িয়ে গেছে যেন।

দারিদ্র্য নেই সেখানে। লক্ষ্মী সেখানকার চির-সহচরী। সে-নগরীর ঘরে ঘরে রত্ন, পথে পথে তোরণ, মাঠে-ঘাটে ঐশ্বর্য।

মহাপ্রাজ্ঞ শুদ্ধোদন সেখানকার রাজা।

আসলে রাজা তো নন, রাজাধিরাজ তিনি। সূর্যবংশের সব গৌরবসূর্য তাঁরই মধ্যে স্তম্ভিত। তিনি সমুদ্রের মতো উদার, পর্বতের মতো বলিষ্ঠ, চন্দ্রকিরণের মতো স্নিগ্ধ।

তাঁর মহিষী মায়া দেবীকে প্রজারা বলে মা। বলে, সাক্ষাৎ ভক্তি তিনি; রাজগৃহে তিনি লক্ষ্মী। ধর্ম তাঁরই মধ্যে প্রমূর্ত।

তাই তো স্বর্গ থেকে বোধিসত্ত্ব এলেন তাঁর গর্ভে। পৃথিবীর দুঃখ দূর করবেন বলে এলেন।

এদিকে অন্তঃসত্ত্বা মায়া দেবী শুদ্ধোদনের কাছে প্রার্থনা জানান একদিন। বলেন, প্রভো! কাছেই আমার পিতৃগৃহ। দয়া করে যাবার অনুমতি দিন ওখানে। ভয় নেই, একা যাব না আমি। আমার সঙ্গে থাকবে অন্তঃপুরের বন্ধুজনেরা।

শুদ্ধোদন অনুমতি দেন, তথাস্তু!

এবার মায়া দেবী সদলবলে এগোন তাঁর পিতৃগৃহের দিকে। আকাশ-আলোর রাশি রাশি আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিয়ে এগোন। পিতৃগৃহের পথেই পড়ে লুম্বিনী-উপবন। রাজধানী কপিলাবস্তু থেকে পনর মাইল মাত্র দূরে পড়ে। মায়া দেবী এগোচ্ছেন আড়াই হাজার বছরেরও আগেকার একটি দিনে। আর আজ এগোচ্ছি আমরা। ওই এক ও অনির্বচনীয় লুম্বিনী-উপবনের দিকেই এগোচ্ছি।

একটু আগেই আমাদের গাড়ি ছেড়েছে। এখন লুম্বিনীর দিকে হু হু করে ছুটছে সে। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, এই ছোটাটা পথের দূরত্বকেই শুধু নয়, সময়ের দূরত্বকেও কমিয়ে আনছে; একাল-সেকালের মাঝখানে পড়ে যে আড়াই হাজার বছরের লম্বা সেতু, অতি দ্রুত তাকে টেনে-হিঁচড়ে খাটো করছে।

কিন্তু খাটো আমরা নিজেরাই হব না তো? যা ঝাঁকুনি বাসে, আমাদেরই হাড়-পাঁজরাগুলো গুঁড়ো হয়ে যাবে না তো? লুম্বিনী যেতে যেতে ভাবি।

যাচ্ছি ঝড়ের বেগে। নৌগড়ের ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়িগুলোকে পেছনে ফেলে বুদ্ধ-জন্মতীর্থের পথে ছুটছি।

দেখতে দেখতে নৌগড় পেরিয়ে আসি। সমতল পথ ধরে সোজা উত্তরদিকে এগোই। জায়গায় জায়গায় শাল আর মহুয়া-বন চোখে পড়ে। আবার কোথাও চোখে পড়ে দিগন্ত-জোড়া কৃষিক্ষেত্র।

শুনেছি, চাষবাস ভালোই হয় এদিকে। ভারতের এই তরাই অঞ্চলে নাকি সোনা ফলে।

কিন্তু কোথায় সোনা! গাড়ি এক জায়গায় এসে থামতেই হঠাৎ দেখি, সোনার চেয়েও দামী একপাল শিশু মরুভূমির রিক্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

শিশুরা হাত পেতে আছে সবাই। যাত্রীদের কাছে পয়সা চাইছে।

ওদিকে যাত্রীরা দারুণ বিরক্ত। একজন তো বলেই বসলেন, ফ্যাসাদ দেখছি! এখানটায় গাড়ি দাঁড়ালেই ছোটরা ছেকে ধরে। বলে, পয়সা দাও।··আরে বাপু, দেব কোত্থেকে? পাব কোথায় পয়সা?···তা তোরা পাঠশালায় পড়ছিস তো যা না ওখানেই। ভালো করে পড় গে না। বড় হয়ে পয়সা তোরা নিজেরাই কামাবি।

সহযাত্রীর কথা শুনে আমি অবাক।

—ওরা সব পাঠশালায় পড়ে? শুধোই ওকে।

—পড়ে কি মশাই! পড়ছে। ঐ তো, দেখুন না পাঠশালা। বলেই খানিকটা দূরে একটা আধ-ভাঙা দোচালা ঘর দেখিয়ে দেন উনি।

ঘরটির দিকে তাকাতে দেখি, প্রায় চারিদিক তার উন্মুক্ত, তার মেঝের ওপর কয়েকটা বেঞ্চ এলোমেলোভাবে ছড়ানো। আর মাস্টারমশাই সেই মেঝেরই একপ্রান্তে যেভাবে বসে, আমরা তাকে বলি ঝিমুনো।

ওদিকে পাশের যাত্রীটি থামেন নি তখনও। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলছেন, জানেন, ওই মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে ছেলেদের যোগ আছে। গাড়ি এসে দাঁড়ালেই ছেলেদের পাঠিয়ে দেন উনি; এবং তারপর ভিক্ষের বখরা আদায় করেন।

এবার আর কোন কথা সরল না আমার মুখ দিয়ে। বুদ্ধ-জন্মতীর্থের ঠিক সামনেই মনুষ্যত্বের এই চরম অপমান আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

একবার ভাবলাম, এর জন্যে দায়ী কে? ঐ মাস্টারমশাই? ছাত্ররা? না দেশের শিক্ষাব্যবস্থা?

আর একবার মনে হল, এ সেই ফাঁদ নয়তো, যেখানে সারা জগৎ জুড়ে গরীবদের ধরে ধরে ছুঁড়ে ফেলবার আয়োজন হচ্ছে; এবং যেখানে যেতে যেতে ওরা বলছে, একটা পয়সা।

—পয়সা। পয়সা। পয়সা। গাড়ি ছাড়বার পরেও চিৎকার করতে করতে অনেকে ছুটে এলো আমাদের পিছু পিছু। অনেকটা দূর অবধি এলো।

এবার পয়সা দিলেন অনেকেই। গাড়ির জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন।

—দিতেই হবে! বললেন পাশের যাত্রীটি, ছোটদের অমন করে ছুটতে দেখলে ক'জন আর ঠিক থাকতে পারে, বলুন?…এবং পারে না বলেই আসল পয়সা গাড়ি ছাড়বার পরেই ওরা পায়।

এদিকে দেখতে দেখতে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে আসি। গাড়ি এসে ভারত-নেপাল সীমান্ত রূপৈদিয়াতে দাঁড়ায়।

চেকিং-এর কড়াকড়ি এদিকে প্রায় কিছুই নেই। অতএব, বেশিক্ষণ দাঁড়াই না আমরা। ধমক খাওয়া দুষ্টু ছেলের মতো হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলি।

পথটা রিক্ত নিঃস্ব হয়ে দেখা দেয় এবার। তার এখানে-সেখানে ফাটল আর গর্তগুলো হাঁ-করে আমাদের যেন গিলতে আসে।

নেপালের বেশির ভাগ পথঘাটই ওই এক রকমের। যেখানে বিদেশী বন্ধুদের সহযোগিতার হাত পড়েছে, সেখানে তবু বরং ওরা

কাজ-চলা-গোছের ; কিন্তু হাত যেখানে পড়েনি, সেখানে ওদের অবস্থা সঙ্গীন।

বন্ধু ভারতের উচিত ছিল লুম্বিনী যাবার এই পথটুকু সুন্দরভাবে গড়ে দেওয়া।

দূরত্ব কতটুকু আর! নৌগড় থেকে লুম্বিনী একুশ মাইল তো মাত্র।

এদিকে ওই একুশ মাইল পথ পেরোতেই দারুণ মাথা ধরল। মনে হতে লাগল, কেউ যেন কপালের দু'পাশে হাতুড়ী পিটছে।

ঠিক করলাম, লুম্বিনী পৌঁছে কিছু একটা ওষুধ খেতে হবে ; সারিডন বা এনাসিন গোছের কিছু।

—কিন্তু কোথায় লুম্বিনী? মাথার ব্যথায় অস্থির হয়ে ভাবি, সামনেই ছাড়া ছাড়া কয়েকটা ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে। লুম্বিনী ওদের পেরিয়ে অনেকটা দূরে নিশ্চয়।

না, দূরে নয়; সামনেই হঠাৎ কে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বাসযাত্রীদের সবাইকে একসঙ্গে ব্যস্ত হতে দেখে স্পষ্টই মনে হল, সামনেই লুম্বিনী।

হ্যাঁ, এইবার পৌঁছে গেছি। খোদ লুম্বিনী এসেই গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

গাড়ির যাত্রীরা ভীষণ ব্যস্ত। কে কার আগে নামবে, তাই নিয়ে লেগেছে হুড়োহুড়ি।

নামবার সময় অনেকেরই পেছনে পড়ি। কিন্তু আশ্চর্য! লুম্বিনীর অভ্যর্থনা দেখলাম, বিশেষ করে আমাদেরই জন্যে বরাদ্দ।

শের চাঁদ জানালেন অভ্যর্থনা। গাড়ি থেকে নামতেই এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন।

অবাক হয়ে বললাম আপনি?

—হ্যাঁ, আমি। কাল আর বাড়ি যাইনি। এখানে বন্ধুর বাড়িতেই থাকলাম।

—থেকেছেন, বেশ করেছেন! ভালোই হল ওতে। আবার দেখা হল।

—কী মুশকিল! দেখা হবে বলেই তো দাঁড়িয়েছিলাম!

—কিন্তু আমার যে বিপদ। ভীষণ মাথা ধরেছে। আপনার ওই ডাক্তার-বন্ধুর কাছে নিয়ে চলুন একবার। ওষুধ চাই।

—বেশ তো! চলুন না! বলেই শের চাঁদ এগোলেন। আর আমি ওঁর পেছনে গাধা-বোটের মতো টলতে টলতে দুলতে দুলতে চললাম।

ডাক্তার-বন্ধুর আস্তানা খুব কাছেই। বাস-স্ট্যাণ্ড্ থেকে ওখানে পৌঁছুতে দু'মিনিটও লাগল না।

বন্ধু লোকটি খুব অমায়িক আর দিলদরিয়া। ওষুধ দিলেন, কিন্তু দাম নিলেন না; চা-সন্দেশ খাওয়ালেন; কিন্তু একবারও বললেন না, এই দুর্গম জায়গায় এত ভালো সন্দেশ এলো কোত্থেকে!

মনে পড়ে, ওই সন্দেশ নিয়েই কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তা আর হল না। তার আগেই বিরাট এক হাতী এসে সেলাম ঠুকল আমাদের। ডাক্তার-বন্ধুর দোকানের সামনেটাকে একেবারে জুড়ে নিয়ে সে দাঁড়াল।

—এই হাতী কার? শের চাঁদ ও ডাক্তার-বন্ধুকে শুধালাম একবার।

শের চাঁদ সবিনয়ে জানালেন, আমার। কী জানেন, এ হল তরাইয়ের জল-জঙ্গল এলাকা। হাতী ছাড়া এখানে চলাচলের বড় অসুবিধে।

ডাক্তার-বন্ধু বললেন, এতে চেপেই এখন ঘরে ফিরবেন উনি।

শের চাঁদের ঘরে-ফেরার কথা শুনে একটু যেন আহত হলাম। ভাবলাম, তাড়া কেন অত? লুম্বিনী দেখাবার কথা উনি কি তবে ভুলে গেলেন? না কি এরই মধ্যে টের পেয়ে গেলেন আমার সন্দেহের কথা? টের পেয়ে বিরক্ত হলেন?

কিছুই বোঝা গেল না। শের চাঁদ শুধু বললেন, আমাকে এখুনি যেতে হবে।

ভাবলাম, যেতে অন্যদেরও হবে। বেলা ক্রমেই বাড়ছে। অতএব, তাড়াতাড়ি লুম্বিনী দেখে নৌগড় ফিরতে হবে।

উঠে পড়লাম। শের চাঁদ হাতীর পিঠে চেপে পশ্চিম দিকে এগোলেন। আর আমরা এগোলাম লুম্বিনী-উদ্যান বরাবর উত্তর-পুব দিকে।

যাবার আগে ঠিকানা নিলেন শের চাঁদ। নিজের ঠিকানাও দিলেন। বার বার করে বললেন, আবার দেখা হবে!

—কে জানে। হয়তো হবে দেখা; হয়তো বা হবে না। ভাবতে ভাবতে পথ চলি। বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে-যাওয়া লুম্বিনীর শাখা-পথটা ধরে এগোই।

পথ নির্জন, থমথমে। সঙ্গে কয়েকজন বৌদ্ধ-ভিক্ষু রয়েছেন। থেকে থেকে উচ্চারণ করছেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

খানিকদূর যেতেই ঘরবাড়ি চোখে পড়ে একটা-দু'টো করে। মনে হয়, ওদের কোনটা বিহার, কোনটা মন্দির, আবার কোনটা বা রেস্ট্-হাউস্।

শুনেছি, রেস্ট্-হাউস্ নাকি নামমাত্র আছে এখানে। যা আছে, তা দিয়ে দূরের অতিথিদের নাকি স্থান-সংকুলান হয় না।

কিন্তু অতিথি কোথায়? দু'চার জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু ছাড়া আর তো কোন জনমানব দেখছি না! সারা লুম্বিনী-উদ্যানটিকে ব্যস্তবাগীশ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অদ্ভুত এক নিঝুমপুরী বলে মনে হচ্ছে।

বার বার মনে হচ্ছে, সময় বুঝি থেমে আছে এখানে। সেই আড়াই হাজার বছর আগেতেই থেমে আছে। বুঝি গৌতম-বুদ্ধের বাণী উদ্গীত হচ্ছে এখানে; সেই অমর বাণী—

"ওগো ভিক্ষুরা, তোমরা যাও। বহুর উন্নতির জন্যে যাও

তোমরা। বহুর কল্যাণের জন্যে যাও। সারা পৃথিবীর মুক্তির জন্যে তোমরা বেরিয়ে পড়ো। শান্তি, মৈত্রী ও করুণার বাণীকে প্রচার করো ভিক্ষুরা।

ওগো ভিক্ষুরা, তোমরা শুদ্ধ, পূর্ণ ও পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রচার করো।"

কিন্তু কোথায় সেই জীবন? সেই শুদ্ধ, পূর্ণ ও পবিত্র জীবনের আহ্বান আজ কোথায়? লুম্বিনী-উদ্যানের ছায়াপথ ধরে যেতে যেতে ভাবি। এবং ভাবতে ভাবতেই সেই শুদ্ধসত্ত্ব করুণাঘনের জন্মস্থানটিতে এসে দাঁড়াই। এক পুকুরের গা-ঘেঁষে জরাজীর্ণ এক বাড়িতে উঠে আসি। সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ফুট ওপরে উঠি সব। সামনের কুঠুরিটির দিকে তাকাই।

ওই কুঠুরিরই ভেতরে উৎকীর্ণ আছেন বুদ্ধ-জননী মায়া দেবী। শাল-গাছের একটি শাখা ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনেই দু'জন সখী, ঋষি একজন, আর একজন অদ্বিতীয় গৌতম-বুদ্ধ।

শিশু বুদ্ধ বাঁ-হাত তুলে দাঁড়িয়ে ওখানে। ঠিক জননীরই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

জননী মায়া দেবীকে বড় অপূর্ব দেখাচ্ছে। শাল-কাণ্ডের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে-থাকা তাঁর মূর্তিটিকে জীবন্ত মনে হচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সম্মিলন ওখানে; রাজরানীর অপরূপ রত্নালঙ্কারের ঠিক পাশেই ওখানে জননীর করুণাধারা উৎসারিত।

এই জননীর ছিল ভুবন-মোহিনী রূপ। এখান থেকে পনেরো মাইল মাত্র দূরের কপিলাবস্তু থেকে একদিন তিনি রূপতরঙ্গ ছড়িয়ে-ছিটিয়েই আসছিলেন। কিন্তু ঠিক এখানে এসেই হঠাৎ কী যে হল তাঁর, দু'টি শাল-গাছের নীচে কেন যে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন, সঙ্গী-সাথীদের কেউ তা ঠাওর করতে পারল না।

ঠাওর সবাই করল খানিকক্ষণ পরে, যখন বোধিসত্ত্বের আবির্ভাবে স্তম্ভিত হল সবাই।

অদ্ভুত সেই আবির্ভাব। জননীর প্রসব-বেদনা নেই, কষ্ট বা গ্লানি নেই এতটুকু ; অথচ সন্তান ঠিক ভূমিষ্ঠ হলেন। সূর্যপ্রতিম, দিব্যকান্তি, স্বর্ণোজ্জ্বল এক অপরূপ আবির্ভূত হলেন ঠিক।

তাঁর আবির্ভাবে মর্ত্য-অমর্ত্য জুড়ে আনন্দের এক মহাপ্লাবন শুরু হল। অমর্ত্যরাজ ইন্দ্র আনন্দিত হলেন। মন্দারপুষ্প আর পবিত্র দু'টি জলধারা নিক্ষেপ করলেন আকাশ থেকে। ওদিকে মাটির মানুষেরও আনন্দ আর বাঁধ মানে না। শ্রেষ্ঠ ভক্তরা বোধিসত্ত্বকে ব্যজন করতে ব্যস্ত। মন্দারপুষ্পের অর্ঘ্য দিয়ে সজ্ঞানে আবির্ভূত হওয়া সেই অপরূপকে বরণ করতে উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু তাঁকে বরণ করবে কে ? যিনি আপনার থেকেই এসেছেন পৃথিবীর দুঃখ-শোক দূর করতে, কে তাঁকে বরণ করবে ?

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কবি অশ্ব ঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিতে লিখছেন, তাই তো ! বরণ কে করবে ? তিনি যে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ; সকলের চোখকে তিনিই যে আবার তৃপ্তি দেন চন্দ্রের স্নিগ্ধতা নিয়ে। জন্মের পরেই চারিদিক আলোকিত করলেন তিনি। সাত পা এগিয়ে চারিদিক একবার নিরীক্ষণ করে বললেন,—আমি বোধির জন্যে এবং জগতের কল্যাণের জন্যে জন্মেছি। এই আমার শেষ জন্ম।

—ঠিক ঠিক ! এই শেষ জন্ম বোধিসত্ত্বের। সেদিনের সেই স্তব্ধ দুপুরে লুম্বিনীতে দাঁড়িয়ে ভাবি, এরপর থেকে আর তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। জাতক অন্তত এইরকমই বলে।

কিন্তু কোথায় জাতক, আর কোথায় অশ্ব ঘোষ ! একটু পরেই সব যেন একাকার হয়ে গেল। যেন সচন্দন পুষ্পবর্ষণহেতু অপরূপ এক সৌরভে আমোদিত হল চারিদিক। সূর্য আশীর্বাদ জানাল। বাতাস আনন্দ ছড়াল। আর সমাগত ভক্তদের কলকোলাহলে মুখরিত হল লুম্বিনী-উপবন।

ভক্তদের কোলাহল সেদিনও স্পষ্ট কানে আসছিল। ভিক্ষুরা বলছিল,—

দুতীয়ম্ পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি
দুতীয়ম্ পি ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি
দুতীয়ম্ পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি
তাতিয়ম্ পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি
তাতিয়ম্ পি ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি
তাতিয়ম্ পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি

অর্থাৎ, —

আবার আমি বুদ্ধের শরণ লই
আবার লই ধর্মের শরণ—
সঙ্ঘকেও আবার আমি শরণ করি
তৃতীয়বার বুদ্ধের শরণ লই আমি—
ধর্মের শরণ লই তৃতীয়বার।
সঙ্ঘকেও তৃতীয়বার আমি শরণ করি।

মনে পড়ে, সেই শরণ্যকেই দেখছি। মায়া দেবীর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে-থাকা শিশু গৌতম-বুদ্ধের অপরূপ মূর্তিটিকে দেখছি স্তব্ধ বিস্ময়ে।

আলোক বড় অল্প মায়া দেবীর মন্দিরে। সব আলোক বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে মা ও ছেলে যেন লীলার ছলে পাষাণ হয়ে আছেন ওখানে।

ওই পাষাণ-বিগ্রহের সামনে থেকে বেরিয়ে আসি এইবার। বিগ্রহ-সংলগ্ন চত্বরটির একপ্রান্তে এসে দাঁড়াই।

চত্বরের একদিকে আছে শালগাছ। গাছের তলায় ভাঙাচোরা মূর্তি আছে অনেকগুলো। কিন্তু মূর্তি তো নয়, ওই গাছটির দিকে তাকিয়েই অদ্ভুত সব কথা মনে আসে আমার। বার বার আমার মনে হয়, ওর সঙ্গে আড়াই হাজার বছর আগেকার আশ্চর্য কোন পুণ্যলগ্নের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই তো?

নেই বোধ করি সম্পর্ক; আজ ভাবি, সম্পর্ক নেই। কী

করে থাকবে ? কোন গাছ কি আড়াই হাজার বছর বাঁচে ?

আজ আরও যে কত কথা মনে আসে আমার, লুম্বিনীর কত সে ধূসর ছবি মনের ওপর ছায়া ফেলে।

লুম্বিনীর স্মৃতি ঝাপসা হয়ে উঠছে আজ। মায়া দেবীর মন্দির অনেকদিন আগে দেখা স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু স্বপ্নকে ভুলতে পারিনে যেন। এখনও যেন অস্পষ্ট মনে পড়ে, মন্দিরের গা-ঘেঁষেই পুকুর একটা।

মায়া-মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে আমরা সেই পুকুরের তীরে দাঁড়ালাম।

সেখানে টলটল করছে জল। মন্দিরের প্রতিবিম্ব সে-জলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শোনা যায়, একদিন আরও অনেক কিছু স্পষ্ট হ'ত সেখানে। গৌতম-বুদ্ধেরও প্রতিবিম্ব সেখানে দেখা যেত।

শিশু বোধিসত্ত্ব নিয়মিত আসতেন সে-পুকুরে। স্নান করতেন। জলকেলি করতেন। আর আসতেন বুদ্ধ-জননী মায়া দেবী।

লোকে বলে, জননী হবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেও এই পুকুরেই স্নান করেন তিনি। দিব্যকান্তি সিদ্ধার্থের আবির্ভাবলগ্ন সমাগত বুঝে এইখানেই তিনি অঙ্গ-প্রক্ষালন করেন।

এ-পুকুর নিয়ে আরও অনেক কথা শোনা যায় আজ। এমনও শোনা যায়, এ নাকি মজে যাচ্ছিল ক্রমেই। ক্রমেই অবলুপ্ত হচ্ছিল। তাই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার হল এর। বলতে গেলে একে নবজন্ম দেয়া হল।

কিন্তু নবজন্ম কি লুম্বিনীকেও দেয়া হয় নি ? লোকে তো ভুলে যাচ্ছিল এর কথা! বুদ্ধ-জন্মতীর্থটি ঠিক কোন্ জায়গায়, তা নিয়ে সকলের মনেই তো সংশয় জাগছিল।

সে-সংশয় দূর করলেন ডঃ ফুহরের। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে ঘুরতে ঘুরতে এই লুম্বিনীতে এসে থমকে

দাঁড়ালেন তিনি। এবং তিনিই হঠাৎ আবিষ্কার করলেন এখানকার অশোক-স্তম্ভটির তাৎপর্য।

পুকুর থেকে খুব একটা দূরে নয় ওই স্তম্ভ। কয়েক গজ মাত্র এগিয়েই ওকে দেখলাম। মিনিট ছ'য়েকের মধ্যেই ভুবনবিখ্যাত স্তম্ভটির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

এতক্ষণে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরাও এসে গেছেন। স্তম্ভটিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন সব। ওঁদের কারও মুখে কোন কথা নেই এখন। সবাই এখন স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পড়তে ব্যস্ত।

কিন্তু লিপি পড়তে অসুবিধে খুব। শত আগ্রহ থাকলেও সামনে যাবার উপায় নেই। স্তম্ভটিকে ঘিরে লোহার 'রেলিং'।

দেখলাম, বর্গাকার ওই 'রেলিং' ধরেই ঝুঁকে পড়েছেন ভিক্ষুরা। শিলালিপি পড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

বলতে দ্বিধা নেই, চেষ্টার ত্রুটি অবিশ্যি আমার দিক থেকেও হয় নি। ওই ধূসর ও অস্পষ্ট শিলালিপির দিকে আমিও তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু তখন পাঠোদ্ধার করতে পারি নি তার। করেছি পরে। পরে জেনেছি, ওখানে যা লেখা আছে, তার বাংলা অর্থ এইরকম দাঁড়ায়,—

(ক) রাজা দেবনামপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা হবার কুড়ি বছর পরে এখানে এসে আরাধনা করেছিলেন। কারণ, এখানেই জন্মগ্রহণ করেন শাক্যমুনি বুদ্ধ।

(খ) প্রিয়দর্শী অশ্বমূর্তি শোভিত একটি শিলা (?) স্থাপন করেন এখানে। আর স্থাপন করেন একটি শিলাস্তম্ভ। ভগবান শাক্যমুনি যে এখানেই জন্মগ্রহণ করেন তা বোঝান ছিল প্রিয়দর্শীর উদ্দেশ্য।

সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলতে হবে। কারণ, সম্রাট অশোক এখানে যে একদিন তীর্থ করতে এসেছিলেন এবং এখানেই যে একদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন গৌতম-বুদ্ধ, দীর্ঘদিন পরে হলেও পৃথিবীর মানুষ আজ তা জানতে পেরেছে।

শোনা যায়, খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই শো বছর পূর্বে অশোক আসেন এখানে এবং গৌতম-বুদ্ধ এখানে জন্মগ্রহণ করেন খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে।

অর্থাৎ, প্রায় আড়াইটা হাজার বছর ধরে বুদ্ধ-স্মৃতিকে বহন করছে এ-পুরী। আর এ-স্তম্ভটি বহন করছে বাইশ শতাব্দীরও বেশি দিনের স্মৃতি।

মনে পড়ে, বহুস্মৃতি বিজড়িত স্তম্ভকে অবাক বিস্ময়ে দেখি সেদিন। গোলাকার, প্রায় দশ-পনেরো ফুট উঁচু পাষাণ-প্রহরীটিকে বার বার নিরীক্ষণ করি।

ওদিকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা চলতে শুরু করেছেন এবার। মায়া দেবীর মন্দিরকে পাশে রেখে ওঁরা চলেছেন লুম্বিনী-উদ্যানের অন্য দিকে।

চললাম ওঁদের পিছু পিছু।

খানিকদূর এগিয়েই নতুন-গড়া একটি বুদ্ধ-মন্দির চোখে পড়ল। বেশ বড় গোছের মন্দির। ঝকঝকে তকতকে।

মন্দিরটির ভেতরে ঢুকে গৌতম-বুদ্ধকে খুঁজে পেলাম। তাঁর সমগ্র জীবনটাকে পেলাম যেন। মন্দির-দেয়ালের ফ্রেস্‌কোতে দেখলাম, বুদ্ধের জীবনের বিচিত্র ঘটনা।

দেখলাম, বুদ্ধের সাধনা ও সিদ্ধি, শৈশব ও যৌবন আলোক ছড়াচ্ছে ওখানে। তাঁর লোকোত্তর চরিত্রকে ছায়াছবির মতো স্পষ্ট করে তুলছে।

সেই ছবি একদিকে, আর অপরদিকে বুদ্ধ-চরিত সম্পর্কে জানা এবং শোনা নানা কাহিনী আমাকে যেন আড়াই হাজার বছর আগেকার অদ্ভুত-আশ্চর্য এক যুগে পৌঁছে দিল। যেন স্পষ্ট মনে হল আমার,—

আজকের নেপালের তৌলীহাওয়া শহর যেখানে, ঠিক সেখানেই একদিন ছিল কপিলাবস্তু। এই লুম্বিনী থেকে পনের মাইল মাত্র দূরে ছিল।

কপিলাবস্তুতে সুখে দিন কাটে সিদ্ধার্থের। রাজধানীর সকলের

আদরে-সোহাগে শৈশব তাঁর রঙে-রসে ভরে ওঠে। সম্রাট শুদ্ধোদনের চোখের মণি তিনি। কোন দিক দিয়েই তাঁর এতটুকু কষ্ট হবার জো নেই।

কিন্তু তবু শৈশবেই কষ্ট এক এক সময় যেন তাঁকে পেয়ে বসে। পার্থিব সুখে মন ভরে না তাঁর। রাজৈশ্বর্য তাঁকে খুশি করে না।

এই যখন তাঁর মনের অবস্থা, তখন বাহুযুদ্ধের ডাক আসে হঠাৎ। ষোল-বছরের সিদ্ধার্থ সে ডাকে সাড়া দেন। যশোধারাকে বলতে গেলে জয় করে আনেন তিনি।

রূপসী যশোধারা। সিদ্ধার্থের তিনি হন বধূ।

কপিলাবস্তুতে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। নববধূকে পেয়ে উৎসবে মাতে রাজধানী।

—কিন্তু রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এত উন্মনা কেন? সব কিছুর মধ্যে থেকেও তিনি নেই কেন? সকলের মুখে একই প্রশ্ন।

সিদ্ধার্থ কী যেন ভাবেন থেকে থেকে। ভরা উৎসবের মধ্যে বসেও কিসের যেন স্বপ্ন দেখেন।

এই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পা দেন সিদ্ধার্থ। লাভ করেন রাহুল নামে অপরূপ এক পুত্রসন্তান।

কিন্তু শুধু নিজের লাভে কি আর মন ভরে! সারা পৃথিবী রয়েছে না! লাভের চেয়ে ক্ষতিরই যে ওখানে প্রাধান্য। ওখানে সুখের চেয়ে প্রাধান্য দুঃখের।

ওদিকে পিতা শুদ্ধোদনের কত চেষ্টা! পুত্র সিদ্ধার্থের কাছ থেকে পার্থিব দুঃখকে সরিয়ে রাখবার জন্যে কত তাঁর আয়োজন!

কিন্তু সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায় একদিন। বালির বাঁধের মতো শুদ্ধোদনের চেষ্টা ভেঙে পড়ে।

বাঁধ ভাঙেন রাজপুত্র স্বয়ং। একদিন রাজপ্রাসাদ থেকে রথে করে যেতে যেতে পৃথিবীর আসল চেহারাটা তাঁর সামনে ভেসে ওঠে।

সিদ্ধার্থ প্রথমে দেখেন বৃদ্ধ একজনকে। দেখেন, ধুঁকতে ধুঁকতে পথ চলেছে হতভাগ্য।

—কে উনি? কেন অমন হল তাঁর? সিদ্ধার্থ শুধোন সারথিকে।

সারথি বলেন, উনি জরাগ্রস্ত এক পথিক। ওঁর অবস্থায় সকলকেই পড়তে হবে একদিন।

—সকলকেই? সিদ্ধার্থ স্তম্ভিত।

সারথি বুঝিয়ে দেন, হ্যাঁ যুবরাজ! সকলকেই। জীবের ধর্মই তো হল এই! জরা থেকে যে কোনক্রমেই মুক্তি নেই তার!

—মুক্তি নেই? কিছুতেই মুক্তি নেই? সিদ্ধার্থ হাহাকার করে ওঠেন; এবং ঠিক পরক্ষণেই তাঁর চোখে পড়ে রোগগ্রস্ত এক মুমূর্ষু।

—কে উনি? এত কষ্ট কেন ওঁর? মুমূর্ষুকে দেখে কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন যুবরাজ।

সারথি জবাব দেন, প্রভো! উনি রুগ্ন। মৃত্যুপথযাত্রী উনি! ওঁর মতো অবস্থায় সকলকেই পড়তে হয়।

—সকলের এত দুঃখ তবে? এত কষ্ট? সিদ্ধার্থ এইবার যেন কান্নায় ভেঙে পড়েন।

সারথি সান্ত্বনা দেন ওদিকে, এ তো জীবনের বিধিলিপি প্রভু! রোগশোক তাকে সহ্য করতেই হবে। এ নিয়ে দুঃখ করে আর লাভ কী!

—লাভ নেই? দুঃখ থেকে তবে পরিত্রাণ নেই জীবের? সিদ্ধার্থ শুধোন।

সারথি বুঝিয়ে দেন, না যুবরাজ, নেই। ঐ যে! দেখুন না!

সিদ্ধার্থ এইবার দেখেন, মৃতদেহ একটি। দেখেন, কয়েকজন মিলে সে-দেহটিকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

—কেন এমন হল? সিদ্ধার্থ আকুল হয়ে শুধোন সারথিকে।

সারথি জবাব দেন, এমন তো হবেই প্রভু! পার্থিব সকল জীবেরই এমন হবে। জীব যে জরা, রোগ আর মৃত্যুর অধীন!

—কিন্তু এই সমস্ত অধীনতার মূলে কী? সিদ্ধার্থ আপন মনেই প্রশ্ন করেন এইবার। এবং প্রশ্নের জবাবটাও পেয়ে যান মনে মনেই।

মন বলে, অধীনতার মূলে জন্ম। জীব জন্মের অধীন বলেই জরা, রোগ আর মৃত্যুর অধীন।

জন্ম আর মৃত্যু। মৃত্যু আর জন্ম। দেখতে দেখতে এই জন্ম-মৃত্যুর ভাবনা সিদ্ধার্থকে সেদিন যেন পেয়ে বসে। তাঁর চোখের সামনে ক্রমেই যেন আঁধার হয়ে আসে পৃথিবী।

কিন্তু সে-আঁধার অচিরস্থায়ী বুঝি। মূর্তিমান আলোকের স্পর্শে বিদীর্ণ হবে বলেই বুঝি তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল।

হ্যাঁ, আঁধার বিদীর্ণ হল ঠিক। মুণ্ডিত-মস্তক গৈরিক বসন-পরিহিত এক সন্ন্যাসী আলোক হয়ে দেখা দিলেন।

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীকে দেখে স্তম্ভিত,

—কে ইনি? সারথিকে শুধোন।

সারথি বলেন, ইনি সংসারবিরক্ত এক সন্ন্যাসী। ঘর নেই এঁর, আশ্রয় নেই। সব কিছু ত্যাগ করে ইনি পথিক।

কিন্তু পথ কোথায়? মুক্তির পথ? সিদ্ধার্থ নিজেকেই প্রশ্ন করেন যেন। সেদিন ঘরে ফিরেও সহস্রবার এই একই প্রশ্নের জবাব খোঁজেন।

ওদিকে রাত গভীর হয়ে আসে দেখতে দেখতে। শাক্যরাজের প্রাসাদপুরী থমথম করে। প্রহরীরা ঝিমোয়। অন্তঃপুরে ঘুম নামে।

গাঢ় গভীর ঘুম। রাজ-অনুচরীদের হুঁস নেই আদৌ। ওদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া অন্তঃপুরে আর কোন শব্দ নেই।

কিন্তু ওরা অমন করে এলিয়ে কেন? ভরা-যৌবনকে কেন ওরা

পদ্মের পাপড়ির মতো মেলে ধরে? কী চায় ওরা? যুবরাজকে খুশি করতে? তৃপ্তি দিতে?

কিন্তু যুবরাজ যে অতৃপ্ত। তাঁর পদপ্রান্তে অর্ঘ্য হয়ে লুটিয়ে-থাকা অপরূপা যুবতীরা আর যে তাঁকে খুশি করতে পারছে না। বিবসনা মোহিনীরা আর সে মোহাবেশ জাগাচ্ছে না তাঁর!

তিনি কামনা-বাসনার উর্ধ্বে এখন; ইন্দ্রিয় সুখের এখন তিনি বাইরে। ভোগ-লালসা এখন তাঁর কাছে পদ্মপত্রে নীর, রূপসীর দেহলতা এখন আলেয়া। এখন উন্নত-উদ্বেল স্তন-মন্থন নয়, উষ্ণ-কোমল অধর-দংশন নয়, অধীর-অস্থির আলিঙ্গনও নয়; সিদ্ধার্থ এখন সত্যের সন্ধানে।

এখন আলুলায়িতকেশা, বিবসনা রসরঙ্গিণীদের সামনে দাঁড়িয়েও তাঁর একটিই প্রশ্ন, পথ কোথায়? মুক্তির পথ?

নিজের মুক্তি নয় শুধু, নিখিল বিশ্বের মুক্তি খোঁজেন সিদ্ধার্থ। জরা-দুঃখ-কবলিত সকল বিশ্ববাসীর পরিত্রাণের কথা ভাবেন।

কিন্তু পরিত্রাণ আসবে কী করে? দুঃখী জীব কী করে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হবে? জীব যে জন্মের অধীন!

—হ্যাঁ, যথার্থই অধীন সে; সিদ্ধার্থ ভাবেন, এবং এই অধীনতা থেকে যেমন করে হোক তাকে মুক্তি দিতে হবে। জন্মের শৃঙ্খল থেকে উদ্ধার করতেই হবে তাকে।

—কিন্তু পথ কোথায়? উদ্ধারের পথ? আড়াই হাজার বছর আগেকার এক নিশুতি রাতে একা পথ তল্লাশ করেন সিদ্ধার্থ।

স্ত্রী যশোধারা নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন। শিশুপুত্র রাহুল তখন অচেতন।

সিদ্ধার্থ অতি সন্তর্পণে আসেন ওঁদের কাছে। বিদায় নেন। চিরবিদায়। এবং তারপরেই নতুন জীবন শুরু হয় তাঁর। মুক্তির সন্ধানে শুরু হয় তাঁর মহা-অভিসার।

অতি ধীরে ধীরে প্রাসাদের বাইরে আসেন তিনি। সারথিকে ডাকেন।

সারথি ছন্ন স্তম্ভিত।

—এত রাত্রে কোথায় যেতে হবে প্রভো? যুবরাজকে শুধোন তিনি।

যুবরাজ আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যান। শুধু বলেন, কথক কোথায়? ভৈরব-ভীষণ সেই অশ্বটিকে কেন দেখছি না?

—সে যথাস্থানে আছে। বিশ্রাম নিচ্ছে সে; ছন্ন জানান।

সিদ্ধার্থ স্পষ্ট নির্দেশ দেন এইবার, ওকে নিয়ে এসো। রথ প্রস্তুত কর। বাইরে যাব।

ছন্ন এবার আর কোন জবাব দেন না। যুবরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য করে চলে যান। যুবরাজ সিদ্ধার্থ সেই নিঝুম প্রাসাদ-পুরীতে একা দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ; এবং তারপর রথ এলেই গাঢ়-কৃষ্ণ অন্ধকারের বুক চিরে অভিসার শুরু করেন।

সম্পূর্ণ নতুন এক পথে এই অভিসার। সত্যের সন্ধানে বিপদসংকুল ও ভয়াবহ এক পথে এই তাঁর যাত্রা-শুরু।

শুরুতে রাজবেশে পথ চলেন তিনি। তাঁর রত্নালঙ্কার পথে পথে আলোক ছড়ায়। আর রত্নাধিক অশ্ব কথক ছড়ায় আর্তনাদ।

ওদিকে দেখতে দেখতে নগর পেরিয়ে, প্রান্তর ছাড়িয়ে গহন-গভীর এক অরণ্যের মুখোমুখি হন সিদ্ধার্থ। রথ থেকে নেমে তরবারি কোষমুক্ত করেন। মুণ্ডন করেন মস্তক। সারথিকে বলেন, তুমি যাও। পরিত্যক্ত এই দীর্ঘ-কৃষ্ণ কেশ নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাও তুমি।

সারথি ফেরেন। 'তথাস্তু' বলে বিস্মিত, শ্রান্ত ও বিষণ্ণ মন নিয়ে কপিলাবস্তুর দিকে রওনা হন। সিদ্ধার্থ অরণ্যপথিক তখন। শ্বাপদ-সমাকুল অরণ্যের কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে একা অগ্রসরমান।

কিন্তু পথের পাশেই কে ও? জীর্ণ-শীর্ণ বসন পরে ও কে

দাঁড়িয়ে? সিদ্ধার্থ এগিয়ে গিয়ে দেখেন, এক ভিক্ষুক। ভাবেন, হায় রে! কে রাজা, আর কে ভিক্ষুক এই সংসারে! বসনের হেরফেরটুকু ঘুচিয়ে দিলেই তো সব এখানে এক!

তথাগত বসন বদল করেন এইবার। ভিক্ষুককে রাজবেশ পরিয়ে নিজে ভিক্ষুক সাজেন।

এইবার পথ আরও দুর্গম। সহায়-সম্বলহীন শাক্যমুনির পথযাত্রা আরও কঠিন এইবার। কিন্তু মুনির ওতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি চলেছেন তো চলেইছেন। তল্লাশ করছেন তো শুধুই করছেন।

তাঁর তল্লাশের আদর্শ স্পষ্ট। তিনি চান স্বার্থপর বাসনার নিবৃত্তি; চান রোগশোকের কারণকে খুঁজে পেতে, সংসারচক্রে জীবের পুনর্জন্মকে রোধ করতে।

ওদিকে সাধনার পথে বাধা আসে ঘন ঘন। কামনা-বাসনা সত্যসন্ধানীকে গ্রাস করার ফিকির খোঁজে।

একদিন। পরমাসুন্দরী এক কুমারী দেখল তাঁকে। অপরূপ তাঁর দিব্যকান্তি দেখে প্রেমে-পুলকে আত্মহারা হল। তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় গান ধরল সে,—

রূপের মাণিক, ও অপরূপ
রসের নাগর কে গো!
পিতামাতা সুখী তোমার
সুখী জায়া যে গো!
পতির সুখে জায়া সুখী
নিত্য সুখী সে গো!
রূপের মাণিক, ও অপরূপ
রসের নাগর কে গো!

কিন্তু রসিকটি ওদিকে বেহুঁস। রূপসীর গানের একটি বর্ণও মর্মে পৌঁছয় না তাঁর। তিনি তখন অন্য কথা ভাবছেন। তিনি

ভাবছেন, চিরশান্তি কেমন করে পাওয়া যায়? মেদমাংস তো জরার অধীন। দেহ অধীন মৃত্যুর। কিন্তু বাসনার যদি মৃত্যু ঘটানো যায়? কামনার বিনাশ করা যায় যদি?

—যদি যায়; সিদ্ধার্থ ভাবেন, জরাব্যাধিরও বিনাশ হবে তবে। জীব তবে দুঃখের কবল থেকে মুক্তি পাবে।

এই যে মুক্তি, একেই জানি নির্বাণ বলে। জানি, এরই জন্যে দুশ্চর সাধনায় নিমগ্ন হন তথাগত। কিন্তু সাধনার পথ আঁকাবাঁকা বড়। বড় কঠোর-কুটিল।

তথাগতকে তাই বার বার পথ-বদল করতে হয়। এক ঋষিকে ছেড়ে অন্য এক ঋষি-সন্নিধানে যেতে হয় বার বার।

প্রথমে অলার কলাম নামে এক ঋষির কাছে যান তিনি। শাস্ত্রচর্চা করেন পরম নিষ্ঠাভরে। কিন্তু আসল প্রশ্নের জবাব কিছুই পান না।

এবার তিনি অন্য এক ঋষির শরণ নেন। উড্ডক-এর কাছে গিয়ে একই প্রশ্নের জবাব খোঁজেন। কিন্তু জবাব মেলে না এখানেও।

অগত্যা মগধ দেশে পাড়ি দেন তিনি। উরুবেল শহরের একপ্রান্তে নির্জন-নিভৃত এক কুঞ্জবনে তপস্যায় বসেন।

দীর্ঘ ছ' বছর ধরে চলে তপস্যা। সিদ্ধার্থের দেহ যন্ত্রণার দীর্ঘ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু সাধনার সিদ্ধি এ-থেকেও হয় না।

সিদ্ধার্থ পথ খুঁজে বেড়ান আবার। ভয়কে জয় করেন। কামনা-বাসনাকে নির্মূল করেন। কিন্তু তবু সিদ্ধির আলোকবিন্দুটি সেই অধরাই থেকে যায়।

—আত্মনিগ্রহে কি তবে মুক্তি নেই? কৃচ্ছ্রসাধন তবে কি সিদ্ধির প্রতিবন্ধক? তথাগত ভাবেন কত কী; এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুন যে, দেহকে পীড়ন করলে মুক্তিসাধনায় সাফল্য বরং মরীচিকার মতো দূরে সরে যায়।

তাই এবার থেকে তিনি অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেন।

ওদিকে সিদ্ধার্থের সঙ্গী পাঁচজন সন্ন্যাসী খুবই বিরক্ত। সিদ্ধি বিলম্বিত হচ্ছে দেখে ওঁরা ক্ষুব্ধ। সিদ্ধার্থকে তাই ওঁরা ছেড়ে যান।

এইবার একক সাধনা শুরু হয়। তথাগত আবার তপস্যায় বসেন। কুমারী সুগতার কাছ থেকে গ্রহণ করেন পরমান্ন।

এই পরমান্ন-গ্রহণের দৃশ্য এবং আরও কত কী দৃশ্য দেখলাম সেই মন্দিরে। দেখলাম, কোথাও শয়তান মার-এর সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ বুদ্ধ, আবার কোথাও বুদ্ধ অন্তিমশয়নে।

গৌতম-বুদ্ধের অন্তিম-মুহূর্তের কথা আজও অনেকের মুখে মুখে ফেরে। অনেককে বলতে শোনা যায় আজও, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বুদ্ধ ভক্তদের সান্ত্বনা দেন, তোমাদের কারও মনে হতে পারে, প্রভু চললেন; তাঁর কথা ফুরোল। অতএব সবই ফুরোল বুঝি! কোন প্রভু বা শিক্ষাদাতা বুঝি রইল না। কিন্তু না; আসলে তা নয় বন্ধুরা। সবই রইল। 'ধম্ম' রইল। আমি এতদিন ধরে তোমাদের যে ধম্ম-শিক্ষা দিয়েছি, সে শিক্ষাই তোমাদের প্রভু বা শিক্ষাদাতা হয়ে রইল। মনে রেখো, ধম্মই শিক্ষা; শিক্ষাই ধম্ম।

ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি—

মন্দিরটির মাঝখানে বসে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা আবৃত্তি শুরু করেছেন এইবার। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ওঁরা বলছেন, ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।

—ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি; ওঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলে উঠলাম একবার। এবং পরক্ষণেই খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম বিরাটকায় বুদ্ধ-মূর্তিটির সামনে।

বুদ্ধ-মূর্তি মোট তিনটি আছে ও মন্দিরে। একটি বড়, আর দু'টি ছোট। মন্দিরের এক প্রান্তে আছে সব। সবই পদ্মাসনে।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুরাও দেখলাম পদ্মাসনেই বসে। থেকে থেকে আবৃত্তি করে চলেছেন বুদ্ধ-মন্ত্র।

শুধুমাত্র একজন ভিক্ষুকে অসুস্থ মনে হল, যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তিনি। অন্য সকলের থেকে তিনি যেন আলাদা হয়ে আছেন। কেউ তাঁকে দেখছে না। কেউ খবর নিচ্ছে না তাঁর অসুস্থতার। তাঁর এই অসহায় অবস্থা দেখে, আর দেখে সামনেকার অপরূপ বুদ্ধ-মূর্তিটি, আড়াই হাজার বছর আগেকার এক কাহিনী মনে এল আমার। যেন মনে হল, বুদ্ধ ভক্তদের বলছেন, আমার বন্ধু ও সঙ্গীরা! তোমরা এক রুগ্নকে পরিত্যাগ করেছ, শুনলাম?

ভক্তরা বললেন না কিছু। নিরুত্তর থাকলেন।

বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন আবার, কিন্তু কেন করেছ পরিত্যাগ?

ভক্তরা এবারও নিরুত্তর।

বুদ্ধ বললেন, জেনে রেখো, যারা আমাকে চায়, ওই রুগ্নদেরও চাইতে হবে তাদের। অসহায় ও আর্তদের সেবা করেই আমাকে পেতে হবে।

—বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।

ভিক্ষুদের উদাত্ত-গম্ভীর আবৃত্তি কানে আসছে তখনও। কিন্তু তখন বুদ্ধ-শরণার্থী ওই দলটাকে বিরাট এক মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে, ওঁরা বুদ্ধের শরণ নিতে চান কোন্ অধিকারে? অসহায় ও আর্ত ওই সঙ্গীটিকে বাদ দিয়ে বুদ্ধকে ওঁরা কেমন করে পাবেন?

মনে পড়ে, ওঁদের এই পাওয়া-না-পাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই বুদ্ধ-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি সেদিন। তাড়াতাড়ি বাস-টারমিনাসের পথ ধরি।

তপ্ত দুপুর খাঁ খাঁ করছে তখন। পশ্চিমাকাশে হেলান-দেয়া সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মনটা দারুণ ভারী হয়ে ওঠে হঠাৎ। বার বার ভাবি, দু' একদিন থাকলে হ'ত না এখানে? এখানকার রেস্ট্‌-হাউস ও বৌদ্ধ-বিহার দেখলে হ'ত না? বুদ্ধের জীবন ও বাণী-চিহ্নিত ভাস্কর্য আর শিলালিপিগুলোর খবর নিলে হ'ত না?

যুগে যুগে কতজনই তো নিলেন খবর। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন আর হিউয়েন সাঙ্‌ও তো নিলেন!

ওঁদের যুগের অদ্ভুত-আশ্চর্য শিলালিপিগুলো আর কি অক্ষত আছে এখন? অতীত লুম্বিনী আর কি এখন তেমন করে কথা কয়?

ভাবি আকাশ-পাতাল। শের চাঁদের কথা ভাবি। একই কথা ঘুরে-ফিরে মনে আসে যেন। মনে হয়, হয়তো ভুল হল। ওকে বিশ্বাস না করে হয়তো অন্যায় করেছি।···কিন্তু এমন একটা জায়গায় এসেও মানুষকে বিশ্বাস করতে পারলাম না?···এ কি আমার নিজের দোষে? না কি আজকের যুগধর্মের অনিবার্য প্রভাবে?

জানি নে। আজও উত্তর খুঁজে পাই নি এর

তবে আজ একটা কথা স্পষ্ট মনে পড়ে।

মনে পড়ে, লুম্বিনী থেকে নৌগড়, গোরখপুর, কাশী ও দুর্গাপুর হয়ে কলকাতা ফিরতে দিন দশেক দেরি হয়।

ফিরে দেখি, চিঠির স্তূপ। দেখি, অনেকে অনেক চিঠি লিখেছেন। কিন্তু সেই সব চিঠির মধ্যে হীরের মতো ঝলমল করছে একটিই। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে সেটি লেখা। লিখেছেন শের চাঁদ। নেপাল থেকে একদিনের বন্ধুকে তিনি স্মরণ করেছেন,—

প্রিয় বন্ধু,

নির্বিঘ্নেই বাড়ি পৌঁছেছেন আশা করি। প্রতিবেশী নেপালকে দেখে নিশ্চয় খুশি হয়েছেন। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করলে দেখতেন, খুশি আরও বাড়ত। দেখতেন, পরদেশী এক নতুন বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিশ্বাস আপনি করেন নি। উল্টে আমার সঙ্গ বিপজ্জনক ভেবেছেন। হয়তো বা চোর-ডাকাত ঠাওরেছেন আমাকে। কিন্তু বন্ধু, চোর-ডাকাত আমি নই। আমার দেশের এমন কি দাগী ডাকাতরাও পর্যটকদের অনিষ্ট করে না।

আপনি দেশ দেখতে বেরিয়েছেন। তাই ভেবেছিলাম, নিজে সঙ্গে করে নিয়ে লুম্বিনী দেখাব।···আমি তো ওখানকার স্থানীয় লোক! দেখাতে কী আর কষ্ট হ'ত আমার! আর তা ছাড়া, আপনি অতিথি হলে ডাক্তার-বন্ধুরও কিছু কষ্ট হ'ত না। বরং খুশিই হতেন উনি। যা-ই হোক, আপনার নিমন্ত্রণ রইল আবার। আগে থেকেই অনুরোধ রইল, আবার যদি কখনও লুম্বিনী আসেন তো অনুগ্রহপূর্বক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি সব রকম সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত রইলাম।

তবে একটা কথা, পাছে সন্দেহ করেন, ভয় পান আবার, এই ভেবে লুম্বিনীর ঠিকানা আর দিলাম না। চিঠির শেষে কাঠমাণ্ডুর ঠিকানা দিলাম। ওখানে চিঠি দিলেই ঠিক খবর পাব আমি। কাঠমাণ্ডু, পোখরা বা লুম্বিনী—যেখানেই থাকি না কেন, আপনার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ঠিক করব।

আশা করি চিঠি দেবেন। সব রকম সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে ভুলে গিয়ে আমার ভালোবাসা গ্রহণ করবেন আশা করি। ইতি

আপনার বন্ধু,
সুব্বা নগেন্দ্র মান শের চাঁদ
১/১১, লাজিম পার্ক,
কাঠমাণ্ডু (নেপাল)

নেপালে দর্শনীয়

কাঠমাণ্ডুর পথে—পৃঃ ১-৫৪

বীরগঞ্জ—পৃঃ ৮-১৭, সিমরা—পৃঃ ১৯-২০, আমলেখগঞ্জ—পৃঃ ২২-২৫, হেতৌড়া—পৃঃ ২৬-৩৩, ত্রিভুবন রাজপথ—পৃঃ ৩৪-৩৫, দামন—পৃঃ ৩৬-৪১, পালঙ-উপত্যকা—পৃঃ ৪২-৪৮, কাঠমাণ্ডু-উপত্যকা—পৃঃ ৪৯-৫৪, ভীমপ্‌হেডী—পৃঃ ৫৩, ঠানকোট—পৃঃ ৫২-৫৫

কাঠমাণ্ডু—

স্বয়ম্ভুনাথ—পৃঃ ৬২-৬৪, ৯৪-১০৩, পশুপতিনাথ—পৃঃ ৬৫-৮৬, গুহ্যেশ্বরী মন্দির—পৃঃ ৮৭-৯৩, কাষ্ঠমণ্ডপ—পৃঃ ১০৪-১০৮, নিউ রোড—পৃঃ ১১০-১১২, ১৫৫, **বোধনাথ—পৃঃ ১১৯-১২৮,** নরদেবী মন্দির—পৃঃ ১২৮-১৩০, কুমারী দেবীর মন্দির—পৃঃ ১৩০-১৩৬, **হনুমান ঢোকা—পৃঃ ১৩০-১৫৪,** তেলেজু-মন্দির—পৃঃ ১৩৮-১৪৬, পুরনো রাজপ্রাসাদ (হনুমান ঢোকা)—পৃঃ ১৪৬-১৫৪, আজকের রাজপ্রাসাদ—পৃঃ ২৪৩-২৪৪, অভিষেক-বেদী—পৃঃ ১৪৯, হাওয়া-ঘর—পৃঃ ১৫২, রত্না পার্ক—পৃঃ ১৫৫-১৫৬, টুঁগিখেল—পৃঃ ১৫৭-১৫৮, শহীদ-বেদী—পৃঃ ১৫৭-১৫৮, রাণী-পোখ্‌রি—পৃঃ ১৫৮-১৬১, বালাজু পার্ক—পৃঃ ১৯৬-২০৩, সিংহ-দরবার—পৃঃ ২০৫-২০৬, ক্লক টাওয়ার—পৃঃ ২০৬, নেপাল-মিউজিয়াম—পৃঃ ২০৬, মচ্ছেন্দ্রনাথ মন্দির—পৃঃ ২০৬, নারায়ণহিটি দরবার—পৃঃ ২০৬

পশুপতিনাথ—পৃঃ ৬৫-৮৬

কীর্তিপুর—পৃঃ ১৬১-১৬৭

বাঘ-ভৈরব মন্দির—পৃঃ ১৬৫, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়—পৃঃ ১৬৬-১৬৭

সুন্দরীজল—পৃঃ ১৬৭-১৭২

গোকর্ণ-বন—পৃঃ ১৬৭-১৬৯, গোকর্ণেশ্বর—পৃঃ ১৬৯-১৭০

ললিতপুর (পাত্তান)—পৃঃ ১৭৩-১৯৫

দরবার-এলাকা—পৃঃ ১৭৪-১৭৫, পৃঃ ১৮৩-১৮৪, কৃষ্ণ-মন্দির—পৃঃ ১৭৫-১৮২, মহাবুদ্ধ-মন্দির—পৃঃ ১৮৪-১৮৯, হিরণ্য-বর্ণ-মহাবিহার—পৃঃ ১৮৯-১৯০, মচ্ছেন্দ্র-মন্দির—পৃঃ ১৯০-১৯৩, মীননাথ-মন্দির—পৃঃ ১৯৩-১৯৪

চৌবাহার—পৃঃ ২০৬

আদিনাথ মন্দির—পৃঃ ২০৬

চৌভাহা হ্রদ—পৃঃ ২০৬

হাত্তিবন গিরিসংকট—পৃঃ ২০৬

ফাপিং—পৃঃ ২০৬

শিখা-নারায়ণ মন্দির—পৃঃ ২০৬

দক্ষিণ-কালী মন্দির—পৃঃ ২০৬

ভক্তপুর (ভাদগাঁও)—পৃঃ ২০৭-২২১

সিদ্ধ পোখ্‌রি—পৃঃ ২০৮-২০৯, দরবার-মহল্লা—২১১-২১৩, ভক্তপুর প্রাসাদ—পৃঃ ২১২-২১৩, বৎসলা-মন্দির—পৃঃ ২১৩-২১৪, ছোট পশুপতিনাথ—পৃঃ ২১৩, নয়াতপোল—পৃঃ ২১৪-২১৮, ভৈরবনাথ মন্দির—পৃঃ ২১৮, দত্তাত্রেয় মন্দির—পৃঃ ২১৮-২১৯, ময়ূর-গবাক্ষ—পৃঃ ২২০, ভকুপতি নারায়ণ মন্দির—পৃঃ ২২০

চংগু নারায়ণ—পৃঃ ২২১-২২৩

নাগেরকোট—পৃঃ ২২৪-২৩৮

ধবলগিরি—পৃঃ ২১৭, পৃঃ ২৮৯-২৯০

অন্নপূর্ণা ১, ২, ৩—পৃঃ ২২৭-২২৮, ২৭০, হিমলচুলী—পৃঃ ২২০, মানালসু—পৃঃ ২২৮, ল্যাংটাং ২২৮, ২৩৫

গণেশ হিমল—পৃঃ ২২৮, পৃঃ ২৫৯, গোঁসাই থান—পৃঃ ২২৮-২২৯, দোরজে ল্যাকপা—পৃঃ ২২৯

গৌরীশঙ্কর—পৃঃ ২২৯, ২৪৬, চো ওয়ু—পৃঃ ২২৯

এভারেস্ট্ (সাগরমাথা, চোমোলুংমা)—পৃঃ ২২৯, ২৪৭-২৪৮
লোৎসে—পৃঃ ২২৯, মাকালু—পৃঃ ২২৯
কাঞ্চনজঙ্ঘা—পৃঃ ২২৯
হেলাম্বু—পৃঃ ২৩১-২৩৫
হেলাম্বুর পথে—সুন্দরীজল—পৃঃ ২৩৪ মূল খার্কা—পৃঃ ২৩৪, খাসরুবাস—পৃঃ ২৩৪, বারল্যাং—পৃঃ ২৩৪, পতিভঞ্জইয়াং—পৃঃ ২৩৪, ঠাকনি, তারাংমারাং, মাহাংকল, নয়াপতি, টিম্বু—পৃঃ ২৩৪, টারকে-ঘিয়াং—পৃঃ ২৩৪, মেলেমচী নদী—পৃঃ ২৩৪, ক্লিবিল্, হুরপু, কাকনী—পৃঃ ২৩৪, খুমজুং—পৃঃ ২৩২-২৩৫,
গোঁসাইকুণ্ড—পৃঃ ২৩৫-২৩৬
নামচে বাজার—পৃঃ ২৪৫-২৪৮
নামচের পথে—বেনেপা—পৃঃ ২৪৫, সূর্য-কুশী—পৃঃ ২৪৫, ভোলাঘাট—পৃঃ ২৪৫, রিসিংগো পৃঃ ২৪৫, কাটা-খোটে—পৃঃ ২৪৫, নামদে—পৃঃ ২৪৬, জিরি—পৃঃ ২৪৬, সিকরেভ-খোলা—পৃঃ ২৪৬, লিখু-খোলা উপত্যকা—পৃঃ ২৪৬, বরাইখারগা—পৃঃ ২৪৬, জুনবেসী—পৃঃ ২৪৬, বিংমো-খোলা—পৃঃ ২৪৬, দুধ-কুণ্ড—পৃঃ ২৪৬, বেনগড়—পৃঃ ২৪৬, দাতে পৃঃ ২৪৬, দুধ-কুশী—পৃঃ ২৪৬, খুমজুং—পৃঃ ২৪৬
নামচেতে দর্শনীয়—মাহালাংগুর হিমল—পৃঃ ২৪৭, লোৎসে-মুপৎসে—পৃঃ ২৪৭, এভারেস্ট্—পৃঃ ২৪৭, কোয়াংডে, ঠামসেরকু, কাংটেগা, আমা-দাবলাম, খুম্বিলা পর্বত—পৃঃ ২৪৭, দুধ-কুশী উপত্যকা—পৃঃ ২৪৭-২৪৮, থিয়াংবোচে বৌদ্ধ-বিহার—পৃঃ ২৪৭-২৪৮, ঠামে—পৃঃ ২৪৮-২৪৯
ঢুলিখেলের পথে—পৃঃ ২৫২
ঢুলিখেল—পৃঃ ২৫৩-২৫৪
কাকনী—পৃঃ ২৫৮-২৬০
কাকনীর পথে—পৃঃ ২৫৮
জনকপুর—পৃঃ ২৬১-২৬২
পোখরার পথে—পৃঃ ২৬৪-২৬৯

কাঠমাণ্ডু-পোখরা পথ—কাকনী, ত্রিশূলী, সমারি, কাটুঞ্জে—পৃঃ ২৬৭,
ত্রিশূলী নদী, ভারাঙ্-ভুরুঙ্ খোলা, আঁখু, বুধি-গণ্ডকী, ভুণ্ডী-খোলা,
বিজয়পুর-খোলা বা শ্বেতী নদী—পৃঃ ২৬৮
হান্‌সে বাজার, অরু ঘাট, খান্‌চক্, গোর্খা, জারুওয়ার, খোপ্‌ল্যাঙ্,
তারকুঘাট, কুন্‌ছা, দেওরালী—পৃঃ ২৬৮

মাচ্ছাপুছ্‌রে—পৃঃ ২৬৯-২৭০, ২৮৮
পোখরা—পৃঃ ২৬৯-৩২৮
মাচ্ছাপুছ্‌রে—পৃঃ ২৬৯-২৭০, ফেওয়া-হ্রদ—পৃঃ ২৭৭-৩০৭, রত্ন-মন্দির—পৃঃ ২৮১-২৮২, বরাহী-মন্দির—পৃঃ ২৯৩-২৯৬, শ্বেত নদী—পৃঃ ৩০৮-৩০৯, রূপা-তাল—পৃঃ ৩০৯-৩১০, বেগনাস-তাল—পৃঃ ৩০৯-৩১১, মহেন্দ্র গুম্ফা—পৃঃ ৩২৩,
মুখাভর পৃঃ ২৯৯ ৩০২
তুকুছে—পৃঃ ৩২৬, জমোসোম—পৃঃ ৩২৬, তাতোপানি—পৃঃ ৩২৭

লুম্বিনীর পথে—পৃঃ ৩২৯-৩৫১
ভৈরওয়া (ভাইরওয়া)—পৃঃ ৩৩০-৩৩৩, সগৌলী—পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪,

লুম্বিনী—পৃঃ ৩৫৩-৩৬৯
মায়া দেবীর মন্দির—পৃঃ ৩৫৪-৩৫৬, অশোক-স্তম্ভ পৃঃ ৩৫৭-৩৫৯, বুদ্ধ-মন্দির—পৃঃ ৩৫৯-৩৬৮

মুক্তিনাথ—পৃঃ ৩৩৯-৩৪৩
কালী-গণ্ডকী—পৃঃ ৩৪০, দামোদর কুণ্ড—পৃঃ ৩৪০।